উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রভূষণ পালিত

বন্ধুবরেষু

নিবেদন

'সাহিত্য ভাবনা' প্রকাশিত হলো। এই গ্রন্থে সবশুদ্ধ সতেরোটি প্রবন্ধের সমাবেশ করা হয়েছে। রচনাগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় (যথা, বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনী স্মারক পুস্তিকা, সজনী, নবজাতক, শিক্ষক, পর্যবেক্ষক, বেতার জগৎ, জয়শ্রী, ছোটগল্প সংকলন, চতুষ্কোণ, চেতনিক ও পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা) প্রকাশিত হয়েছিল। অপসংস্কৃতির সমস্যা বর্তমানে জনমনকে বিশেষভাবে আলোড়িত করে তুলেছে। সেই কারণে এই প্রসঙ্গের উপর একাধিক প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হলো। 'সাহিত্যে স্বেচ্ছাচার' এবং 'শ্লীলতা ও অশ্লীলতা' রচনাদ্বয় ভিন্ন নামে প্রকাশিত হলেও আসলে ওই দুটি প্রবন্ধও অপসংস্কৃতি বিষয়ক। সুতরাং এই গ্রন্থে কমপক্ষে অপসংস্কৃতির উপরে তিনটি প্রবন্ধ প্রচারিত হলো।

বইটির প্রকাশে পপুলার লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী প্রীতিভাজন সুহৃৎ শ্রীসুনীলকুমার ঘোষ বিশেষ যত্ন নিয়েছেন। বন্ধুবর শ্রীসুধীর ঘোষের কাছ থেকেও বহুতর সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের দুজনকে আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ জানিয়ে বন্ধুপ্রীতির অমর্যাদা ঘটাতে চাইনে।

পরিশেষে বক্তব্য, বইটি সুধী সমাজের মনোযোগ ও পাঠক সমাজের সমাদর আকর্ষণ করতে পারলে জনগ্রাহ্যতায় লেখকের যে তৃপ্তি, সেই তৃপ্তির বোধে শ্রম সার্থক জ্ঞান করবো।

সূচীপত্র

বাংলা কথা-সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি

বাংলা কথা-সাহিত্য নানা বিবর্তনের স্তর বেয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁচেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫ সালে প্রকাশিত) উপন্যাসকে যদি বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের আনুষ্ঠানিক আরম্ভ বলা যায়—কিছু কিছু উপন্যাস বা উপন্যাস জাতীয় রচনা এর আগেও প্রকাশিত হয়েছে, তাদের বর্তমান হিসাবের মধ্যে আনছি না—তা হলে বাংলা কথা-সাহিত্যের বয়স একশত বৎসর পূর্ণ হয়েছে, বলা যেতে পারে। এই শতাব্দী কালের মধ্যে বাংলা উপন্যাস ও গল্প সাহিত্যের নানা রূপান্তর সাধিত হয়েছে, বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলীরও বহু পরিবর্তন হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এবং পরবর্তীকালের প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও গল্পকারগণ সকলেই বিবর্তনের নিয়ম মেনে কথা-সাহিত্যের ধারাকে অগ্রসর ক'রে দিয়েছেন এবং তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলা কথা-সাহিত্যের একটি সুস্পষ্ট, সুসম্বদ্ধ ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। যাদের দানে বাংলা কথা-সাহিত্যের এই ধারাবাহিক ক্রম পুষ্ট হয়েছে তাঁরা সকলেই আমাদের গর্বের বিষয়, শ্রদ্ধার পাত্র। আলোচনার সূত্রপাতে মৃত বা জীবিত তাঁদের সকলেরই কাছে বাংলা সাহিত্য-পাঠকের কৃতজ্ঞতা নিবেদন ক'রে আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করছি।

এ কথা আজ প্রায় সর্বস্বীকৃত যে, বাংলা ছোট গল্প শিল্পোৎকর্ষের দিক দিয়ে বিশ্বসাহিত্যের যে কোনো শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের, যে-কোনো শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পের সঙ্গে তুলনীয়। মোপাসাঁ, আলফঁস দোদে, টলস্টয়, শেকভ, গোর্কি, এডগার অ্যালান পো, ব্রেট হার্ট, ও' হেনরি, সমারসেট মম, বেটস্—পৃথিবীর অগণ্য উৎকৃষ্ট ছোট গল্প লেখকদের মধ্যে এঁদের যদি সবচেয়ে প্রাতিনিধিস্থানীয় ছোট গল্প লেখক বলা যায় তা হলে তাঁদের প্রতি তুলনায় বাংলার প্রথিতযশা ছোট গল্প লেখকগণ কোন অংশেই ন্যূন বলে গণ্য হবেন না। বরং রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রভাত-কুমার, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বনফুল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু ও সুবোধ ঘোষের এমন কিছু কিছু ছোট গল্প আছে যেগুলিকে অক্লেশে যে-কোন দেশের যে কোন ছোট গল্পের পাশে স্থান দেওয়া যেতে পারে। আজকের দিনেও বাংলায় অনেক ভালো ছোট গল্প লেখা হচ্ছে। নবীন প্রজন্মের লেখকদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন যাঁরা কথা-সাহিত্যের এই বিশেষ শাখায় তাঁদের মুখ্য উদ্যম নিয়োজিত করেছেন।

এত দিনের এত সযত্ন চর্চার ফলে বাংলা ছোট গল্পের একটা বিশিষ্ট স্থান দাঁড়িয়ে গেছে।

বাংলা ছোট গল্পের উৎকর্ষ সম্বন্ধে এই যে স্থিরনিশ্চিত উক্তি, এটা কিছু আত্মশ্লাঘাকর উক্তি নয়, এর পিছনে আছে অপ্রতিবাদ্য তথ্যের জোর। আজকাল তো তুলনামূলক সাহিত্যের খুবই অনুশীলন হচ্ছে। বিদেশ থেকেও কেউ কেউ এসে আমাদের সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে এ-জাতীয় কাজে আত্ম-নিয়োগ করেছেন। যাঁরা এ-জাতীয় অনুশীলন করছেন তাঁরা একটু খোঁজখবর করলেই এই উক্তির যাথার্থ্য স্বীকার করতে বাধ্য হবেন বলে মনে করি। শুধু তাই নয়, জাতীয় অভিমান যদি তাঁদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন না ক'রে থাকে তো তাঁরা এও স্বীকার ক'রে নিতে কুণ্ঠিত হবেন না যে, জীবনের এমন কোন কোন ক্ষেত্র আছে যার রূপায়ণে, রসের এমন কিছু কিছু প্রকারভেদ আছে যার পরিস্ফুটনে, বাংলা ছোট গল্প গোটা বিশ্বসাহিত্যে তুলনারহিত। পারিবারিক জীবনের চিত্রায়ণ, যেমন একান্নবর্তী পরিবারপ্রথা থেকে উদ্ভূত সংঘাত, মধ্যবিত্ত জীবনের অপচয় ও বেদনা, গার্হস্থ্য রস, গ্রামজীবনের ছবি, যেমন রক্ষণশীলতা আর অগ্রসর চিন্তার দ্বন্দ্ব, সংস্কারপ্রধান থেকে উদ্ভূত জটিলতা, চাষী জীবনের সংগ্রাম ও স্বপ্ন; খনি অঞ্চলের কুলিকামিনদের দুর্বহ জীবনের দুঃখ, কাহার-বাগ্দী-বাউড়ী-বেদে ও বাজীকর শ্রেণীর মানুষগুলির জীবনবেদনা, স্বাধীনতাস্পৃহা ও স্বেচ্ছাচার—এসব যদি বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে বিচার্য মানদণ্ড হয় তা হলে বলতেই হবে যে, বাংলা ছোট গল্প বিশ্বসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। হয়তো বাংলা ছোট গল্পের পরিসর তুলনায় সীমিত, তার বিচরণের ক্ষেত্র সংকুচিত, তার সীমাবদ্ধ কাঠামোর ঘেরের মধ্যে বৃহৎ পৃথিবীর আলো-হাওয়া হয়তো তেমন অবাধে প্রবেশ করে না, এ সাহিত্যে অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ কিছু কম; কিন্তু তার জন্য বাংলা ছোট গল্পকে দায়ী করে লাভ নেই, তার জন্য আমাদের সমাজব্যবস্থার অপ্রতুলতাই মূলতঃ দায়ী। বাঙালী জীবনের অর্থনৈতিক কাঠামোটাই এমন যে পরিবার জীবনের ছোট-খাট দুঃখ সুখের আবর্তনের বাইরে তা বৃহৎ কোন আলোড়ন জাগায় না। আজ অবশ্য অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। জীবনসংগ্রাম ব্যক্তি বা পরিবারকেন্দ্রিক না থেকে ক্রমশঃ সঙ্ঘবদ্ধ যৌথ আন্দোলনের রূপ লাভ করছে। কিন্তু তার প্রতিফলন এখনও আমাদের সাহিত্যে ভালো ক'রে হয়নি বলে আমার ধারণা।

ছোট গল্পের খুঁতসীমা ছেড়ে উপন্যাসের এলাকায় এসে দেখতে পাই, এ ক্ষেত্রেও আমাদের গর্বিত বোধ করবার কারণ আছে। যে সাহিত্যে 'রূপান-

কুণ্ডলা' 'বিষবৃক্ষ' 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'গোরা' ও 'ঘরে বাইরে', 'শ্রীকান্ত' 'গৃহদাহ' ও 'চরিত্রহীন', 'পথের পাঁচালি' ও 'অপরাজিত', 'কবি' 'কালিন্দী' ও 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'দিবারাত্রির কাব্য' ও 'পুতুলনাচের ইতিকথা,' 'জাগরী' প্রভৃতির মতো বই লেখা হয়েছে সে সাহিত্য উপন্যাসে দীন এ কথা বলা চলে না। তবে উপন্যাস ও ছোট গল্পের তুলনামূলক মূল্যায়নের প্রশ্ন এলে মানতেই হবে যে, বাংলা ছোট গল্পের উৎকর্ষের পাশে বাংলা উপন্যাসের উৎকর্ষ কিছু নিষ্প্রভ। এর একটা কারণ যা আমার মনে হয় তা হচ্ছে এই যে, বাঙালী লেখকের প্রতিভা খণ্ড ও বিচ্ছিন্নের দ্যুতি আভাসিত করায় যত খোলে, সমগ্রের ধারণা সৃষ্টির কাজে তত খোলে না। বাঙালী কথা-সাহিত্যিক বিন্দুর ভিতর সিন্ধুর স্বাদ আনয়নে পারঙ্গম, কিন্তু সিন্ধুর গর্জন কল্লোল, বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গের লীলা, সুদূর প্রসারিত বৃহৎ নীলিমা—এগুলিকে তার সমগ্রতায় ফুটিয়ে তুলতে বোধহয় তেমন উৎসাহী নন। জীবনের খণ্ড-ক্ষুদ্র বিশিষ্ট রূপের মাধুরী তাঁকে পুলকিত করে, কিন্তু যাই অজস্র প্রশ্নসমস্যাজটিলতার গুরুভার নিয়ে জীবন তাঁর সামনে বিপুলাকারে দেখা দেয়, অমনি যেন তিনি কেমন বিমূঢ় হয়ে পড়েন। তার অর্থ বাঙালী কথাকারের প্রতিভা মূলতঃ গীতিকবিতার খাত বেয়ে প্রবাহিত, এবং যেহেতু তা গীতিধর্মী তা কম বেশী আত্মমুখী উপাদান দিয়ে গড়া; সত্যিকার উপন্যাসের সামগ্রিক ও বস্তুমুখী দৃষ্টিভঙ্গী আয়ত্ত করতে বোধ হয় এখনও আমাদের কিছু সময় লাগবে।

এইখানে স্বতঃই উপন্যাসের সংজ্ঞা কী তা নিরূপণের প্রশ্ন আসবে। প্রশ্নটি বিচার ক'রে দেখা যেতে পারে।

কথাসাহিত্য মূলতঃ পর্যবেক্ষণনির্ভর হলেও কেবল মাত্র পর্যবেক্ষণের ফলাফল দিয়ে বোধহয় উপন্যাস শিল্পকে পুরাপুরি সমৃদ্ধ করা যায় না। পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে মননকেও উপন্যাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছেড়ে দিতে হবে। অর্থাৎ observation ও contemplation এই দুইয়ে একত্র মিলিত হলে তবে উপন্যাসের বৃত্ত পূর্ণ হয়। তাদের একটি উপন্যাস সৃষ্টির জন্য জগৎ, সমাজ ও মানুষকে পর্যবেক্ষণ করাই যথেষ্ট নয়, সেই পর্যবেক্ষণের ফল শিল্পসম্মত আঙ্গিকে ও ভাষায় পরিবেশন করাতেও কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না; সেই সঙ্গে একই কালে প্রয়োজন দেখা ঘটনার তাৎপর্য অনুধাবন, বিভিন্ন চরিত্রগুলির অন্তর্নিহিত ঐক্য আবিষ্কার এবং সম্ভব হলে এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানব অস্তিত্বের রহস্যের উন্মোচন। অর্থাৎ খতিয়ে দেখতে গেলে, শেষপর্যন্ত সার্থক ঔপন্যাসিকের ভূমিকায় আর কবির ভূমিকায় বড় একটা পার্থক্য থাকে না। বড় কবি তাঁর

শক্তির মধ্যে জীবন ও জগতের তাৎপর্য উপলব্ধি করেন, বড় ঔপন্যাসিকও তাই করেন। উপন্যাসে যে মননের প্রয়োজনের কথা বলেছি তা বিশুদ্ধ বুদ্ধিবাদ বা প্রেরণাহীন বুদ্ধিবাদ নয়, তা এই পর্যায়ের জিনিস - প্রজ্ঞা, বোধি ও উপলব্ধি। এই মানদণ্ডে দেখতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্র আজও আমাদের সাহিত্যে ঔপন্যাসিকরূপে অজেয়। কবি-সমালোচক মোহিতলাল তাঁর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রকে 'কবি' আখ্যা দিয়েছেন, কেন দিয়েছেন তা একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারব। দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের সেই সব উপন্যাসই শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মরূপে আদৃত হয়েছে যেগুলির ভিতর কবিধর্মিতা প্রবল। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' একটি উৎকৃষ্ট উপন্যাস—সেও কবিধর্মিতার জন্য, শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' কাব্যিক ছাঁদে লেখা না হলেও তা মানবজীবনের একটি কাব্য। বিভূতিভূষণের কবিস্বভাব সুবিদিত। বস্তুতঃ তাঁর 'পথের পাঁচালী' বাংলার পল্লীজীবনের এক স্বপ্নময় কাব্য—অথচ অভাব ও দারিদ্র্যের চিত্রণে তা কত বস্তুমুখী, objective। তারাশঙ্করের যে ক'টি উপন্যাসের নাম করেছি, একটু পর্যালোচনা ক'রে দেখলেই দেখা যাবে তাদের কাব্যগুণ অতি স্পষ্ট। অথচ তাদের বিষয় বাস্তবধর্মী। রাঢ় বাংলার রুক্ষ ধূসর কঙ্করময় পরিবেশে আজন্মবর্ধিত মানুষের সংগ্রামময় জীবনের বাস্তব রূপায়ণ। 'কবি', 'কালিন্দী', 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'র সঙ্গে উপরের মানদণ্ডে তারাশঙ্করের এই ক'টি উপন্যাসও যোগ করা যায়—'রাইকমল', তামসতপস্যা', 'নাগিনীকন্যার কাহিনী'। এই পর্যায়ে আরও দু'একটি উপন্যাস থাকতে পারে, কিন্তু তা আমার পড়া নেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এত এত উপন্যাস থাকতে ওই যে তাঁর 'দিবারাত্রির কাব্য' আর 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র নামোল্লেখ করেছি সে আর কোন কারণে নয়, এই দুটি উপন্যাসের সু উচ্চারিত কাব্যবাণীই তার হেতু। 'পুতুলনাচের ইতিকথা', উপরন্তু, স্বভাব-দার্শনিকতার দ্বারা মণ্ডিত। উপন্যাস শিল্পসম্মত দার্শনিকতার দ্বারা মণ্ডিত হলে তা চেখে চেখে উপভোগ করবার মতো একটা জিনিস। রবীন্দ্র-পুরস্কার ভূষিত 'বনফুল'-এর 'হাটে-বাজারে' একটি সুন্দর উপন্যাস। এর সৌন্দর্য তার মানবতায় কিন্তু লেখকের দৃষ্টি মানবতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি, তা কবিস্বভাবমণ্ডিত হয়নি, সুতরাং বইটি পাঠকের উচ্চতর প্রত্যাশা ক্ষুণ্ণ করে।

উপন্যাসের সংজ্ঞা ও লক্ষণ নিরূপণের বেলায় আমি বলেছি যে, সত্যিকার ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি হওয়া চাই বস্তুমুখী, বহিঃসচেতন। অথচ তার পরক্ষণেই এই বক্তব্য করেছি যে সার্থক ঔপন্যাসিকের পক্ষে কবিস্বভাব অপরিহার্য। এই দুই

উক্তির ভিতর আপাত-অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হতে পারে। কবিরা সাধারণতঃ আত্মমুখী হন, অন্তর্নিবেশের অভ্যাসযুক্ত হন, তবে কেমন ক'রে আবার তাঁরা একই কালে বহির্মুখী হবেন, বস্তুনিষ্ঠ হবেন? একটু তলিয়ে দেখলেই প্রশ্নের ফাঁক আমরা ধরতে পারব। কবিরা আত্মমুখী হন ঠিকই কিন্তু সে মাঝারি-মাপের কবি, বড় কবি কখনও আত্মমুখী হন না। ক্লাসিক কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসই এ কথার প্রমাণ দেবে। ব্যাস, বাল্মীকি, হোমার, শেক্সপীয়র—এঁরা কেউ আত্মমুখী কবি ছিলেন না। তাঁদের সকলেরই মন ছিল বহিঃসচেতন, বস্তুমুখী। বস্তুতঃ ক্লাসিক কাব্যের একটি লক্ষণই হল এই বস্তুমুখীনতা। অবশ্য এ কথার ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, তবে ব্যতিক্রম নিয়মকেই প্রমাণ করে।

সমকালীন বাংলা সাহিত্যে যে সব উপন্যাস লেখা হচ্ছে তাদের সম্পর্কে আমার প্রধান অভিযোগ এই যে এই সকল উপন্যাস মূলতঃ পর্যবেক্ষণনির্ভর, factual; তাদের ভিতর প্রায়ই অস্তিত্বের গভীরতর বোধের স্বাদ পাওয়া যায় না। দার্শনিকতা বা কবিত্বভাব দ্বারা এ সকল শিল্পকর্ম উজ্জীবিত নয়, ফলে পাঠকের তৃপ্তিতে কোথায় যেন অপূর্ণতা থেকে যায়। মানুষ মাত্রেরই জীবনের দুটি স্তর আছে—একটি তার বাইরেকার দৃষ্টিগ্রাহ্য জীবনযাত্রার স্তর, অন্যটি তার মন্তর্জীবনের স্তর। এই দুই ধারা পাশাপাশি সমান্তরালে চলে কিন্তু আমরা কেবল চর্মচক্ষুতে মানুষের বাইরের ছবিটাই প্রত্যক্ষ করতে পারি। সত্যিকার ঔপন্যাসিকের কাজ মানুষের এই দ্বৈত রূপের সঙ্গে যুগপৎ পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া, কেবলমাত্র তার surface-এর রূপ ধরে দেওয়া নয়।

আমার মনে হয়, আজকের অধিকাংশ ঔপন্যাসিক কেবলমাত্র এই surface-এর বা বহিরঙ্গের রূপায়ণে ব্যস্ত, মানুষের অন্তরে তলিয়ে দেখবার মতো হয় তাঁদের ধৈর্য নেই, নয় সামর্থ্য নেই। আজকাল 'জীবনযন্ত্রণা' বলে একটা কথা লেখক মহলে খুব চালু হয়েছে। কি কাব্যক্ষেত্রে কি কথাসাহিত্যে। কিন্তু মনে হয় কথাটা অভ্যাসবশে যত বলা হয় কথাটার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি ক'রে তত বলা হয় না। জীবনে যন্ত্রণা আছে ঠিক, প্রভূত পরিমাণে আছে, কিন্তু তার প্রকৃত ছবি কই সাহিত্যে? শুধু কি জৈব চাওয়া পাওয়ার অতৃপ্তি, হতাশা ও ব্যর্থতা থেকে জাত যন্ত্রণাই জীবনের একমাত্র যন্ত্রণা? আর কোন যন্ত্রণা জীবনে নেই? অস্তিত্বের শূন্যতার বোধ, সমাজে বাস ক'রেও একাকিত্বের চেতনা, স্বভাববিষণ্ণতা, বিভক্ত মানসিকতার বেদনা, প্রতি মানুষেরই জীবনে—সে মানুষ যদি অনুভবী মানুষ হয়—কখনও-না-কখনও যে আত্মিক বা আধ্যাত্মিক সংকট আসে—বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় আসতে বাধ্য—তার বিহ্বলতা, বিমূঢ়তা

ও তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার আকুলতা, বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মানসিক আলোড়ন, ঈশ্বর আছেন কি নেই, থাকলে তাঁর সঙ্গে কী সম্পর্ক, কতটুকু সম্পর্ক —এ সব প্রশ্ন সমস্যা আর অনুভূতির অন্তর্স্রোতের ছবি কি আজকের কথা-সাহিত্যে পাওয়া যায় ? যদি বলা হয় ঔপন্যাসিকের উপরে এসব সমালোচকের বড্ড বেশী tall claim, চড়া দাবি ; তার উত্তরে সবিনয়ে বলব, এসব না হয় অত্যধিক প্রত্যাশা বলে স্বীকার করা গেল, কিন্তু অসুস্থ প্রতিযোগিতাভাড়িত আর শোষণভিত্তিক নির্মম জীবনসংগ্রামের অপচয় আর বেদনার রূপটাই বা কই কথাসাহিত্যে সম্যক্ প্রতিফলিত হচ্ছে ? শুধু জৈব কামনা বাসনাতেই তো মানুষ বাঁচে না, তার অন্তরের আরও বৃহত্তর তাগিদ আছে। আছে বাঁচবার ক্ষুধা, নিসর্গপ্রীতি, রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও নাগরিক চেতনা, কর্মে সাফল্যের উল্লাস ও ব্যর্থতার পীড়ন, আদর্শবাদ, শিল্প-সাধনার তন্ময়তাপ্রসূত আবেশ ও অতৃপ্তি, জ্ঞানপিপাসা, নীতিবোধ, ন্যায়ের তৃষ্ণা ও অন্যায় অসহিষ্ণুতা, মানুষের মনোজীবনে একান্তরক্রমে নিরন্তর প্রবহমান প্রেম ও বিদ্বেষের জোয়ার-ভাঁটার খেলা, শত দুঃখ দৈন্যের মধ্যেও বাঁচবার আনন্দ ও জীবনরস ইত্যাদি। জৈব কামনা বাসনা সমেত এসব বিচিত্র লীলায় মণ্ডিত রূপের আলেখ্য তো কই মিলছে না আমাদের কথাসাহিত্যে ? তবে পাঠকের মন ভরবে কী প্রকারে ? পাঠক বলতে অবশ্য এখানে আমি গ্রহণ বর্জন নির্বাচনক্ষম পাঠককেই বোঝাচ্ছি, গড্ডলবাহী পাঠক নয়।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা সম্ভবতঃ আরও পরিষ্কার হবে।

শ্রীবিমল মিত্র আজকের দিনের একজন শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক। তাঁর গল্প বানাবার ও বলবার ক্ষমতা অদ্ভুত। এমন story telling-এর প্রতিভাযুক্ত লেখক আজকের অর্থাৎ নবীন কালের বাংলা সাহিত্যে খুব কমই আছেন। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, তাঁর এই কাহিনী বয়নক্ষমতা একটা বিশেষ ছাঁচে গড়ে উঠেছে। তিনি ঘটনার বিচিত্র সংঘাত সৃষ্টি ক'রে পাঠকমনে suspense বা কী হয় কী হয় গোছের কৌতূহল তৈরী করতে খুবই দক্ষ, যা প্রায় ডিটেকটিভ নভেল সুলভ কৌতূহলের পর্যায়ে পড়ে ; তাঁর উপন্যাসগুলিতে সামাজিক জীবনের উপাদানেরও কিছু অভাব নেই, এমনকি রাজনৈতিক প্রসঙ্গেরও অবতারণা কোন কোনটিতে দেখতে পাওয়া যায়। শেষোক্ত বৈশিষ্ট্যদ্বয় তাঁর বস্তুনিষ্ঠ মনোভাবের পরিচয় তাতে কোন সন্দেহ নেই : কিন্তু এই বস্তুনিষ্ঠা অন্তর্মুখ কোন তাৎপর্য বহন করে না, কোন গভীর জীবনরসের পরিচয় দেয় না বা মানুষের জীবন সম্পর্কে কোন কবিপ্রাণতা বা দার্শনিকতার ইঙ্গিত

ফোটায় না। একেবারেই কবি-স্বভাববর্জিত এই লেখক। বিমল মিত্র বস্তু ঘেঁষা ঘটনার সরণী অনুসরণ করে চলেন, তাঁর পর্যবেক্ষণের চক্ষু খুবই তীক্ষ্ণ, কিন্তু মনের চক্ষু আর একটু উন্মীলিত হলে কী সুখেরই না হত!

শ্রীবিমল মিত্রকে আমাদের সাহিত্যে নানা দিক দিয়েই সমারসেট ম'মের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। ম'ম একজন পাকা গল্প বলিয়ে কিন্তু কবিপ্রাণতা বা দার্শনিক অভীপ্সাবর্জিত। যদিও তাঁর বইগুলির এখানে সেখানে দার্শনিক প্রসঙ্গ বিস্তর ছড়িয়ে আছে কিন্তু তিনি মূলত: কবি বা দার্শনিক মেজাজের লেখক নন। ফলে ইংরেজী কথা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ লেখকের মেলায় দ্বিতীয় সারির উপরে কোনদিন তাঁর জায়গা হল না। তিনি তাঁর 'Cakes and Ale' উপন্যাসে টমাস হার্ডিকে ব্যঙ্গ করেছেন কিন্তু মানব অস্তিত্ব সম্পর্কে দার্শনিক বিষাদযুক্ত ঔপন্যাসিক হার্ডির নাগাল ধরা বরাবরই ম'মের আয়ত্তের বাইরে রয়ে গেল।

বিমল মিত্রের স্বগোত্র আর একজন সাম্প্রতিক লেখক হলেন দীপক চৌধুরী। এঁরও গল্প সৃষ্টি তথা গল্প-বিন্যাসের ক্ষমতা উচ্চস্তরের। বিমল মিত্র যেমন তাঁর 'সাহেব বিবি গোলাম' আর 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' উপন্যাস দুটিতে বিচিত্র ভিন্নমুখী ঘটনার স্রোত সৃষ্টি করে শেষ অবধি সেগুলিকে একটি মোহানায় এনে নিপুণভাবে সম্মিলিত করেছেন, দীপক চৌধুরীও তেমনি তাঁর 'পাতালে এক ঋতু' আর 'শঙ্খ বিষ' উপন্যাসে জটিল ঘটনাবর্ত রচনা ক'রে চূড়ান্ত পর্যায়ে তাদের একমুখী করেছেন এবং পরিণামে তাদের উপসংহার-সমুদ্রে এনে মিলিয়েছেন। কিন্তু অতিরিক্ত স্মার্টনেস, ভঙ্গীপ্রাধান্য, বুদ্ধিচাতুর্যের ঝলক দ্বারা তাক লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা এই লেখকের কয়েকটি মুদ্রাদোষ। এ সবের বদলে তাঁর লেখায় যদি আর একটু কারুণ্যের অনুভূতি, আর একটু কবিপ্রাণতা থাকত সে বড় মধুর হত। দীপক চৌধুরীর 'এই গ্রহের ক্রন্দন' উপন্যাস ক্রন্দনে ভরা কিন্তু এ ক্রন্দন কারুণ্য জাগায় না বরং ক্রন্দনের আতিশয্যে পাঠকচিত্ত প্রতিহত করে। রচনারীতিতে বহিরঙ্গ ঘটনার উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়াতেই যে এমনটা হয়েছে তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

উপন্যাস পর্যবেক্ষণনির্ভর শিল্প বটে কিন্তু পর্যবেক্ষণই তার একমাত্র অবলম্বন নয়। পর্যবেক্ষণের ফলাফল গ্রথিত করার সঙ্গে সঙ্গে সে সব ফলের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করাও একান্ত আবশ্যক—মনন, অনুভাবন, কবিজনোচিত কল্পনা ও দার্শনিক চিন্তাশীলতা প্রভৃতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই বিশ্লেষণ নিষ্পন্ন করতে হয়। পৃথিবীর সাহিত্যে পর্যবেক্ষণনির্ভর কথা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হলেন

ব্যালজাক। কিন্তু ব্যালজাকই উপন্যাসশিল্পের শেষ কথা নয়, তাঁর আগে এবং পরে এমন অনেক দিক্‌পাল ঔপন্যাসিক জন্মগ্রহণ করেছেন যাঁরা ব্যালজাকের ধারা থেকে স্বতন্ত্র ধারায় উপন্যাস শিল্পের চর্চা করেছেন। তাঁরা উপন্যাসে মানুষের আত্মার সন্ধান করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিপ্লবপূর্ব রুশ উপন্যাসশিল্পের কথা ধরা যায়। ডস্টয়েভস্কির 'Crime and Punishment', 'Idiot' এবং 'Brothers Karamazov', টলস্টয়ের 'Anna Karenina', 'War and Peace' ও 'Resurrection' পড়লে পরিষ্কার বোঝা যায় পর্যবেক্ষণ বা observationই উপন্যাস শিল্পের একমাত্র উপজীব্য বিষয় নয়, তার সঙ্গে গভীর গূঢ় জীবনবোধও সংগ্রথিত হওয়া আবশ্যক। উল্লিখিত রুশ উপন্যাস সমূহের মানদণ্ডে যদি আমাদের সাহিত্যের উপন্যাসের গুণাগুণ বিচার করতে হয় তা হলে বলতেই হবে যে আমাদের উপন্যাস-সাহিত্য আজও শৈশবদশায় পড়ে আছে—বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও পরবর্তী অন্যান্য খ্যাতনামা ঔপন্যাসিকদের পুণ্যনাম সত্ত্বেও। একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসসৃষ্টির প্রতিভায় ডস্টয়েভ্‌স্কি ও টলস্টয়ের কৃতিত্বের কাছাকাছি কোন একটা সীমারেখায় গিয়ে পৌঁছেছিলেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের পরে বাংলা উপন্যাস শিল্পের সুস্পষ্ট অপকর্ষ ঘটেছে। আমরা মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের গর্ব করি কিন্তু একমাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু উপন্যাসে ছাড়া নির্জ্ঞান মনের সূক্ষ্ম ব্যবচ্ছেদক্রিয়া বাংলা উপন্যাসে হয়ই নি বলতে গেলে। বঙ্কিমচন্দ্র সৌন্দর্যপ্রাণতা ও মনস্বিতার সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে উপন্যাসর যে একটি অখণ্ড নিটোল রূপ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন পরবর্তী কালে সেই ধারা রক্ষিত হয়নি। গভীর গূঢ় জীবনানুভূতির রূপায়ণের বদলে রম্যতার আদর্শ উপন্যাসে অনুপ্রবেশ করে উপন্যাসের অগ্রগতি ব্যাহত করেছে। অবশ্য এ কথার মানে এ নয় যে সকল ঔপন্যাসিকের শিল্পকর্ম সম্পর্কে এ সমালোচনা প্রযোজ্য—তবে মোটামুটিভাবে বোধ হয় এই উক্তি করা চলে। স্বর্গত মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় শরৎচন্দ্রের গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের তুলনা ক'রে লিখেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন যুগস্রষ্টা আর শরৎচন্দ্র হলেন যুগপ্রকাশক। যুগস্রষ্টা আর যুগপ্রকাশকের কাজের মধ্যে অবশ্যই কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে। বর্তমান আলোচনায় অনুষঙ্গে এই পার্থক্যটি সকলকে স্মরণ রাখতে অনুরোধ করব।

এবার বর্তমান বাংলা সাহিত্যের একটি বিতর্কিত বিষয়ের অবতারণা করতে চাই। বিষয়টি নিয়ে এরই মধ্যে অনেক তর্কের ঝড় বয়ে গেছে, সেই সূত্রে বাদানুবাদের অনেক ধূলিঝড় উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। প্রশ্নটি শ্লীলতা অশ্লীলতা সংক্রান্ত।

এবং যেহেতু কথাসাহিত্য জীবনের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ রূপের প্রকাশক, মানুষী জীবনধারার সবচেয়ে নিকটতর, এবং ঘটনাজীবিত, সেই কারণে কথাসাহিত্যের প্রসঙ্গেই শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতা সর্বাধিক। এই বিষয়টিকে ঘিরে পক্ষে এবং বিপক্ষে যে সব ধরতাই কথা সচরাচর বলা হয় তার পুনরাবৃত্তি আমি করব না, ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির বিচারের চেষ্টা করব।

প্রথমেই আমি বলতে চাই যে, জীবনের সত্যরূপ সাহিত্যে প্রতিফলনের অজুহাতে অশ্লীলতাকে যাঁরা সমর্থন করেন তাঁরা একটা বস্তাপচা পুরনো মতের প্রতিধ্বনি করেন মাত্র। অশ্লীলতার cult উনিশ শতকের শেষার্ধের ফরাসী সাহিত্যে প্রাকৃতবাদের মধ্যে এবং তারই ঢেউয়ের ধাক্কায় বিশ শতকের প্রথম পাদের ইংরেজী সাহিত্যে একটি চালু মুদ্রা ছিল, কিন্তু সেই মুদ্রা বহুদিন অচল বলে পরিত্যক্ত হয়েছে। এদেশে এবং বিদেশে সেই অচল টাকাকে যাঁরা এখনও সচল টাকা বলে চালাতে চান বুঝতে হবে তাঁদের পুঁজি অতিশয় সীমাবদ্ধ আর সেই কারণে অচল টাকার সাহায্যে তাঁদের ব্যবসা চালানোর অপচেষ্টা। আমাদের লেখকদের একাংশ—তাঁদের মধ্যে নবীন-প্রবীণ দুই শ্রেণীর লেখকই আছেন—বিদেশের একটা পরিত্যক্ত, উচ্ছিষ্ট মত নিয়ে হৈ-চৈ মাতামাতি করছেন, দেখলে ক্ষোভের পরিবর্তে করুণারই উদ্রেক হয় বেশী। তাঁরা জানেনও না যে তাঁরা পুরনো একটা মতের জাবর কাটছেন। আধুনিকতার অভিমানে ডগমগ তরুণের মতান্ধতার কারণ বুঝি কিন্তু প্রবীণের মধ্যে যাঁরা শিঙ্ ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকতে চাইছেন তাঁদের উৎসাহাতিশয্যের কারণ বুঝিনে। খুব সম্ভব তাঁরা প্রমাণ করতে চান বয়সে বুড়িয়ে গেলেও মনে মনে এখনও তাঁরা তরুণ আছেন, তাঁদের আধুনিকতায় মর্চে ধরেনি। কিন্তু এ আত্মস্তোক মাত্র, এর দ্বারা নিজেকেও ভোলানো যায় না অপরকেও ভোলানো যায় না। বয়সে প্রবীণ হয়েও যে লেখক অন্যথা-শ্রদ্ধেয় হয়েও এ ব্যাপারে তরুণের সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলতে চান তিনি তরুণ সম্প্রদায়েরও যথার্থ শ্রদ্ধা পান বলে মনে হয় না। বরং প্রবীণের এবম্বিধ আচরণে তরুণ মনে মনে বোধ হয় লজ্জাই পান।

সাহিত্যে দেহবাদের আতিশয্য বিলাসিতাময় ভোগকেন্দ্রিক বিকারী জীবনের সাহিত্যিক প্রক্ষেপ মাত্র। একে তাঁরাই মর্যাদা দেন যাঁরা জীবনের কর্মময় সংগ্রামময় ঘন্দ্ব ও অভীপ্সাময় জীবনের রূপের সঙ্গে সম্যক্ পরিচিত নন বা পরিচিত হলেও তার গুরুত্ব বুঝতে অপারগ। অলস বিলাসী পরশ্রমভুক্ সামাজিক পরগাছাদের জীবনেই শুধু অসার মন-দেওয়া-নেওয়ারূপ মর্মলীলাচর্চার অখণ্ড অবসর মেলে, কায়িক ও মানসিক শ্রমের দ্বারা মাথার-ঘাম-পায়ে-ফেলা জীবন

সংগ্রামের সৌরবর্জিত কর্মভিত্তিক জীবনে এ-জাতীয় বিলাসের অবকাশ অতিশয় সংকুচিত। তবু কেন এই ধরনের ভোগোদ্‌গারের মলিন ছবি ফুটিয়ে তুলতে আমাদের কিছু কিছু লেখক আকর্ষণ বোধ করেন? সে এজন্য যে, ইউরোপের কোন কোন দেশে ও আমেরিকায় এখনও এই বাসি পর্যুষিত উনিশ শতকীয় সাহিত্যরীতির প্রতি মোহের অবসান হয়নি এবং কে না জানেন যে বাংলার লেখকদের উপর পশ্চিমী প্রভাব অতিশয় প্রবল? অথচ যাঁরা কথায় কথায় ইউরোপের দোহাই পাড়েন তাঁরা এটা খেয়াল করেন না যে ইউরোপের পূর্বার্ধের দেশগুলিতে এ-জাতীয় বিকৃত সাহিত্যের চর্চাও নেই চাহিদাও নেই। সে সব দেশের সমাজতন্ত্রী প্রভায় কর্মভিত্তিক সাহিত্যের আদর্শকে কথাসাহিত্যের একেবারে মর্মমূলে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ধনতন্ত্রের ধ্বংসে ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থার গর্ভেই শুধু এ জাতীয় বিকলাঙ্গ সাহিত্যশিশুর জন্ম সম্ভব। তাছাড়া এই বিকলাঙ্গ শিশুকে দেখিয়ে প্রচুর পয়সা পেটা যায়, সেটাও এই ধরনের স্বৈরাচারের প্রতি এক শ্রেণীর লেখকের প্রলুব্ধ হওয়ার অন্যতম প্রধান হেতু।

নিরাবরণ দেহবাদকে প্রশ্রয় দিয়ে বাংলা ভাষায় সম্প্রতি যে ক'টি ঝাঁঝালো বই লেখা হয়েছে সেগুলির সাহিত্যমূল্য সামান্য, উত্তেজনামূল্য অসীম। এই উত্তেজনারসকেই সাহিত্যরস বলে স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল চালাবার চেষ্টা করছেন। সরলমনা পাঠক এই প্রচারের খপ্পরে পড়ে বিভ্রান্ত হচ্ছেন। সাহিত্যরসই বটে! সাহিত্যরসের অপরিহার্য প্রাথমিক পূর্বশর্ত হল জীবনের গভীরতার বোধ—অনেক দুঃখতাপ সইলে, অনেক ঠেকলে দেখলে ও শিখলে তবে জীবনে এই গভীরতা আসে। বয়সের ভার, অভিজ্ঞতার ভার এসব কথার কথা নয়। এই পরি-প্রেক্ষিতে তরুণবয়সী সাহিত্য প্রচারকদের একাংশের মুখে যখন শুনি তাঁরা জীবনের সত্যরূপ ফুটিয়ে তোলবার প্রেরণায়, প্রকৃত সাহিত্য রসসৃষ্টির তাগিদে, নগ্ন যৌনতার পোষকতা করছেন তখন হাসব কি কাঁদব বুঝতে পারিনে। জীবনের সত্যরূপের কতটুকু তাঁরা জানেন? কী হলে রচনা সাহিত্য হয়ে ওঠে বলে তাঁদের ধারণা? 'সাহিত্য হয়ে ওঠাটা' যেন যে-কোন রচনার পক্ষে একটা অবলীলাবিত হস্তামলকবৎ ব্যাপার। 'শ্লীল-অশ্লীলের প্রশ্নটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল লেখাটা সাহিত্য হয়েছে কি হয়নি'—এই প্রকার যুক্তির প্রবোচনার সঙ্গে আজকাল প্রায়শঃ সাক্ষাৎ ঘটে। অহো! কী অপূর্ব সূক্ষ্ম চুলচেরা বিশ্লেষণপ্রবণ সাহিত্যজ্ঞান! তরুণদের এবংবিধ যুক্তিক্রিয়া তাঁদের immaturityকেই আরও চিহ্নিত করে যায়।

অশ্লীলতার সপক্ষে যাঁরা লেখনী চালনা করেছেন তাঁদের এই প্রকার একটা

আত্মাভিমান আছে যে তাঁরা প্রগতির শিবিরের লোক, আর যাঁরা বিরুদ্ধতা করছেন তাঁরা সব প্রতিক্রিয়াপন্থী, রক্ষণশীল, পিউরিটান, শুচিবায়ুগ্রস্ত। আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে আমি এই মতের প্রতিবাদ করতে চাই। সবিনয়ে অথচ পরিপূর্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে বলব, সাহিত্যে যৌনতার আদর্শটাই প্রতিক্রিয়াশীল, সেকেলে, কালবাহিত। 'কালবাহিত' এইজন্ত যে ইতিমধ্যে বিশ্বসাহিত্য-স্রো তস্বিনী দিয়ে যে কত জল গড়িয়ে গেছে সে খবর যৌনতাবাদীদের কানে গিয়ে এখনও পৌঁছয়নি। যে সব লেখক সুরুচি ও সুনীতির পক্ষাবলম্বী, নবীন হোন কি প্রবীণ হোন, তাঁরাই আসলে প্রগতিশীল, অগ্রসর চিন্তার ধারক ও বাহক। টলস্টয় লিখেছেন, জীবনের কদর্য চিত্র উন্মোচিত করাটা একটা কদর্য কাজ। নিশ্চয় এমনতরো যে কাজ তা প্রগতির কোঠায় পড়ে না। সমাজ ও সাহিত্যের আবহাওয়া উত্তরোত্তর নির্মল করবার যে চেষ্টা তারই অপর নাম প্রগতিশীলতা।

আমার বক্তব্য প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পরিশেষে দুটি একটি খুচরো বিষয়ের আলোচনা করে বক্তব্যের উপসংহার করতে চাই। এই টুকরো বিষয়ের একটি হচ্ছে তথাকথিত ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টির সাম্প্রতিক হিড়িকের বিরুদ্ধে পাঠককে সতর্ক করে দেওয়া। 'যা চক চক করে তাই সোনা নয়।' ঐতিহাসিক উপন্যাসের নামে বাজারে যে সব বই চলছে তার সবই ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। বরং এমন বললেই প্রকৃত কথা বলা হবে যে, বাদশাজাদী আর বাঁদীদের কেচ্ছাকাহিনী সংবলিত যৌনতার মালমসলা মেশানো প্রায়শঃ হারেম ভিত্তিক এইসব তথাকথিত ইতিহাস রসাশ্রিত উপন্যাসের বেশীর ভাগই হল ঝুটা মাল। এই শ্রেণীর রচনার এমনই ঢল নেমেছে যে ওই প্লাবনের মুখে আসল ও নকলে পার্থক্য করা একটা কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঐতিহাসিক উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে কিছু নূতন বস্তু নয়। তার রূপটি দীর্ঘদিনের চর্চায় দৃঢ়বদ্ধ সুনিরূপিত হয়ে গেছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ রথীমহারথীদের দ্বারা পুষ্ট সুসমৃদ্ধ ঐতিহ্য যেখানে বর্তমান, সেই স্থলে ঐতিহাসিক উপন্যাস নিয়ে আর যাই হোক ছেলে-খেলা করা চলে না।

এর পরের বিচার্য বিষয় কথাসাহিত্যের রচনায় সাধু ভাষা প্রয়োগের আর আগের মতো সার্থকতা আছে কি না। আজকের প্রায় শতকরা পঁচানব্বই ভাগ লেখক চলতি ভাষায় গল্প উপন্যাস রচনা করছেন এটা লক্ষ্য করবার মতো। তার অর্থ সাধু ভাষাকে প্রায় সম্পূর্ণ হটিয়ে দিয়ে চলতি ভাষা বাংলা কথা সাহিত্যের আঙিনা দখল করে নিয়েছে। দুয়োরাণী আর সুয়োরাণীর কোন্দলে

একের সম্পূর্ণ হার, অন্যের সম্পূর্ণ জিত হয়েছে। দুয়োরাণী অশ্রুমুখে বনবাসে উদ্ভ্রান্তা, সুয়োরাণী পূর্ণ গৌরবে রাজ্যপাটে সমাসীনা। কিন্তু এর ফল সবটাই ভালো হয়েছে এমন কথা কি বলা যায়? লোকে বলে চলতি ভাষা নাকি অধিক প্রাঞ্জল, অধিক সুবোধ্য। কথাটা পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় না। অন্ততঃ উপন্যাস ছোট গল্পের বেলায় এ কথা বোধ হয় সর্বত্র খাটে না। সাধুভাষা কৃত্রিম বলে যতই নিন্দিত ধিকৃত হোক, সাধুভাষার একটা আলাদা স্বাদ আছে। বিশেষতঃ উপন্যাসে। এটা অভ্যাসের কথা নয়, মনে হয় সাধু ভাষার অন্তর্নিহিত প্রাঞ্জলতার জন্যই এই স্বাদুতা। বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস-গল্পকারগণ যথা বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে কেউ কেউ সম্পূর্ণতঃ এবং অন্য অংশকে তাঁদের শ্রেষ্ঠ গল্প-উপন্যাস সকল সাধু ভাষায় রচনা করেছেন, এটা অকারণ নয়। ভাষা চলতি হলেই তা প্রাঞ্জল হয় না বা স্বাভাবিক হয় না, আচার্য প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে মাথায় রেখেই এ কথা বলছি। তাঁর মতে মুখের কথা কলমের ডগায় না এলে নাকি মুখে কালি পড়ে। সব সময় বোধহয় পড়ে না। যাই হোক, আমি এখানে বিষয়টি সূত্রাকারে মাত্র উপস্থিত করলাম, সুধীজনেরা এর গুণাগুণ পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

সর্বশেষ বিচার্য, বাংলা ভাষার বিভিন্ন আঞ্চলিক dialect-এ কথা সাহিত্য রচিত হতে পারে কিনা। চরিত্রগুলিকে স্বাভাবিক ও প্রাণবন্তভাবে আঁকা যদি লেখকের কাম্য হয়, তবে নিশ্চয়ই হতে পারে। তবে আমার মনে হয় এই ক্ষেত্রে কোথাও না কোথাও একটা সীমারেখা টানা উচিত। নয়তো সাহিত্যের ক্ষেত্রে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হতে পারে। কথোপকথনের ভাষাকে আঞ্চলিক রূপদানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাংলা সাহিত্যে অনেক দিন থেকেই হয়ে আসছে, নাটকে দীনবন্ধু মিত্রের কাল থেকে এই চেষ্টার শুরু হয়েছে, হালের নাট্য সাহিত্যে এর প্রকট রূপ প্রকাশ পেয়েছে 'দুখীর ইমান' ও 'নতুন ইহুদী' নাটকে। প্রথমটিতে উত্তর বঙ্গের, দ্বিতীয়টিতে পূর্ব বঙ্গের ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। উপন্যাসে আঞ্চলিক ভাষায় কথোপকথনের প্রকৃষ্ট নজীর হল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'। কিন্তু আমার বিনীত ধারণা, সংলাপ বা কথোপকথনের ভাষার ক্ষেত্রেই এই চেষ্টা সীমাবদ্ধ থাকা উচিত, বর্ণনা বা বিবৃতির ভাষায় এর অনুপ্রবেশ ঘটা উচিত নয়। সেখানে মোহিতলাল কথিত ভাগীরথী তীরবর্তী গদ্যের ভাষারই আধিপত্য থাকা বাঞ্ছনীয়।

বাংলা সমালোচনা সাহিত্য

বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ঐতিহ্য অন্ততঃ একশত বৎসরের পুরাতন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর থেকেই এই বিভাগীয় রচনায় অনুশীলন হয়ে আসছে এবং এই একশো বছরের কিছু বেশী সময়সীমার মধ্যে বহু-বহু বিশিষ্ট লেখকের দানে বিভাগটি সমৃদ্ধ হয়েছে। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের কয়েকজন প্রসিদ্ধ সমালোচক হলেন বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রমেশচন্দ্র দত্ত, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর, গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য, বীরেশ্বর পাঁড়ে, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি, যদিও এঁদের কারও কারও কর্মকাল উনিশ শতকের পরিধি ছাড়িয়ে বিশ শতকেও প্রসারিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের মধ্যমণি। দুজনেই অসাধারণ সৃষ্টি-কুশল লেখক। তাঁদের সৃষ্টি-কার্যের সঙ্গে সমন্বিত হয়েছে তাঁদের সমালোচনী প্রতিভা। দুই ভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্য একত্র মিলে সোনায় সোহাগা হয়েছে। এর থেকে এমন সিদ্ধান্ত করা বোধ হয় নিতান্ত সঙ্গতিহীন হবে না যে, সেই সমালোচনাই শ্রেষ্ঠ যে সমালোচনার পিছনে সৃষ্টির আবেগ থাকে। অবশ্য এ সম্বন্ধে ধরাবাঁধা কোন নিয়ম খাড়া করা বোধ হয় শক্ত ব্যাপার। কেন না বিশ্বসাহিত্যে, এবং আমাদের সাহিত্যেও এমন একাধিক প্রসিদ্ধ সাহিত্য সমালোচক আছেন, যাঁরা জীবনে এক আঁচড় সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনা করেননি। সমালোচনার কর্ম মূলতঃ বিচার বিবেচনার মূল্যায়নের; মস্তিষ্কই এই কর্মের মুখ্য আধার আর সাহিত্য সৃষ্টিকর্মে প্রধানতঃ প্রাণ ও হৃদয়ের উজ্জীবন সক্রিয়। এই দুই ভিন্ন গোত্রের ক্রিয়ার মধ্যে যে যোগ-সূত্র থাকতেই হবে তার কোন কথা নেই। তবে মস্তিষ্ক আর হৃদয়বত্তা একত্র সম্মিলিত হলে যে সে বড়ো চমৎকার হয় দেখতে, আশা করি এ সম্বন্ধে কারুরই মতভেদ হবে না।

কিঞ্চিদধিক একশো বছর সময়ের মধ্যে বাংলায় যে সমালোচনা সাহিত্যের ধারা গড়ে উঠেছে তা যথেষ্ট পুষ্ট হলেও, একমুখী নয়। নানা বিরুদ্ধ আদর্শের সংঘাতে ও আলোড়নে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের একটি স্থির সংহত রূপ গড়ে উঠতে পারেনি। যাকে স্ট্যাণ্ডার্ড সমালোচনা রীতি বলতে পারা যায়, তেমন রীতির সৃষ্টি হয়নি। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সমালোচকেরা সমালোচনার মানদণ্ড নিরূপণের ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী আদর্শ গ্রহণ করে সমালোচনায় বৈচিত্র্যবশে

সৃষ্টি করেছেন কিন্তু একমুখী আদর্শের অনুসরণের ফলে যা হতে পারত, সমালোচনার ঐতিহ্যকে জোরালো করতে পারেননি। বিপরীত আদর্শের চর্চার দ্বারা তাঁরা একে অপরের শক্তি ক্ষয় করেছেন মাত্র।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বঙ্কিমচন্দ্র হলেন আমাদের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমাজমুখী সাহিত্য সমালোচক। সাহিত্যের আলোচনার বৃত্ত থেকে তিনি সমাজকে কোন সময়েই বাদ দেননি। বরং তাঁর চিন্তায় বরাবর এই ধারণাই সমর্থন লাভ করেছে যে, সাহিত্য সমালোচনা সমাজভিত্তিক হলে তবেই তা সত্যিকারের সমালোচনা হয়। আর্টস্-ফর-আর্টস্-সেক অর্থাৎ কলাকৈবল্যবাদী মতের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের কোন আকর্ষণ ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের ধারায় তাঁর নিজের কালে এবং পরবর্তী কালে যেসব সমালোচক লেখনী চালনা করেছেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, শশাঙ্কমোহন সেন, যতীন্দ্রমোহন সিংহ, মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতি। সমাজসচেতন সমালোচনা ধারায় মোহিতলালকেই বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধক বলা যায়।

অপর পক্ষে রবীন্দ্রনাথ হলেন রসবাদী সমালোচন-রীতির শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত স্থল। তাঁর সমালোচনায় সংস্কৃত রসতত্ত্বের সঙ্গে ব্যক্তিগত উপলব্ধির আনন্দ মিশে সমালোচনাকে এমন এক স্তরে নিয়ে গেছে যেখানে সমালোচনা আর সমালোচনা থাকেনি, তা নিজেই সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। উপমা আর উৎপ্রেক্ষার ঐশ্বর্যে, বক্তব্যের মৌলিকতায়, ভাবের প্রাচুর্যে, রসানুভবের গাঢ়তায় রবীন্দ্র-সমালোচনাকে রসবাদী তথা নন্দনবাদী সমালোচন-রীতির সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ বলা যেতে পারে। তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্য' 'আধুনিক সাহিত্য' 'সাহিত্যের পথে', 'সাহিত্যের স্বরূপ' প্রভৃতি বই বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে চিরকালীন আস্বাদনের বস্তু। সে সব গ্রন্থে ব্যক্তিসাক্ষিক রসানুভূতি ও আনন্দচেতনার শীর্ষ বিন্দু স্পর্শ করা হয়েছে। যদিও সত্যের খাতিরে এ কথা স্বীকার করা ভালো যুক্তিনিষ্ঠা আর তথ্যাশ্রয়িতা রবীন্দ্র সমালোচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহের অন্তর্গত নয়। তার উপর তাঁর আলোচনায় বস্তুগ্রাহ্যতার স্পর্শ কিছু কম এবং অতীন্দ্রিয় ভাবের প্রভাব কিছু বেশী, সেজন্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নিত্যকৃষ্ণ বসু, রমাপ্রসাদ চন্দ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শশাঙ্কমোহন সেন, বিপিনচন্দ্র পাল, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, মোহিতলাল প্রমুখ শক্তিমান্ সমালোচকগণ, রবীন্দ্র কাব্যে ও রবীন্দ্র সমালোচনায় দোষানুসন্ধান করেছেন। কিন্তু এইসব সমালোচকদের প্রদর্শিত ত্রুটি যদি সত্য বলেও স্বীকার করে নেওয়া যায়—এত এত বিশিষ্টজন প্রায় একই ভাবের কথা বলেছেন,

তাঁদের অভিযোগের ভিত্তি নিশ্চয়ই কিছু আছে—তা হলেও রবীন্দ্র সমালোচনা সাহিত্যের কোন তুলনা হয় না। তাঁর "শকুন্তলা" "মেঘদূত" "কাব্যে উপেক্ষিতা" "কাদম্বরী", "ছেলে-ভুলানো ছড়া," "রাজসিংহ" প্রভৃতি সমালোচনা প্রবন্ধ বারংবার পড়েও পুরনো হয় না এমনি তাদের রসের ব্যঞ্জনা। সেসব নিজেরাই সৃষ্টি—শ্রেষ্ঠ কাব্যোৎকর্ষমণ্ডিত।

রবীন্দ্রনাথের ধারায় পরে যেসব লেখক সমালোচনা সাহিত্যের চর্চা করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অজিতকুমার চক্রবর্তী, মোহিত-চন্দ্র সেন, প্রিয়নাথ সেন এবং একালের প্রমথনাথ বিশী। রসসমালোচনায় তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন, নিজ নিজ ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যসমেত।

সমাজ সচেতন সমালোচনা এবং ব্যক্তিভিত্তিক রসবাদী সমালোচনা ছাড়া আর একটি সমালোচনার ধারা আছে বাংলায় যা একান্তভাবে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মে গড়ে উঠেছে এবং স্বভাব লক্ষণে অ্যাকাডেমিক বা কিতাবী। এই প্রণালীতে যাঁরা সমালোচনার চর্চা করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ডঃ সুধীরকুমার দাসগুপ্ত, অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী, ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ডঃ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, ডঃ উমা রায় এবং আরও কেউ কেউ। এই ধারার সমালোচনার শক্তি এখানে যে, তা শাস্ত্রচর্চার নিয়মশৃঙ্খলার দ্বারা বলপুষ্ট; দুর্বলতা এখানে যে, আধুনিক সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রায়ই সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের সূত্রগুলির প্রয়োগযোগ্যতা দেখাবার কোন চেষ্টা করা হয় না। প্রয়োগযোগ্যতা আদৌ আছে কিনা সে বিষয়েও বোধ হয় এই শ্রেণীর আলোচকগণ স্থিরনিশ্চয় নন। নিছক প্রাচীন তত্ত্বের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বিশেষ কোনো সার্থকতা দেখা যায় না, যদি না সেই সব তত্ত্বের সঙ্গে বর্তমান-কালীন সৃষ্টি কর্মের সম্পর্কস্থাপনের চেষ্টা করা হয়। এতে এক ধরনের বিশুদ্ধ বুদ্ধিচর্চার আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায় কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় না। বর্তমান কালীন উপন্যাস, ছোট গল্প, কবিতা, নাটক—এসবের ক্ষেত্রে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের সূত্রসমূহের উপযোগিতা কতটা, সেইটে যতক্ষণ না নিরূপণের চেষ্টা হচ্ছে ততক্ষণ এ জাতীয় অনুশীলন বহুলাংশে ব্যর্থ। এবংবিধ বৈদগ্ধ্যের অনুশীলনে স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তি ও বিদ্যার উৎকর্ষ সাধিত হতে পারে, কিন্তু সাহিত্য-সমাজ তার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হয় না।

তাছাড়া সংস্কৃত আলংকারিকদের যুগ থেকে এ যুগ বহুদূরে সরে এসেছে। আমরা পারমাণবিক যুগে বাস করছি। মম্মটভট্ট, দণ্ডী, ভামহ, বিশ্বনাথ কবিরাজ,

আনন্দবর্ধন, অভিনব গুপ্ত, প্রমুখ আলংকারিকেরা নিজ নিজ যুগের কাব্যকৃতির স্বরূপলক্ষণ অভ্রান্তভাবে নিরূপণ করে থাকতে পারেন, কিন্তু একালের মন, মনন ও যন্ত্রণা নিয়ে বেঁচে থেকে তাঁদের উপর এত নির্ভরতা কেন? আমাদের এ যুগের প্রশ্ন সমস্যা স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাঁদের কালের কতটুকু মিল? দেখে শুনে কেমন যেন আমার সন্দেহ হয়, এও এক ধরনের কায়েমী স্বার্থের চর্চা যাকে নিরুৎসাহ করলে আমাদের লাভ বই ক্ষতি হবে না। রাষ্ট্রে সমাজে অর্থনীতিতেই যে শুধু কায়েমী স্বার্থ আছে তা তো নয়, বিদ্যা চর্চায়ও আছে। এ কালের পরিধিতে বাস করে কথায় কথায় সে কালের দোহাই পাড়লে প্রতিক্রিয়াশীলতাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয় মাত্র।

এই তিনটি ধারা ছাড়াও বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে আর একটি ধারা আছে যা ইতিহাসভিত্তিক। অর্থাৎ সাহিত্যের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে এই বর্গের সমালোচনা সাহিত্যের কলেবর গড়ে উঠেছে এবং বেশ সুপুষ্ট এই কলেবর। গত শতাব্দীর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আর "বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব"-এর রচয়িতা রামগতি ন্যায়রত্ন থেকে আরম্ভ করে হরিশ্চন্দ্র মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, সুকুমার সেন, মনমোহন ঘোষ প্রমুখের মধ্য দিয়ে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব চৌধুরী, গোপাল হালদার, ভোলানাথ ঘোষ পর্যন্ত অনেকেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। বঙ্কিম ও রমেশ-চন্দ্রের রচনা অবশ্য ইংরেজীতে। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ দীনেশচন্দ্রের—পণ্ডিতদের ভুল ভ্রান্তি সত্ত্বেও; তার পরেই ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের নাম করতে হয়। মৌলিক অনুসন্ধান আর গবেষণার বুনিয়াদের উপর এই দু'জন এঁদের সুবৃহৎ বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসের সৌধ দাঁড় করিয়েছেন উল্লিখিত সকলের রচনাই অবশ্য সমান মৌলিকতা গুণসম্পন্ন নয়। কারও কারও রচনায় অপরের পরিশ্রমের সুফলের উপর নির্ভর করা হয়েছে। অবশ্য এ জাতীয় রচনায় এ ভিন্ন বোধ করি উপায়ও নেই। বাংলা নাট্যসাহিত্য ও লোকসাহিত্যের প্রণালীবদ্ধ সুবিশাল ইতিহাস রচনা করেছেন ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাঙালী জাতির ইতিহাস প্রণেতা ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম সাহিত্য ও সমাজের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা বিশেষভাবে চর্চা করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, আবদুল ওদুদ, যোগেশচন্দ্র বাগল, ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, বিনয় ঘোষ ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুশীল গুপ্ত প্রভৃতি।

এঁদের এই সমস্ত ইতিহাসভিত্তিক আলোচনার মূল্য যথেষ্ট। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ভাণ্ডার এঁদের দানে নিঃসন্দেহে পরিপুষ্ট হয়েছে।

সমালোচনার যে ক'টি বর্গ বা শ্রেণীর উল্লেখ করা হয়েছে সে ছাড়াও আর একটি সমালোচনার শ্রেণী ইদানীং বিশেষ কর্মতৎপর দেখতে পাওয়া যায়—এই শ্রেণীর সমালোচনাকে নাম দেওয়া যায় অধ্যাপক শাসিত সমালোচনা। বৃত্তিগত ভাবে যাঁরা অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করেন, তাঁরাই এই সমালোচনা-রাজ্যের অধীশ্বর। প্রধানতঃ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের পাঠ্যক্রমের প্রয়োজনে এই অধ্যাপক-শাসিত সমালোচনা সাহিত্যের জন্ম। এই সাহিত্যের কলেবর বিপুল। যেহেতু ব্যবসায়িক তাড়না এবং তরুণতর লেখকদের ক্ষেত্রে ডক্টরেট-ডিগ্রী প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা এই জাতীয় অনেক রচনার পিছনে উত্তেজকের কাজ করছে, সুতরাং কলেবর বিপুল না হওয়াটাই আশ্চর্য। অধ্যাপক-শাসিত সমালোচনায় অধ্যয়ন এবং অধ্যবসায় দুইয়েরই ছাপ অতি স্পষ্ট। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এ সমালোচনা পুনরাবৃত্তিমূলক, একই পুরনো কথার উপরে বার বার দাগা-বুলনোর ক্লান্তিকর রোমন্থন চেষ্টায় স্বাদহীন। চলতি যুগের সাহিত্যের সঙ্গে এই শ্রেণীর রচনার খুব কম ক্ষেত্রেই সজীব যোগ দেখতে পাওয়া যায়। প্রায়ই মমি নিয়ে কারবার। বিগত লেখকদের সৃষ্টিকৃতির মূল্যায়ন চেষ্টায় এক মধুসূদন, বঙ্কিম আর রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে একই কথা কত বার যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা হচ্ছে তার আর ঠিক ঠিকানা নেই। বাসী আর মামুলী কথার সে এক অন্তহীন মিছিল। ইদানীং অবশ্য এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে—অধ্যাপক-সমালোচকদের দৃষ্টি সমসাময়িক লেখকদের সৃষ্টিকর্মের উপর ক্রমশঃ পড়ছে। কিন্তু তা এখনও একটি সুস্পষ্ট আশাব্যঞ্জক লক্ষণে পরিণত হতে পারেনি। যেহেতু মৌলিকতাই এ ক্ষেত্রে বিচারের একমাত্র নির্ভর, দ্বিতীয় বা তৃতীয় হাতে মতামত চয়নের অর্থাৎ পরের মুখে ঝাল খাওয়ার অবকাশ কম, সেই কারণেই এ বিশেষ গোত্রের রচনার এলাকায় তেমন ভিড় দেখতে পাওয়া যায় না। এ জাতীয় রচনার ব্যবসায়িক সম্ভাবনা কম বলেও বোধ হয় এখানে ভিড় পাতলা।

অবশ্য অধ্যাপক-সমালোচকদের সম্বন্ধে যে-সব নিষ্করুণ মন্তব্য করা হল তাকে ঢালাও মনে করলে ভুল করা হবে। এই ক্ষেত্রেও উজ্জ্বল ব্যতিক্রম আছেন—যেমন মোহিতলাল মজুমদার, ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রভৃতি। রামেন্দ্রসুন্দরও বৃত্তিতে অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য মৌলিকতা তাঁর রচনায়। এঁদের রচনার ধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মোহিতলাল বৃত্তিগত ভাবে অধ্যাপনা কর্মে নিযুক্ত ছিলেন।

কিন্তু তাঁর মন-মেজাজ, দৃষ্টিভঙ্গী পুরাপুরি অধ্যাপকীয় মেজাজের বিরোধী। স্বাধীনচিত্ততা আর মৌলিকতা তাঁর ব্যক্তিত্বের একেবারে কেন্দ্রমূলে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁর সুবিদিত স্বাধীনতাপ্রীতি আর মত-স্বাতন্ত্র্যের জন্য শত্রু সৃষ্টি করার ব্যাপারে তাঁর এক অদ্ভুত-কুশলতা ছিল। নিন্দা এবং প্রশংসা দুইয়েতেই তিনি ছিলেন সমান অবারিত এবং কিছুটা একদেশদর্শী। এই ব্যাপারে তিনি বঙ্কিমের ঐতিহ্য অনুসরণ করেছেন। যাঁদের সঙ্গে তাঁর মতের ও মনের অমিল ছিল তাঁদের রচনা ভালো হলেও তাঁর অনুমোদন পায়নি; পক্ষান্তরে যাঁদের প্রতি ছিল তাঁর পক্ষপাত—সব সময়েই সে সে পক্ষপাত যুক্তিযুক্ত ছিল এমন বলা যায় না—তাঁদের প্রশংসায় সপ্তম স্বর্গে না চড়ানো পর্যন্ত তাঁর অন্তরের তৃপ্তি ছিল না। মোহিতলালের স্বভাবের এই প্রান্তীয় বৈশিষ্ট্য এসেছে তাঁর প্রকৃতির গভীর রাগ-বিরাগের সংস্কার থেকে। তিনি অতিশয় ভালো-লাগা মন্দ-লাগার সংস্কারাধীন মানুষ ছিলেন। কিন্তু মানুষটি ছিলেন নিখাদ খাঁটী সোনা। সাহিত্য সমালোচনায় হিসাবী বুদ্ধির ধার ধারতেন না। যখন যা সত্য বলে মনে করেছেন তাকে অকপট ভাষায় অভিব্যক্তি দিয়েছেন—বিশ্লেষণের মৌলিকতায় ও চিন্তার বলিষ্ঠতায়। ভাষা কিছু পাণ্ডিত্যাভিমানী, আড়ম্বরপূর্ণ ছিল তবে বক্তব্য ছিল পরিষ্কার। মোহিতলালের মতো ঐকান্তিক সারস্বত ব্রতধারী সংসারী বুদ্ধির অনধীন নির্ভীক সমালোচক যদি বাংলা সাহিত্যে আরও দু'-চারজন থাকতেন তো আজ বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের চেহারা অন্যরকম দাঁড়াত।

নির্ভীকতা বা অন্য-নিরপেক্ষ মতস্বাতন্ত্র্য আচার্য শ্রীকুমারের সমালোচক-মানসের প্রধান বৈশিষ্ট্য, এমন কথা বলা যায় না; তবে অসামান্য বিশ্লেষণী নৈপুণ্য আর অন্তর্দৃষ্টির প্রসাদে তাঁর সমালোচনা রসিকের নিকট বরাবর যথার্থ আস্বাদনের বস্তু। শ্রীকুমারের ব্যক্তিত্বে অধ্যাপকীয় পাণ্ডিত্যের সঙ্গে এসে মিশেছে সহজ প্রজ্ঞা ও ভাবুকতার সংস্কার। তাছাড়া তিনি গুণবিচারী সহৃদয় সমালোচক—দোষ দর্শনে তাঁর আদৌ উৎসাহ নেই। ভাষা একটু মাত্রাতিরিক্ত রকমের গভীর-গম্ভীর, তবে উপমা উৎপ্রেক্ষার রসে ভরপুর। সমালোচনার গম্ভীর-দর্শন খোলস ভেদ করে কেউ যদি ভিতরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করেন তবে অচিরেই অপূর্ব উৎকর্ষের সাক্ষাৎ পাবেন। গাম্ভীর্য এ ক্ষেত্রে বাধক নয়, পাঠকের চিত্তবৃত্তিকে সচেতন করবার সহায়ক।

অন্যপক্ষে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী হলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে গড়া এক সমালোচক—রসরসিকতাই হল তাঁর রচনার প্রধান গুণ। রবীন্দ্র ভাবধারার অনুগামী লেখকদের মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ—বহুমুখী ক্ষমতারধারক। গবেষণার

ধাত কম, মৌলিকতা-প্রধানী মননসমালোচনার দিকেই ঝোঁক বেশী। তবে দৃষ্টিভঙ্গী সর্বক্ষেত্রে প্রগতিশীল বলা যায় না। বিশেষতঃ রাজনীতির প্রশ্নে স্পষ্টতই প্রতিক্রিয়ার শিবিরভুক্ত।

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত ছিলেন একজন শক্তিশালী সমালোচক। সমালোচনাই তাঁর প্রকৃত ক্ষেত্র ছিল, যদিও তিনি নানাধরনের রচনাতেই হাত পাকিয়ে গেছেন, এমন কি শিশু-সাহিত্যও বাদ দেননি। এঁর রচনায় যথার্থ বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে এসে মিশেছিল একটি কমনীয় সংবেদনশীল মন। তবে ভাষা ছিল বিস্তারমুখী, কেনানো—মোটেই সংহত সুবলয়িত নয়।

অধ্যাপকীয় সমালোচকদের মধ্যে আর যাঁরা কোন-না-কোন গুণে বিশিষ্ট তাঁদের মধ্যে আছেন আচার্য সুনীতিকুমার, আচার্য কালিদাস রায়, ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, ছান্দসিক ও ঐতিহাসিক প্রবোধচন্দ্র সেন, ছান্দসিক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, ডঃ ক্ষুদিরাম দাস, সুনীলচন্দ্র সরকার, ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য, জগদীশ ভট্টাচার্য এবং তরুণতরদের মধ্যে কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়, ডঃ ভবতোষ দত্ত, ডঃ নীলরতন সেন প্রভৃতি।

অধ্যাপকীয় বৃত্ত তথা অ্যাকাডেমিক ধারার বাইরে বাংলায় এক বৃহৎ সমালোচক-গোষ্ঠী আছেন যাঁদের শক্তি এবং দানকে কোনমতেই উপেক্ষা করা যায় না। এঁদের রচনা বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ইতস্ততঃ ছড়ানো, অধ্যাপকদের সমালোচনা কর্মের মতো লক্ষ্যের একমুখীনতা এঁদের রচনায় নেই। হয়তো অধ্যাপক সুলভ অ্যাকাডেমিক শৃঙ্খলাবোধ, তথ্যনিষ্ঠা আর পরিশ্রমক্ষমতার দিক থেকেও এঁদের ঘাটতি স্পষ্ট; তবে এঁদের যা কিছু বিচ্যুতি তার সব কিছুরই পূরণ হয়ে গেছে এঁদের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীতে, জীবনরসরসিকতাযুক্ত মননে এবং স্বাধীন চিন্তার স্ফূর্তিতে। আচার্য প্রমথ চৌধুরীকে এই ধারার সমালোচনার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিস্থানীয় লেখক বলা যায়। প্রমথ চৌধুরীর গবেষণার স্পৃহা ছিল না ঠিক কথা, তবে গতানুগতিক চিন্তার তিনি আতশত্রু ছিলেন। পরে এই ধারাকে আর যাঁরা অনুসরণ করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশংকর রায় প্রভৃতি। এঁদের কৌতূহল বহুমুখে ছড়ানো, দৃষ্টিভঙ্গী জীবনপ্রীতিযুক্ত, ইহমুখী। ঠিক সংজ্ঞার্থে প্রাবন্ধিক সমালোচক-চক্রের অন্তর্ভুক্ত না হলেও আধুনিক কালের যে লেখকটির মধ্যে এই ধারার রচনার সার্থক অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায় তাঁর নাম নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। নন্দগোপালের বৃত্তি সাংবাদিকতা, কিন্তু অন্তরটি তাঁর খাঁটি জিজ্ঞাসুর।

নানা বিষয়ে এঁর কৌতূহল ব্যাপ্ত, অধ্যয়নও বহুবিস্তৃত। প্রয়োজনে হক-কথা কইতে জানেন, ব্যঙ্গপ্রবণতাও লক্ষণীয়, তবে স্পষ্টভাষিতা বা বিদ্রূপ কোনটাতেই তিক্ততার ঝাঁজ নেই। বেশ-তোষামোদ করে শক্ত কথা বলার কৌশল অধিগত। সমালোচনার মধ্যে লেখকের যে ব্যক্তিত্বটি ফুটে ওঠে তা একজন সহৃদয়ের, গুণগ্রাহীর, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ভ্রাম্যমাণ এক সতত রস ও আনন্দান্বেষীর। তবে একটু কৌতুকপ্রবণ, বোধ করি এই কৌতুকপ্রবণতা স্বাধীন চিন্তার স্ফূর্তিমণ্ডিত জীবনপ্রীতিনিষিক্ত বীরবলী অর্থাৎ প্রামথিক ঐতিহ্য থেকেই পাওয়া। সমালোচনায় আর একটু সীরিয়াস মনোভঙ্গী আর ভাবাবেগের অনুশীলনে বোধহয় রচনা আরও মুক্তপ্রাণ হতে পারত।

অ্যাকাডেমিক বলয়ের বহির্ভূত একাধিক লেখক আছেন যাঁদের সমালোচনা সাভিনিবেশ মনোযোগের অপেক্ষা রাখে। সকলের নামোল্লেখ বা রচনাবৈশিষ্ট্যের আলোচনা এখানে সম্ভব নয়, তবে অন্ততঃ দু-এক জনার বিষয়ে আলোচনা না করলে সমীক্ষকের কর্তব্যে ত্রুটি ঘটবে। বুদ্ধদেব বসু এঁদের অন্যতম। বুদ্ধদেব অনেকদিন জীবিকায় অধ্যাপক ছিলেন, তবে অধ্যাপকীয় শৃঙ্খলা তাঁর মোটামুটি আয়ত্ত থাকলেও অধ্যাপকীয় শৃঙ্খল তিনি নিজ লেখনীর উপর কখনও পরাননি। অত্যন্ত স্বাতন্ত্র্যবাদী লেখক বুদ্ধদেব—চিন্তার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। কিন্তু এই চিন্তার স্বাধীনতা অনেকখানি পরিমাণে কাঁচিয়ে গেছে এক শোধনাতীত আবেগের জন্য। তাঁর অহংমত্ততা প্রায় দুরারোগ্য ব্যাধির পর্যায়ে পড়ে। সাম্প্রতিক বাংলা সমালোচনায় এত বড় আত্মপ্রেমী 'নার্সিসাস'-ধর্মী লেখক আর নেই। দৃষ্টিভঙ্গী আগাগোড়া ব্যক্তিকেন্দ্রিক, ভাষা অতিশয় জোরালো, সজীব ও প্রাঞ্জল; কিন্তু চিন্তা ক্ষীণ। বক্তব্যে মৌলিকতার তেমন সন্ধান পাওয়া যায় না, যদিও মৌলিকতার একটা ঢঙ্ আছে। বুদ্ধদেব বসুর আলোচনা সমালোচনা পড়লে মনে হয় এমন ক্ষীণ ও তাত্ত্বিক পটভূমিকাবর্জিত বক্তব্যের প্রকাশে এমন সুন্দর ভাষাশিল্পের প্রয়োগে ভাষার উত্তম অনেকটাই অপচিত হয়েছে।

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও কবি বিষ্ণু দে দু'জনাই সংস্কৃতিবান্ বিদগ্ধ সমালোচক—যথেষ্ট মৌলিক বক্তব্যের প্রকাশক। তবে ভাষাশিল্পের দুর্বোধ্যতা ও বন্ধুরতার জন্য তাঁদের রচনার পাঠসুখ প্রায়শঃ ব্যাহত। সাহিত্য ব্যায়ামে পরিণত হলে উপভোগের আনন্দ আর থাকে না। গদ্যের শিল্পে অস্পষ্টতার স্থান নেই।

লোকান্তরিত কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য আধুনিক ধারার কবিদের কাব্যকৃতির মূল্যায়নে গভীর সংবেদনশীল অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। এঁর বহুমুখী মনীষাও সুবিদিত।

কিতাবী রীতির বাইরে সুবোধ ঘোষ আর একজন শক্তিমান সমালোচক, যিনি মূলতঃ কথা-সাহিত্যিক হয়েও সমালোচনাকর্মে সাহিত্যকে আলোচনার বিষয়ীভূত করেননি, পরন্তু প্রাচীন ভারতের জীবনচর্চা, বাস্তশিল্প, মণ্ডনকলা, নগরনির্মাণরীতি, পুষ্পসজ্জা ইত্যাদি ইহজীবন প্রেমের দ্যোতক বিচিত্র রূপলক্ষণার প্রতি মনোযোগ স্থাপন করে তাঁর সহজাত শিল্পানুরাগী অন্তরের পরিচয় দিয়েছেন। কথাসাহিত্য বিষয়ে তাঁর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বক্তৃতামালা এক্ষেত্রে উল্লেখের দাবি রাখে।

আমি আলোচনার সূত্রপাতে সমাজ-সমালোচনামূলক সাহিত্য ঐতিহ্যের কথা বলেছি এবং এ ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম পথপ্রদর্শক সে কথারও উল্লেখ করেছি। পরে বঙ্কিমের ধারায় সমাজ-সমালোচনার ঐতিহ্য অনুসরণ করেছেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রমুখ রক্ষণশীল কিন্তু শক্তিশালী লেখকবৃন্দ। কিন্তু সাহিত্যের সুপ্রতিষ্ঠিত পেশাদার লেখকদের মধ্যে ইদানীং সমাজ-সমালোচনার ঐতিহ্য কিছু নিষ্প্রভ হয়ে গেছে বলে মনে হয়। এখন আর এ ক্ষেত্রে লেখকের ভিড় নেই। তবে রাজনীতিতে বামপন্থায় বিশ্বাসী এবং সমাজনীতিতে প্রগতিশীলতার আদর্শে আস্থাশীল কতিপয় শক্তিশালী লেখক সমাজসচেতন রচনার ধারাটিকে অনুসরণ করে চলেছেন দেখতে পাই। তাঁরা বঙ্কিমের ঐতিহ্যবাহী সমালোচক তবে কিছুটা ভিন্নার্থে। বঙ্কিমকে এঁরা আধুনিক চিন্তন-মননের মানদণ্ডে অনেকাংশে প্রতিক্রিয়াশীল বলেই মনে করেন, অথচ এঁরা বঙ্কিমের সমাজসচেতন রচনার ধারার অনুগামী—তা কি করে সম্ভব হয়? এই প্রশ্নের সমাধান কঠিন নয়। কার্লমার্ক্স যেমন তাঁর পূর্বগামী দার্শনিক হেগেলের তত্ত্বকে invert করে নিয়েছিলেন, এঁরাও অনুরূপভাবে বঙ্কিমের সমাজভিত্তিক সাহিত্য আলোচনার রীতিকে উল্টো মুখে ঘুরিয়ে নিয়েছেন। বঙ্কিম নবজাগ্রত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনুকূলে লেখনী ধারণ করেছিলেন; সমাজবাদে দীক্ষিত এই নূতন বামপন্থী সাহিত্য সমালোচকগণ শ্রমিক ও নিপীড়িত শ্রেণীর আদর্শকে তুলে ধরবার চেষ্টা করছেন তাঁদের রচনার মাধ্যমে। এই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে পড়েন—সুশোভন সরকার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, সরোজ আচার্য, বিনয় ঘোষ, নরহরি কবিরাজ, অরবিন্দ পোদ্দার প্রভৃতি। তবে এঁরা প্রায় একক দৃষ্টান্ত হয়েই আছেন, এঁদের ধারায় আর তেমন কোন নতুন লেখকের অভ্যুদয় ঘটছে না। এখন যে সব নবীন লেখক সমালোচনার ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করছেন তাঁরা অন্যথা শক্তিমান হলেও, সমাজ সমালোচনা তাঁদের রচনাবৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত নয়। প্রাচীন ভারতীয় নন্দনবাদের সঙ্গে, উনিশ শতকীয় কলাকৈবল্যবাদ অথেক্ষ্যের সঙ্গে,

পাশ্চাত্যের খাত-বেয়ে-আসা অতি আধুনিকতার জগাখিচুড়ি পাকিয়ে এঁরা কিম্ভূত এক সাহিত্যাদর্শ গড়ে তুলেছেন, যার বিকৃত ফসল হল আজকের এক শ্রেণীর লেখকের অশ্লীল রচনাবলী। কৃত্রিম এক সাহিত্যাদর্শের প্রতি আনুগত্যের অজুহাতে এঁরা সমস্ত শোভনতা, সুরুচি ও সংযম বিসর্জন দিয়েছেন।

যাই হোক, সমাজসচেতন সমালোচকদের কথা হচ্ছিল, তাঁদের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। এইসব সমালোচকদের অগতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রশংসনীয়, রাজরোষ ও নিপীড়নের ভয়ের মুখে এঁদের কারও কারও নির্ভীকতাও যথেষ্ট তারিফ যোগ্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও বলব, জীবনের সঙ্গে এঁরা সাহিত্য-সেবাকে সম্পূর্ণ অঙ্গীভূত করে নিতে পেরেছেন কিনা তাতে সন্দেহ আছে। যে অর্থে উনিশ শতকের রুশীয় সমালোচকবর্গ—বেলিন্‌স্কি, নেক্রাসব, চের্নিশেভস্কি ও দোব্রলুভব প্রভৃতি—সাহিত্য সমালোচক ছিলেন, এঁরা সেই অর্থে সাহিত্য সমালোচনা বৃত্তিকে গ্রহণ করেছেন কিনা সেটা একটা প্রশ্ন। স্বীয় মতামতে বিশ্বাসের দৃঢ়তার জন্য চের্নিশেভস্কি ও দোব্রলুভব রাজদণ্ড, শাস্তি-নির্যাতন, এমন কি চরম পরিণতির জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন, এঁরা কি ততদূর পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত ছিলেন বা আছেন? সাহিত্যকে সমাজসচেতন করে তোলাই যথেষ্ট নয়, তাকে ব্রত বা mission-এর দৃষ্টিতে নিতে পারলে তবেই তাকে ঠিকভাবে দেখা হয়। সাহিত্য সেবা একটি জীবন ব্রত – সমগ্র জীবনের সাধনা, প্রয়োজন হলে প্রাণপাত দ্বারা তার দেনা শুধতে হয়।

আলোচনার উপসংহারে এখনকারসমালোচনার রীতি পদ্ধতি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলতে চাই। এখন পত্র-পত্রিকায় যে ধরনের সাহিত্য সমালোচনা হয়, তার অনেকাংশই সমালোচনা নামের যোগ্য নয়; সমালোচনার নামে তা গোষ্ঠিতন্ত্রের ভজনা, দলীয় স্বার্থের পরিপোষণ এবং পারস্পরিক পৃষ্ঠ-কণ্ডুয়ন মাত্র। দলীয় স্বার্থের বশংবদ ভাড়াটে কলম-চালিয়েদের হাতে পড়ে অতিসঙ্কিপূর্ণ পুস্তক-সমালোচনা আর সাহিত্য-সমালোচনা সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুড়ি-মিছরি এক দরে বিকোচ্ছে, তা যদি না হত তো নিকৃষ্টস্তরের পর্নোগ্রাফী ২হল বিশেষের সংবাদপত্রে উৎকৃষ্ট পর্যায়ের সাহিত্যসৃষ্টি বলে পরিকীর্তিত হত না। সরলমতি পাঠককে বিভ্রান্ত করবার জন্য এক শ্রেণীর প্রকাশক সম্পাদক আর লেখকের মধ্যে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র চলেছে বলে সন্দেহ হয়। বশংবদ পুস্তক সমালোচক জেনে শুনে সেই ষড়যন্ত্রের অংশীদার হচ্ছেন। এরকম জিনিস বাধাহীন ভাবে চলতে থাকলে সমালোচনা নামক বস্তুটি প্রহসনে পরিণত হবে। সাহিত্য সমালোচনা একটি

পবিত্র ব্রত। এই ব্রতের উদ্‌যাপনে প্রয়োজন হয় রসানুভূতি, বিচারশীলতা, বিবেচনা শক্তি, সত্যনিষ্ঠা, অকুতোভয়তা, নিরপেক্ষতা প্রভৃতি গুণ। বলাই বাহুল্য এ সকল গুণ নিতান্ত সাধারণ গুণ নয়। এ সকল গুণের সব কয়টির বা কতিপয়ের সমবায়ে যে ব্যক্তিত্ব তৈরি হয় সে ব্যক্তিত্ব এক দুর্ধর্ষ ব্যক্তিত্ব—সমাজ ও সাহিত্যের অভিভাবকের ভূমিকায় তার আসন। আমাদের সাহিত্য সমালোচনা যেন এমন হয় যাতে সেই আসন আগামী দিনের সমালোচকগণ যোগ্যতার সঙ্গে পূরণ করতে পারেন। মনে রাখতে হবে, সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যে পূর্বসূরী হলেন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর, প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল প্রমুখ রথী-মহারথীগণ। পাশ্চাত্য সাহিত্যেও আচার্য স্থানীয় সমালোচকের অভাব নেই। ইংরেজী সাহিত্যের ডক্টর জনসন, আর্থার কুইলার কাউচ, ম্যাথু আর্নল্ড, কোলরিজ, ব্রাডলে, মিডলটন মারে, লেসলী আব্যারক্রম্বি, টি এস. এলিয়ট, সি. এম. বাওরা, আই. এ রিচার্ডস, হার্বার্ট রীড ; ফরাসী সাহিত্যের রেনাঁ, সাঁতবোভ, লেগুই ক্যাজামিয়া ; রুশ সাহিত্যের হার্জেন, বেলিনস্কি, চের্নিশেভস্কি ; ইতালীয় সাহিত্যের বেনেদেত্তো ক্রোচে—প্রথম শ্রেণীর সমালোচকের সে এক সারিবদ্ধ মিছিল। সাহিত্য সমালোচনার এই যে সুসমৃদ্ধ ঐতিহ্য—আমরা যেন তার উপযুক্ত হতে পারি ; সমালোচকের কৃত্য সম্বন্ধে ভুল ধারণার বশে আমরা সমালোচনার মানকে যেন নীচে নামিয়ে না আনি।

বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য

বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ঐতিহ্য দীর্ঘকালের। সময়ের পরিমাপে প্রায় দেড়শো বছরেরও অধিককাল ধরে প্রবন্ধ সাহিত্যের চিন্তাচর্চা চলছে বাংলা ভাষায় একটানা। গদ্যের সঙ্গে নিবিড় যোগ প্রবন্ধের, বস্তুতঃ গদ্যই হলো প্রবন্ধ-সাহিত্যের মাধ্যম। কাজেই বাংলা গদ্যের সূচনা, বিকাশ ও বিবর্তনের ইতিহাস এক হিসাবে বলতে গেলে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যেরও সূচনা, বিকাশ ও বিবর্তনের ইতিহাস। বাংলা গদ্যের সাহিত্যিক রূপের সৃষ্টি হয়েছে এদেশে ইংরেজ অভ্যুদয়ের পরে সুতরাং বাংলা প্রবন্ধেরও সৃষ্টি ইংরেজ পরবর্তী যুগে। একটি আরেকটির হাতে ধরা হয়ে এসেছে। মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতি এই দুইয়ের সহাবস্থানকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের দীর্ঘদিনের ইতিহাসের মধ্যে এখানে প্রবেশ করবার তেমন অবকাশ নেই, এই আলোচনা তার ক্ষেত্রও নয়; তবে বাংলা প্রবন্ধের অগ্রগতির প্রধান প্রধান দিক্‌চিহ্নগুলির উপর বোধ হয় একনজর চোখ বুলনো যেতে পারে। এই অনুশীলন প্রয়োজন এইজন্যে যে, নতুনকে ভালো ক'রে বুঝতে হলেও পুরাতনের মোটামুটি একটা ধারণা থাকা আবশ্যক। আজকের বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের কোথায় শক্তি, কোথায় ত্রুটি-বিচ্যুতি, কোন্ পথে বিকাশ হলে তার সম্যক্ স্ফূর্তি সম্ভব—এ সব অনুধাবন করতে হলে পুরাতনের সঙ্গে মিলিয়েই সে কাজ করা বাঞ্ছনীয়। নয় তো তুলনার মানদণ্ডের অভাবে আলোচনা কথঞ্চিৎ লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে বাধ্য।

গোড়াতেই একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। প্রবন্ধ বলতে আমি সমালোচনা-সাহিত্যকেও তার অন্তর্গত করতে চাই। কেন না বাংলা ভাষার অনুষঙ্গে এই দুটি পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বললেও চলে। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের একটা মোটা ভাগ জুড়ে আছে সমালোচনা, আরও সংকুচিত ক'রে বললে, সাহিত্য-সমালোচনা। প্রবন্ধ ও সমালোচনা সাহিত্যের এই অঙ্গাঙ্গী সংযোগ বাংলা জ্ঞানবাদী গদ্য সাহিত্যের বিশেষ প্রকৃতিটিকে চিহ্নিত করেছে।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের একেবারে প্রাথমিক যুগের কতিপয় বিশিষ্ট লেখক হলেন—উইলিয়ম কেরী ও ফেলিক্স কেরী, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, তারিণীচরণ মিত্র, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজা রামমোহন রায়। এঁদের

মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন রামমোহন, কারণ তিনিই প্রথম বাংলা গদ্যকে সচেতন ভাবে চিন্তার বাহন রূপে ব্যবহার করেছিলেন। আজকের পরিভাষায় রামমোহনের রচনাবলীকে ঠিক প্রবন্ধ আখ্যা দেওয়া যায় না, তবে সেগুলি যে সন্দর্ভ জাতীয় রচনা ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ইংরেজীতে যাকে বলে dissertation, tract, discourse, রামমোহনের রচনা ছিল ওই বর্গের—প্রায়ই ধর্মীয় বিতর্ক ও বিপক্ষের মত খণ্ডনের প্রয়োজনে শুষ্ক যুক্তির ক্রম অনুসরণ ক'রে তাঁর প্রতিপাদ্যের বিস্তার করতেন তিনি তাঁর বাংলা রচনাগুলিতে। স্বভাবতঃই এই জাতীয় রচনায় লাবণ্য ও সুষমার স্থান ছিল সংকীর্ণ, মননের তির্যক ভঙ্গীটাই ছিল প্রধান। তবে যে দিক থেকেই বিচার করা যাক না কেন, রামমোহনই যে বাংলা গদ্যের প্রথম অগ্রচারী নায়ক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এর পরেই নাম করতে হয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই লেখক পঞ্চকের। এঁদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ মূলতঃ ধর্মীয় লেখক হয়েও আশ্চর্য প্রকৃতি-সচেতন গদ্যের স্রষ্টা, তাঁর প্রসিদ্ধ আত্মজীবনীর হিমালয় ভ্রমণ অংশগুলিই এ কথার প্রমাণ। অক্ষয়কুমার বাংলা সাহিত্যে যুক্তিপ্রধান বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ রচনার পথিকৃৎ। তাঁর চারুপাঠ তিন খণ্ড, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা ও বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার প্রভৃতি বই এ-কথার অসংশয় সাক্ষ্য বহন করছে। বিদ্যাসাগরের গদ্য রচনার প্রধান ভূষণ তার চারুতা ও কান্তি। বলা যেতে পারে গদ্য রচনাকে সুষমামণ্ডিত করবার প্রাথমিক কৃতিত্ব বহুলাংশে তাঁরই প্রাপ্য। তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি—বাংলা বাক্যবন্ধের উপযুক্ত যতি বিন্যাস। এটিকে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যাসাগরের একটি অসাধারণ বৈপ্লবিক প্রয়াসরূপে বর্ণনা করেছেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় যুক্তিবাদী প্রাঞ্জল গদ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচয়িতা। তাঁর পারিবারিক ও সামাজিক প্রবন্ধাবলী আজও তাদের আকর্ষণ হারায়নি। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মুখ্যতঃ ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের প্রসিদ্ধ লেখক। তাঁর অধিকাংশ রচনাই ইংরেজীতে গ্রথিত তবে বাংলাতেও কিছু-কিছু রচনা আছে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে তৎসম্পাদিত বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকা অদ্যাবধি একটি দিকচিহ্ন হয়ে আছে।

এর পরেই উল্লেখনীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রবন্ধ সাহিত্যের তিনি এক অঙ্কের দিক্‌পাল। সৃষ্টিসাহিত্য ও মননসাহিত্য এই দুই খাতেই তাঁর শক্তিপ্রবাহ সমান বেগে ও সমান প্রবলতার সহিত প্রবাহিত হয়েছে। তাঁর বিপুল

প্রবন্ধগুলোর এই কটি লিখনবৈশিষ্ট্যের প্রতি বিশেষভাবে অঙ্গুলিক্ষেপ করে—অসাধারণ বুদ্ধির প্রাখর্য, অব্যভিচারী যুক্তিনিষ্ঠা, বক্তব্যের বলিষ্ঠতা, রসজ্ঞান, ব্যঙ্গপ্রবণতা ও সমালোচনী স্ফূর্তি। বিবিধ প্রবন্ধ, ধর্মতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণচরিত্র প্রভৃতি গ্রন্থে পাই তাঁর বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রথমাংশের পরিচয়; আর লোকরহস্য, কমলাকান্তের দপ্তর, সাম্য, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত প্রভৃতি গ্রন্থে পাই তাঁর নিবিড় হাস্যরসবোধ ও বিদ্রূপপরায়ণতার অসংশয় সাক্ষ্য। বিদ্রূপে তিনি কিছু অধিক নির্মম।

প্রধানতঃ বঙ্গদর্শন পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'রে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখকব্যক্তিত্বের মনস্বিতার দিকটির বিকাশ হয়েছিল। এই পত্রিকাটির অবলম্বন না পেলে তাঁর প্রধান প্রধান উপন্যাসগুলি লেখা হলেও হতে পারত, তবে প্রবন্ধ ও সমালোচনায় প্রাচুর্য যে ব্যাহত হতো সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পত্রিকা-সাহিত্যের একটি প্রধান উপজীব্য সাময়িকতা যে সমালোচনাকে বিশেষ ভাবে উদ্রিক্ত করে সে তথ্য সুবিদিত। বঙ্গদর্শনের আশ্রয়ে শুধু যে বঙ্কিমের স্বকীয় সমালোচনী প্রতিভারই স্ফূর্তি হয়েছিল এমন নয়, এই পত্রিকা ও তাঁকে বেষ্টন ক'রে এক শক্তিশালী নতুন প্রাবন্ধিক ও সমালোচক গোষ্ঠীরও সৃষ্টি হয়েছিল। যথা, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, রমেশচন্দ্র দত্ত, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রভৃতি। এ ছাড়া বঙ্গদর্শনের সময়ে ও অব্যবহিত পরবর্তী দুই দশক সময়ের মধ্যে আরও যে সব বিশিষ্ট প্রবন্ধকার ও সমালোচকের উদয় হয়েছিল তাঁদের মধ্যে আছেন—কালীপ্রসন্ন ঘোষ, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বীরেশ্বর পাঁড়ে, ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য, গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, পূর্ণচন্দ্র বসু, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রমুখ। এঁদের অধিকাংশের, প্রবন্ধ অপেক্ষা সমালোচনাতেই ক্ষমতার অধিক বিস্তার হয়েছিল বলে মনে হয়।

আশির দশকে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের প্রচার রহিত ক'রে প্রচার নামক পত্রিকাকে অবলম্বন করেন। এদিকে তিনি তাঁর নবহিন্দুত্ববাদ প্রচারের মাধ্যম স্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন। এই পর্বের বঙ্কিম কিছুটা রক্ষণশীল কিছুটা স্থিতাবস্থার পোষক, যদিও তাঁর লেখার ধার আগেরই মতো এই কালেও সমান অক্ষুণ্ণ আছে দেখা যায়। শক্তিশালী লেখনী প্রতিক্রিয়ার সেবায় নিযুক্ত হলে বক্তব্যের প্রকৃতি যে বদলে যায়, বঙ্গদর্শন আর প্রচার-এর তুলনামূলক বিচার করলেই সে কথা আমরা বুঝতে পারব।

এর পরের যুগ একান্ত ভাবেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যুগ। উনিশ

শতকের শেষ পাদ আর বিশ শতকের প্রথম পাদে জাতীয়তার অভ্যুত্থানের প্রাবল্যমুখে রবীন্দ্রনাথ কত যে প্রবন্ধ লিখেছেন তার সীমাসংখ্যা নেই। তাঁর স্বদেশ, সমূহ, আত্মশক্তি, পরিচয়, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, স্বদেশী সমাজ, রাজা প্রজা, প্রাচীন সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের ধারা প্রভৃতি গ্রন্থ এই ক্ষেত্রে রসনাপ্রাচুর্যের নিদর্শন হয়ে বিরাজ করছে। এই পর্বের পূর্ব ভাগে ভারতী ও পরের ভাগে সাধনা ও নবপর্যায় বঙ্গদর্শন ছিল তাঁর এই জাতীয় রচনাসমূহের আত্মপ্রকাশের প্রধান মাধ্যম। বেশীর ভাগ রচনাই মূলতঃ জাতীয় ভাবোদ্দীপক, এবং আরও স্পষ্ট ক'রে বললে, প্রাচীন ভারতের তপোবন সভ্যতার মহিমার উদ্‌ঘোষণ। স্বদেশী ভাবধারার প্রবল জোয়ারের আলোড়ন-বিলোড়নে রবীন্দ্র-গদ্যরচনার এই পর্বটি দেশহিতৈষণার আবেগাতিশয্যে ভরপুর বললেও চলে। কিন্তু আশ্চর্য এই সকল রচনার স্বাদ। প্রবন্ধের আবরণে রচিত হলেও এগুলি নিজেই এক একটি সৃষ্টি, এক একটি অনবদ্য উন্মোচন। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে প্রবন্ধসমূহের বক্তব্য সম্পর্কে মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু তাদের প্রকাশভঙ্গীর কি কোন তুলনা আছে? পরে বিশের ও তিরিশের দশকে রবীন্দ্রনাথ আরও অনেক প্রবন্ধ ও সমালোচনা-গ্রন্থ লিখেছেন, যেমন কালান্তর, সাহিত্য, সাহিত্যের পথে, শিক্ষার বিকিরণ, মানুষের ধর্ম, প্রভৃতি—তাদের যুক্তিবিন্যাস অপূর্ব, প্রকাশ অধিকতর কৌশলী, উপরন্তু এই পর্বের রচনাগুলি আন্তর্জাতিক চেতনায় দীপ্ত। কিন্তু সব বলা হলেও যে-কথাটা থেকে যায় তা হলো: এই লেখাগুলিতে পূর্বের জাদু নেই। ছেলে-ভুলানো ছড়া, রাজসিংহ, শকুন্তলা, মেঘদূত প্রভৃতি রচনাখণ্ডের পাঠে মনের ভিতর যে অপরিমেয় ভাববিহ্বলতার সৃষ্টি হয়, পরবর্তী রচনাগুলির অনুধ্যানে আর তেমন সম্মোহন বোধ করিনে। এই আলোচকের বিনীত অভিমত, রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্যের তুল্য সাহিত্য-সমালোচনা গ্রন্থ বাংলায় অল্পই রচিত হয়েছে। এ সমালোচনা নয়, এ এক মৌলিক নির্মাণ—তার পঞ্জরে পঞ্জরে কাব্যের সুরভি।

বিশ শতকের প্রথম দুই-তিন দশক কালের মধ্যে আর যে সকল প্রবন্ধকার ও সমালোচক বাংলা সাহিত্যকে তাঁদের দানে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের ভিতর আছেন—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শশাঙ্কমোহন সেন, দীনেশচন্দ্র সেন, বিপিনচন্দ্র পাল এবং প্রমথ চৌধুরী। এতদ্ভিন্ন রবীন্দ্রনাথের লিখনরীতির অনুবর্তী এক রস-সমালোচক গোষ্ঠী এই কালেই বাংলার সমালোচনার ধারাটিকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পুষ্ট ক'রে তোলেন। এঁদের

আদিতে আছেন বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরে প্রিয়নাথ সেন, অজিতকুমার চক্রবর্তী, মোহিতচন্দ্র সেন প্রমুখ লেখক এই ধারার রচনায় বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন। বোধ হয় এ কথা বললে সাধর্ম্য নির্ণয়ে ভুল হবে না যে, একালের লেখক প্রমথনাথ বিশী এই ধারার রচনার সর্বশেষ সার্থক প্রতিনিধি। এঁদের প্রায় সকলেরই আলোচনার উপজীব্য রবীন্দ্রনাথ, এটিও লক্ষ্য করবার মতো।

কবির উপমা উৎপ্রেক্ষার ঐশ্বর্যমণ্ডিত কাব্যগুণোপেত রচনার প্রতিক্রিয়ামুখেই সম্ভবতঃ আচার্য প্রমথ চৌধুরীর সবুজ পত্রের আন্দোলনের জন্ম। যদিও বস্তুত তথ্য এই যে, প্রমথ চৌধুরী নিজেই রবীন্দ্রগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্র-রচনার সঙ্গে বীরবলী রচনার মিল সামান্য, অমিলটাই বেশী। চলতি ভাষার প্রবক্তা রূপেই যে শুধু বীরবল রবীন্দ্র-প্রভাববৃত্তের বাইরে চলে এসেছিলেন তা-ই নয়, রবীন্দ্র ভাব-জগতেরও তিনি তেমন অনুসারী ছিলেন না। কবির গদ্য রচনায় যেখানে সংবেদনশীলতার গাঢ়তা, সৌন্দর্য ও কল্পনার বিস্তার, উপমার প্রাচুর্য, কবিত্বের সৌগন্ধ্য; বীরবলী ঢঙের রচনায় সেস্থলে বুদ্ধির ঝলকানি, পরিহাসরসরসিকতা, বক্রোক্তি, বিদ্রূপের কথা। এ মেজাজ বাংলা প্রবন্ধে একেবারেই নতুন। বাংলা ভাষায় এর কোন পূর্ব-নজির নেই। ইংরেজী সাহিত্যে প্রবন্ধ রচনার যদিও এক দীর্ঘকালীন সুসমৃদ্ধ ঐতিহ্য বর্তমান ফ্রান্সিস বেকনে যার শুরু, ইংরেজী প্রবন্ধও বীরবলী রচনার উৎস নয়। বীরবলের হাস্যপরিহাসতরল লঘু চালের প্রবন্ধের গাঁইগোত্র খুঁজতে হলে ফরাসী সাহিত্যের এলাকা চুঁড়তে হবে। আর এ কথা সকলেই জানেন যে, প্রমথ চৌধুরী ফরাসী সাহিত্যের একজন নিবিষ্ট পাঠক ছিলেন। যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনকে ঘিরে, রবীন্দ্রনাথের সাধনা ও নবপর্যায় বঙ্গদর্শনকে ঘিরে দুই বিশিষ্ট লেখকগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনি বীরবলের সবুজ পত্রকে ঘিরেও তৃতীয় এক শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠীর সূচনা হয়েছিল বাংলা সাহিত্যে। এঁদের মুখ্য কয়েকজন প্রতিনিধি হলেন · অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সতীশ ঘটক, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

এর পরেই আমরা তিরিশের দশকের কোঠায় প্রবেশ করতে পারি। এই কাল থেকেই দেখা গেল বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে একটি নতুন সুর লেগেছে। এই সুর সমাজ চেতনার, রাষ্ট্রিক চেতনার। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের মধ্যেও সমাজ চেতনার যথেষ্ট আনাগোনা ছিল, কিন্তু সেই সমাজ চেতনা আর এই সমাজ চেতনার মধ্যে দুস্তর পার্থক্য। নতুন সমাজ চেতনার মূল সূত্রটা সমাজতান্ত্রিক, আরও খোলাখুলিভাবে বললে, মার্কসীয়। এই সময় থেকেই বাংলার

মার্কসীয় দর্শনের বিবিধ চর্চা হতে থাকে আর তার অবধারিত প্রভাব পড়ে বাংলা প্রবন্ধ ও সমালোচনা সাহিত্যের উপর। এই ধারার চিন্তাচর্চায় ও সমালোচনায় যে সব লেখক সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সুশোভন সরকার, গোপাল হালদার, নীহাররঞ্জন রায়, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ রায় এবং সর্বশেষে বিনয় ঘোষ। যেহেতু এটা হলো মূলতঃ সমাজভাবনার যুগ, সেই কারণে এই পথে আরও অনেক লেখকের সমাগম হয়েছে অধুনা। তাঁদের কারও কারও মধ্যে যথেষ্ট প্রতি-শ্রুতিরও স্বাক্ষর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তরুণতর এই রকম কয়েক জন লেখক হলেন—অরবিন্দ পোদ্দার, জ্যোতি ভট্টাচার্য, নেপাল মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত, সরোজমোহন মিত্র, অমুনয় চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ ও সমালোচনার ক্ষেত্রে বহু লেখক অনুশীলনরত রয়েছেন। কাব্য ও কথাসাহিত্য বিভাগের তুলনায় রচনার এই বিভাগটি তাদৃশ মনোযোগ আকর্ষণ করতে না পারলেও এই বিভাগটি যে বাংলা সাহিত্যের একটি প্রাধান্যলক্ষণাক্রান্ত পরিমাণবহুল বিভাগ, সে কথা অনায়াসেই বলা চলে। এর নানা দিক: বিশুদ্ধ প্রবন্ধ, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, হাল্কা চালের প্রবন্ধ, সমাজ-ভাবনামূলক প্রবন্ধ, সাহিত্য-সমালোচনা ও সমালোচনা-সাহিত্য, গবেষণামূলক সন্দর্ভ, সাহিত্যের ইতিহাস, টীকা-টিপ্পনী ব্যাখ্যা, ইত্যাদি। সমসাময়িক সাহিত্যের এই বিশাল ক্ষেত্রকে স্বল্পপরিসর এই আলোচনার বেড়ের মধ্যে আনা কঠিন, সে চেষ্টা করতেও চাই না; তবে প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকদের একটা সংক্ষেপ-সমীক্ষা করা মন্দ নয়। তাতে সমকালীন জ্ঞানবাদী বাংলা গদ্যের মূল স্রোতগুলির একটা হদিস পাওয়া যেতে পারে। কিছু কিছু নাম আগেই উল্লেখ করেছি, অন্যান্য নামের প্রসঙ্গ এইবারে করণীয়।

বিশুদ্ধ প্রবন্ধ রচনায় এই কালের একটি শ্রেষ্ঠ নাম আচার্য সুনীতিকুমার। কত বিচিত্র রস, স্বাদ ও বিষয়ের প্রবন্ধ যে এই মনস্বী লেখক তাঁর দীর্ঘ জীবনে লিখেছেন তার লেখাজোখা নেই। আচার্যপ্রবরের বহুপথগামী কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার জগতে প্রবেশ করার অর্থই হলো মনকে বিচিত্র বিষয়চারিতার অভিস্নাত ক'রে তাকে সমৃদ্ধতর করে তোলা। বিস্তার ব্যাপ্তিতে বৈদগ্ধ্যে নানামুখীনতায় তথ্যভূয়িষ্ঠতায় এ এক গভীর শ্রদ্ধায় উচ্চার্য স্মরণীয় নাম আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের যাঁরা চর্চা করছেন তাঁদের প্রত্যেকেরই কোন না কোন ভাবে প্রেরণা হল এই সন্তপ্রশান্ত আদর্শ জ্ঞানসাধক—তাঁর কাছে আমাদের ঋণের অন্ত নেই।

বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ রচনায় পূর্ব যুগের বঙ্কিমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদীশচন্দ্র বসু ও জগদানন্দ রায়ের পরে এই কালের গণনায় কয়েকটি নাম হলো—চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্রনাথ সেন, মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ ও গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। রবীন্দ্রনাথেরও এ ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান রয়েছে -বিশ্বপরিচয় গ্রন্থ তার প্রমাণ।

সমালোচনা-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য কতিপয় বিশিষ্ট নামের পরে এই কালের তিনজন শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিস্থানীয় সমালোচক হলেন—মোহিত-লাল মজুমদার, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। এঁদের ভিতর মোহিতলাল বঙ্কিমাদর্শের অনুগামী বলিষ্ঠ মেজাজের মূলতঃ রসবাদী সমালোচক, শ্রীকুমার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী ধারার সমালোচক, আর সুবোধচন্দ্র পাশ্চাত্য রীতির সমালোচক। এ ভিন্ন আর যাঁরা সমকালীন সমালোচনার ক্ষেত্রটিকে কোন না কোন দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন সুশীলকুমার দে, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, কাজী আবদুল ওদুদ, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, জগদীশ ভট্টাচার্য, ক্ষুদিরাম দাস, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধনকুমার ভট্টাচার্য, হরপ্রসাদ মিত্র, রথীন্দ্রনাথ রায়, শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতকুমার ঘোষ, ভবতোষ দত্ত, বিজেন্দ্রলাল নাথ প্রমুখ।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় পথিকৃৎ আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন। তারপর এই পথে আর যাঁরা পরিক্রমা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হলেন—সুকুমার সেন। অন্যান্যদের মধ্যে আছেন অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূদেব চৌধুরী। আশুতোষ ভট্টাচার্য মঙ্গলকাব্য ও লোকসাহিত্যের ইতিহাস রচনা ক'রে একটি মূল্যবান দায়িত্ব পালন করেছেন।

সমাজভাবনামূলক রচনার প্রবক্তাদের কথা আগেই বলেছি। হাল্কা চালের প্রবন্ধের কয়েকজন সার্থক রচয়িতা হলেন—পরিমল গোস্বামী, অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (ইন্দ্রজিৎ), সৈয়দ মুজতবা আলী, 'রঞ্জন' প্রমুখ।

গবেষণামূলক সাহিত্যে সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় নাম ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও যোগেশচন্দ্র বাগল। পরে আরও একাধিক লেখক এই ধারার অনুক্রম করছেন। সকলের নামোল্লেখ সম্ভব নয়।

এরপর টীকা-টিপ্পনী ব্যাখ্যান মূলক সাহিত্য। এ এক বিচিত্র জগৎ। বিপুল এই সাহিত্যের পরিমাণ, প্রভূত চাহিদা। অধ্যাপকশাসিত ও মুখ্যতঃ ছাত্রসেবিত এই জগতের করণকারণ কিছু আলাদা। এর চৌহদ্দীর ভিতর প্রবেশ করলে

বাঁধা সুরে গাবার দাবিদ। সুতরাং সে চেষ্টা করবো না, শুধু এই বলেই বিবরটির ইতি করছি যে, এই জগতে প্রবেশের প্রাথমিক সর্ত হলো প্রচলিত মতের পুনরাবৃত্তির অন্তহীন ক্ষমতা ও মৌলিকতার প্রতি বিমুখতা। বাঁধি বুলির উপর যিনি যত বেশী পরিমাণে দাগা বুলতে পারবেন, তাঁর এই ক্ষেত্রে সাফল্যের সম্ভাবনা তত বেশী।

২

উপরে বাংলা সাহিত্যের গত দেড়শো পৌনে দুশো বছরের প্রবন্ধ ও সমালোচনার যে রূপরেখা অঙ্কন করবার চেষ্টা করেছি তার থেকে আশা করি একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আমাদের প্রবন্ধ সাহিত্যের জগৎ আত্যন্তিক মাত্রায় সাহিত্য-ঘেঁষা। বিষয়নির্বাচনে সাহিত্যের প্রতি অনুপাত-অতিরিক্ত প্রাধান্য আরোপিত হওয়ার ফলে অর্থনীতি, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, ইত্যাদি বিষয়ের চর্চা দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবেই ব্যাহত হয়েছে বাংলা ভাষায়। এরকম হওয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই। ফলে বাংলা সাহিত্যে নানা বিষয়মুখী বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার কোন ধারাবাহিক ক্রম গড়ে ওঠেনি, বাংলা ভাষার পাঠকেরা কম বা বেশী মাত্রায় কেবল সাহিত্যাশ্রয়ী আর সাহিত্যনির্ভর হয়েই গড়ে উঠেছেন। পাঠাভ্যাসের এই একতরফা ঝোঁক পাঠকের তো বটেই, বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিরও যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করেছে। অর্থনীতির উপরে কোন ভালো বই নেই বাংলায়, ইতিহাস এখন পাঠ্যপুস্তকের বিবরে মুখ লুকিয়েছে। একদা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রজনীকান্ত গুপ্ত, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, নিখিলনাথ রায় প্রমুখের চেষ্টায় বাংলা ভাষায় ইতিহাস চর্চার একটা সুস্পষ্ট ঐতিহ্য তৈরী হয়েছিল, তাঁদের ধারা অনুসরণ করে পরে এসেছেন রমাপ্রসাদ চন্দ, যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ সেন, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, প্রবোধচন্দ্র সেন, নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখ ইতিহাসবিদ্‌গণ। ইতিহাসের বই এখনও লেখা হচ্ছে, তবে সেটা কতটা বৈষয়িকতার তাগিদে আর কতটা বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার প্রণোদনায়, সে বিষয়ে বোধহয় সংগতভাবেই প্রশ্ন করা চলে। মুখ্যতঃ ছাত্র সম্প্রদায়ের মুখ চেয়ে বই লিখলে গ্রন্থরচনার একটা মূল সর্তই লঙ্ঘিত হয়—মৌলিকতার আদর্শ। এমন বলব না যে, ছাত্রদের প্রয়োজন উপেক্ষা করতে হবে, কিন্তু সেটা গ্রন্থরচনার পরোক্ষ ফল হিসাবে উপস্থাপিত হলে তবেই ব্যাপারটা শোভন হয়। দেখা গেছে অনেক সদ্‌গ্রন্থই পরে ছাত্রসমাজের কাজে লেগেছে। কেবল মাত্র ছাত্র-সমাজের মুখ চেয়ে বই লিখলে এমনটা কখনই হতে পারতো না

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ক বই লেখার রেওয়াজ আগে মোটে ছিলই না, সুখের বিষয়, ইদানীং অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। এক্ষেত্রে দুটি বইয়ের নামোল্লেখ করছি, যা মনোযোগের অপেক্ষা রাখে—স্বর্গত অতীন্দ্রনাথ বসুর নৈরাজ্যবাদ এবং সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা।

সমাজবিদ্যার চর্চা বাংলায় অপেক্ষাকৃত নতুন। এই ক্ষেত্রে পথিকৃৎ বিনয় কুমার সরকার। অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু এবং বিনয় ঘোষ কিছু মূল্যবান কাজ করেছেন। তবে এই সরণীটি এখনও বিরলপথিক।

ভূতত্ত্বের উপরে সম্প্রতি একটি উল্লেখযোগ্য ভালো বই বেরিয়েছে—সুকুমার বসুর হিমালয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র পুরস্কার কমিটি এই বইটির উপর তাঁদের পুরস্কার অর্পণ ক'রে যথার্থ গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়েছেন।

নৃতত্ত্বে উল্লেখযোগ্য নূতন সংযোজন অমলেন্দু মিত্রের রাঢ়ের সংস্কৃতি। এটি কয়েক বৎসর আগে রবীন্দ্রপুরস্কারধন্য হয়েছে।

কিন্তু এগুলি তো হলে ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত, আসলে এই সকল ক্ষেত্রে অভাবাত্মক দিকটাই প্রবল। কোন কোন বিভাগে রীতিমতো শূন্যতা বিরাজ করছে ব'লেও অত্যুক্তি হয় না।

সাম্প্রতিক বাংলা প্রবন্ধের আর একটি ঋণাত্মক দিকের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। শতাব্দীর মধ্য পর্ব থেকে অক্ষয়কুমার, ভূদেব এবং পরে বঙ্কিমচন্দ্র যুক্তিবাদী প্রবন্ধ রচনার যে একটি প্রকাশভঙ্গী গড়ে তুলেছিলেন সেটি এই কালে অনেকাংশে পরিত্যক্ত হয়েছে বলে মনে হয়। এর ফল শুভ হয়নি, বলাই বাহুল্য। এখন সাহিত্যের অধ্যাপকেরা এবং তরুণতর লেখকেরা যে ধারায় প্রবন্ধ লেখেন তাতে ব্যক্তিসাপেক্ষ মনোভাবেরই প্রাধান্য, উল্লিখিত পূর্বাচার্যদের বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টি, যুক্তি-শৃঙ্খলা প্রীতি আর বক্তব্যের স্পষ্টতায় তেমন দেখা মেলে না। পরিচ্ছন্ন লিখনরীতির স্থান দখল করেছে অবচ্ছ বাগ্‌ভঙ্গী। বিষয়নির্বাচনে সাহিত্য প্রসঙ্গেরই সবিশেষ আধিপত্য, কোন কোন তরুণ অধ্যাপক তো পণ করেই নেমেছেন কবিতার প্রসঙ্গ ছাড়া তাঁরা আর কোন প্রসঙ্গের উপর লিখবেন না—তা-ও আধুনিক কবিতা, যার আরম্ভ জীবনানন্দ দাশ থেকে! সাহিত্যের বিষয়কে এইভাবে মর্জিমাফিক গণ্ডীবদ্ধ ক'রে তুললে যে পাঠকদের প্রতি অবিচার করা হয় সেই চেতনার উন্মেষ আমাদের মধ্যে হবে কবে?

আর একটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেই আলোচনা শেষ করব।

আমি সাম্প্রতিক প্রবন্ধকারদের মৌলিকতা ভীতির কথা বলছি। প্রায় প্রত্যেকেই পাহাড়প্রমাণ তথ্যস্তূপ, গন্ধমাদন বহরের উদ্ধৃতি, চোখে-সর্ষেফুল-দেখিয়ে-ছাড়া ফুটনোট আর মাথা-ঘুরিয়ে-দেওয়া বিবলিওগ্রাফীর পঙ্‌ক্তি একত্র হাজির ক'রে অধ্যবসায়ের প্রমাণ দিতে ব্যস্ত, কিন্তু মৌলিক কিংবা নূতন কোন বক্তব্য প্রতিষ্ঠার দিকে তার সিকির-সিকি প্রযত্নেরও পরিচয় পাওয়া যায় না। কে কত পরিশ্রমের নজীর স্থাপন করতে পারেন সবাই আদাজল খেয়ে তার প্রতিযোগিতায় নেমেছেন কিন্তু যাতে জ্ঞানের দিগন্ত বিস্তৃততর হয়, পাঠকের মনে নূতন চিন্তার উদ্রেক হয়, তেমন কথা বলার দায় কারও নয়। বুঝতে পারছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রির পদ্ধতি প্রকরণ সমগ্র বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের উপর তার কালো ছায়া বিস্তার করেছে আর তদ্দ্বারা বাংলা প্রবন্ধের মৌলিকতার আনন্দ হরণ করেছে। আমাদের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ যে কয়েকজন প্রবন্ধকার—বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর, প্রমথ চৌধুরী, সুশীলকুমার, সুনীতিকুমার—কই, তাঁরা তো কখনও তাঁদের বক্তব্য ফুটনোট কণ্টকিত ক'রে উপস্থাপিত করেননি? বিদ্যার প্রমাণ রচনার লিপির মধ্যেই অনুস্যূত থাকে, বাইরে প্রকট ক'রে তোলার আবশ্যক হয় না। সত্যিকার জ্ঞানীরা প্রথমোক্ত পথেই তাঁদের জ্ঞানের বিকিরণ করেন, দ্বিতীয় রীতিতে তাঁরা কদাচ আসক্ত হন। তাঁদের রচনার সংস্পর্শে এলেই তাঁদের চিত্তের সুবাস টের পাওয়া যায়, সেই সুবাসকে আরক বানিয়ে বোয়মে পোরবার প্রয়োজন হয় না। আমাদের গবেষণার বাতিকগ্রস্ত নূতন লেখকেরা যত শীঘ্র এ কথাটা বোঝেন ততই মঙ্গল।

লেখক ও সমাজ

সমাজের সঙ্গে লেখকের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। শুধু যে লেখকের সৃষ্ট সাহিত্যেই সমাজের প্রতিফলন ঘটে তা-ই নয়, সরাসরি সম্পর্কের ক্ষেত্রেও লেখক সমাজের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। সমাজের প্রতিটি বিশিষ্ট ঘটনা লেখকের মনে আলোড়নের তরঙ্গ তোলে এবং লেখকের সেই আলোড়িত চিন্তা ও কল্পনা স্বতঃই তাঁর লেখার উপরে ছাপ ফেলে। তিনি সমাজ দ্বারা প্রভাবিত হন, বিপরীতে সমাজও তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয় একথা বোঝার জন্ম কোন দ্বান্দ্বিক বৈজ্ঞানিক সূত্রের শরণ নেবার প্রয়োজন নেই—যদিও দ্বান্দ্বিক বৈজ্ঞানিক সূত্রের প্রয়োগের দ্বারা এ ভালভাবেই প্রমাণ করা যায়—,সাহিত্যের স্ব-ধর্মের মধ্যেই এ কথার পূর্ণ সমর্থন মিলবে। যাঁরা এতকাল বলে এসেছেন সাহিত্য হচ্ছে বিশুদ্ধ আনন্দের লীলা, অন্ত-নিরপেক্ষ সৌন্দর্য সৃষ্টিই তার একমাত্র কাজ, সেইসব অস্কার ওয়াইল্ডীয় শুদ্ধ শিল্পবাদীদের যুক্তিতে আজকাল কেউ বড়ো আর একটা কর্ণপাত করেন না। কর্ণপাত করেন না তার কারণ লেখকেরা তাঁদের নিজ জীবনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছেন যে, আনন্দই হোক আর সৌন্দর্যই হোক তা শূন্যে ঝুলে থাকতে পারে না, সমাজ-মাটির গভীরে ওই দুইয়ের শেকড় দৃঢ়রূপে প্রোথিত না থাকলে তাদের বিকাশ তো পরের কথা, অঙ্কুরোদ্গমই সম্ভব হয় না। সমাজ ও মানুষের সঙ্গে একান্তভাবে সম্পৃক্ত না হলে তথাকথিত আনন্দ বা সৌন্দর্যবাদের কোন অর্থই থাকে না।

সুখের বিষয়, আমাদের আধুনিক বাংলা সাহিত্য অর্থাৎ এদেশে ইংরেজ-অভ্যাগমের পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে প্রায় বলতে গেলে গোড়া থেকেই সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ কোন-না কোন ভাবে স্বীকৃত হয়ে এসেছে। এ কথার প্রমাণ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বস্তুভিত্তিক কবিতা, রঙ্গলাল-মধুসূদন-হেম-নবীনের জাতীয়তা উদ্বোধক কাব্য, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও প্রবন্ধাবলী, এবং দীনবন্ধু মিত্রের সমাজ-সচেতন নাটক। গুপ্তকবিকে বাদ দিলে অন্তরা ইংরেজী সাহিত্যের ভাবধারায় মোটামুটি নিস্নাত ছিলেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও, লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, উনিশ-শতকে প্রচলিত ইউরোপীয় শুদ্ধ শিল্পবাদী বা কলাকৈবল্যবাদী ধারণা তাঁদের মনের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেনি। সত্যি কথা বলতে কি, ইউরোপীয় সাহিত্যের শুদ্ধশিল্পবাদকে একপ্রকার পাশ কাটিয়েই আমাদের সাহিত্য প্রথমাবধি সমাজচিন্তার অনুশীলনে

নিরত থেকেছে। বঙ্কিমচন্দ্র তো কেবলমাত্র তাঁর লেখায় সমাজের প্রতিফলন ঘটিয়েই ক্ষান্ত হননি, সমাজ-চেতনাকে তিনি একটি সজ্ঞান ভাবাদর্শরূপে বাঙালী লেখক মানসে মুদ্রিত করে দিতে চেয়েছিলেন। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজচেতনা আর আজকের দিনের সমাজচেতনায় বলাই বাহুল্য কিছু পার্থক্য আছে এবং সে পার্থক্য মৌলিক; কিন্তু এ কথা তো অস্বীকার করা যায় না যে তিনিই বাংলা সাহিত্যে সমাজ-চৈতন্যের আদর্শের প্রথম এবং এখনও পর্যন্ত প্রধান প্রচারক। বঙ্কিমচন্দ্রের সকল মতামত আজকের দিনে গ্রাহ্য হওয়া সম্ভব নয় কিন্তু তিনি যে বাংলার উত্তর-পুরুষদের কাছে সমাজচেতনার আদর্শ উত্তরাধিকার স্বরূপ ধরে দিয়ে গেছেন তার জন্য সকলেরই আমাদের তাঁর কাছে গভীর ভাবে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

কিন্তু সমাজচেতনার এই স্রোত বাংলা সাহিত্যে অবিচ্ছেদে বইতে পারেনি। উনিশ শতকীয় সাহিত্যের অগ্রগতির মুখে এমন একটা বাঁক এলো যখন স্রোতের মুখ গেল ঘুরে। বিহারীলাল, অক্ষয় বড়াল, রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ সেন-প্রমুখ কবিগণ সাহিত্যে রোমান্টিক আত্মলীনতার সংস্কারের জন্মদান করে শুধু যে বাংলা সাহিত্যের এতাবৎ অনুসৃত সমাজ মানসিকতাকেই আঘাত করলেন তা-ই নয়, প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের বস্তুভিত্তিটাকেই দিলেন উড়িয়ে। এর ফল উত্তরকালীন বাংলা সাহিত্যের পক্ষে সবটাই শুভ হয়েছে এমন কথা বলা চলে না। এই সব খ্যাতকীর্তি কবিদের রেখাচিহ্ন অনুসরণ করে আমরা আমাদের সৌন্দর্য চেতনাকে যতটা উদগ্র করতে পেরেছি ঠিক ততটাই বোধ হয় হারিয়েছি সমাজ চেতনার খাতে। লাভ ক্ষতির হিসাব করতে গেলে পাল্লা কোন্ দিকে বেশী ঝুঁকবে সে একটা চমৎকার বিচারযোগ্য বিষয় কিন্তু এই আলোচনা তার প্রকৃত ক্ষেত্র নয় বলে এইখানেই সেই প্রসঙ্গের ইতি ঘটানো উচিত। শুধু প্রসঙ্গটির উপর যবনিকা টানবার আগে এইটুকু বলে নেওয়া দরকার যে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যসাধনার শেষপ্রান্তে এসে তাঁর কাব্যে আপেক্ষিক বস্তুভিত্তিকতার অভাবের অভিযোগ প্রকারান্তরে মেনে নিয়েছিলেন এবং বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের ধ্যান পরিহার করে সমাজতন্ত্রের আবাহনে ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য তার পর আর বেশীদিন তিনি জীবিত ছিলেন না।

আমাদের বর্তমান নিবন্ধ সাহিত্য-বিষয়ক যত-না তার চেয়ে অনেক বেশী সমাজ-বিষয়ক। সাহিত্য অপেক্ষা সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিকোণটিই এই আলোচনায় সমধিক প্রাধান্য পাবে। লেখকেরা সমাজের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসে কীরূপ

প্রভাবিত হন এবং সেই প্রভাব তাঁদের লেখায় প্রতিক্রিয়া বা প্রগতির পক্ষে কী ভাবে নিয়োজিত হয় সেটি দেখানই এই আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। এবং এই আলোচনার ধারা থেকেই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যাবে—যদি সেই প্রমাণের এখনও প্রয়োজন থেকে থাকে—যে, সাহিত্য আষ্টেপৃষ্ঠে সমাজস্পর্শ দ্বারা অনুলিপ্ত। যে সকল লেখক সমাজের গা বাঁচিয়ে, তাকে এড়িয়ে, সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টা করেন এবং ওই চেষ্টায় নিয়োজিত থাকা কালে এই আত্মপ্রসাদে মগ্ন থাকেন যে, তাঁরা যা রচনা করছেন তা বিশুদ্ধ আনন্দের লীলাজাত সৌন্দর্যকমল, তাঁদের সেই সৃষ্টির জন্য সমাজের মুখাপেক্ষী হওয়ার আদৌ প্রয়োজন করে না, তাঁরা আত্মপ্রবঞ্চনা করেন মাত্র। হয় তাঁরা সাহিত্যের স্বরূপের পরিচয় রাখেন না, নয় তাঁরা যে সমাজে বাস করছেন সে সমাজের প্রকৃত চেহারা কী তা জানেন না। জীবিকার সূত্রে, পৈতৃক ধনসম্পত্তি ভোগের সূত্রে, আত্মীয়তা-বন্ধনের সূত্রে, দলের প্রতি আনুগত্যের সূত্রে, মত-আদর্শের প্রতি অনুরক্তির সূত্রে, আরও অন্যান্য নানা সূত্রে, লেখক তাঁর জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত আক্ষরিক অর্থে সমাজের হাতে-ধরা হয়ে বাস করেন। এই মৌলিক সত্যটিকে অস্বীকার করার অর্থ সমাজকে না বোঝা, নিজেকেও না বোঝা। আত্মপরিচয়ের অভাব থেকেই বেশীর ভাগ কল্পিত বা অবাস্তব মতবাদের উদ্ভব হয়, এটি পরীক্ষিত অভিজ্ঞতা।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যে কালকে 'ভারতী'র যুগ বলা হয় সেই কালের লেখকদের মধ্যে নন্দনবাদী মনোভাবের প্রাবল্য ছিল। তাঁরা তাঁদের গল্পোপন্যাসে যে সকল চরিত্রের সৃষ্টি করতেন তাদের জীবিকার ভাবনা ছিল না, জীবন একটা একটানা উপভোগের বস্তু এই মনোভাব থেকে নায়ক-নায়িকারা উপার্জনচিন্তাহীন নিরবচ্ছিন্ন প্রেমচর্চায় সময় কাটিয়ে আজ মধুপুর কাল দেওঘর পরশু হাজারীবাগ প্রভৃতি সাঁওতাল পরগনার অধুনা-পরিত্যক্ত স্বাস্থ্যনিবাসগুলিতে ঘুরে বেড়াত। এই যে কর্মচিন্তাবর্জিত ভোগের ধারণা, এ তৎকালীন লেখকেরই মনের ছবি মাত্র। খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, শুধু নায়কেরই যে উপার্জনচিন্তা ছিল না তা নয়, তার স্রষ্টা লেখকটিরও উপার্জনচিন্তার বালাই ছিল না। পিতৃপিতামহের সূত্রে আগত কোম্পানীর কাগজ বা অকুস্থলে-অনুপস্থিত জমিদারীর সূত্রে আহৃত রসদ সংশ্লিষ্ট লেখকের খোরপোষের ভাবনা মেটাত। আজকের দিনেও যে সব লেখক মনে করেন যে তাঁরা স্রেফ সৃষ্টির আনন্দে বুঁদ হয়েই সাহিত্য রচনা করেন, টাকার জন্য

লেখাটা সাহিত্যিকের পক্ষে গ্লানিজনক, তাঁরা বরং লিখবেন না, তবু অর্থকরী সাহিত্যের পোষকতা করে সাহিত্যের অবমাননা ঘটাতে রাজী নন, তাঁরাও ওই 'ভারতী'র লেখকেরই স্বগোত্র জীব। তাঁদেরও হয় পরিস্ফীত ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স আছে, নয় তো জীবনের দাবী কৃত্রিম উপায়ে তাঁরা এতটা খাট করে এনেছেন যে তাকে প্রায় 'বায়ুভুক' অস্তিত্ব বলা চলে। এই দুই অবস্থার কোনটিই আদর্শ জীবনযাপনের প্রণালী নয়। সমাজে বাঁচতে হলে সমাজের নানাবিধ স্বাভাবিক ও সুস্থ দাবি স্বীকার করেই বাঁচতে হবে এবং তা করতে গেলেই সমাজের মানুষ ও ঘটনার সঙ্গে নিবিড় ভাবে সম্পৃক্ত না হয়ে সেটা করা যাবে না।

সমাজ একটি নানা শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট জটিল প্রতিষ্ঠান। এড়াতে চাইলেই তাকে এড়ানো যায় না। আমরা যখন ভাবছি সমাজের থেকে বিযুক্ত হয়ে শুধু মাত্র নিজের কল্পনা ও মননের জোরে সাহিত্য সৃষ্টি করছি, হয়তো দেখা যাবে তখনও আমরা কোন-না কোন ভাবে সমাজের সঙ্গে সংযুক্ত থেকেই এই কাজ করছি। আমাদের অজ্ঞাতসারে অথবা অস্পষ্ট চেতনায় এটা ঘটছে বলে সেই সম্পর্কের সত্যতা অস্বীকৃত হয়ে যায় না। আমি লেখকের সঙ্গে সমাজের নানা সূত্রে সংযোগের কথা বলছি। জীবিকার সূত্র, দল বা গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্যের সূত্র, সম আদর্শের অনুসরণের সূত্র, ইত্যাদি। এই সংযোগ-সূত্রগুলি জ্ঞাতসারে হোক অজ্ঞাতসারে হোক লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী প্রভাবিত করে থাকে। যিনি যে প্রভাব বলয়ের মধ্যে বাস করেন তাঁর পক্ষে সেই প্রভাব বলয় পুরাপুরি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় না—তা তিনি যতো বড় মাপেরই লেখক হোন্ না কেন। বরং বড় মাপের লেখক হলে আরও ভয় বেশী, কারণ সে ক্ষেত্রে বক্তৃতার সঙ্গে এসে মেশে শক্তি এবং সেই শক্তি প্রয়োগে স্বীয় বিচরণ ক্ষেত্রের অন্তর্গত অতি প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শকেও মনোহর বর্ণে চিত্রিত করে পরিবেশন করতে তাঁর আটকায় না। প্রতিভাবানের পক্ষে যে কোনো সমাজ ব্যবস্থা বা শ্রেণী ব্যবস্থার অনুকূলে যুক্তি যোগান চলে যদি সেই বিশেষ ব্যবস্থার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্বার্থের যোগ থাকে। বেশীরভাগ যুক্তিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই জাতীয় মনস্তত্ত্বই সচরাচর কাজ করে থাকে। 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের স্রষ্টা হয়েও বঙ্কিমচন্দ্র এদেশে ইংরেজ শাসনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সময় হিন্দু মধ্যবিত্তের বিস্তারের কাল। ইংরেজ শাসন থেকে ওই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নানা ভাবে উপকৃত হচ্ছিল। মুসলমানদের প্রতি তৎকালীন ইংরেজ শাসকের প্রতিকূলতা এবং

মুসলমানদেরও সাম্রাজ্য হারাবার ক্ষোভে ইংরেজদের প্রতি বৈরিতা বশতঃ ইংরেজের অনুগ্রহ তখন কেবল মাত্র হিন্দু শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছিল। এই রাষ্ট্রনৈতিক স্থিতিতে বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের একজন স্বীকৃত প্রতিনিধিরূপে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ শাসনকে স্বাগত জানাবেন তাতে আর বিচিত্র কী। যদিও আজকের দিনে তাঁর শ্রেণীস্বার্থ প্রসূত ইংরেজ শাসনের মহিমা প্রচার আমরা প্রসন্নমনে গ্রহণ করতে পারি না, আমাদের মনে কেবলই খটকা দেখা দেয় তিনি এ কাজটি না করলেও পারতেন। বঙ্কিমের ইংরেজ মাহাত্ম্য প্রচারের পক্ষে আরও একটি কারণ যোগ করা যেত -তাঁর নিজের উচ্চপদাধিকারী রাজকর্মচারিত্ব—কিন্তু ওটা নাকি কারও কার্যে স্থূল motive আরোপের সামিল, তাই ওই কার্য-কারণ নিরূপণের প্রক্রিয়া থেকে বিরত রইলুম। কিন্তু তার পরেও যে কথাটা থেকে যাচ্ছে তা হল এই যে, লেখক মাত্রই নিজ নিজ সমাজ ব্যবস্থার দ্বারা গুরুতর-রূপে প্রভাবিত হয়ে থাকেন। যে দেশে ও কালে তিনি তাঁর লেখনী চালনা করেন সেই দেশ ও সেই বিশেষ কালের রাষ্ট্রিক সামাজিক স্থিতি একটি বিশেষ পরিমণ্ডলের মত তাঁকে ঘিরে থাকে, যার দৃশ্য এবং অদৃশ্য প্রভাবের জাল ছিন্ন করে তাঁর বেরিয়ে আসার উপায় নেই। বঙ্কিম যে সময়ে ইংরেজ মাহাত্ম্যের নান্দী গেয়েছেন ঠিক তার কিছুকাল পরেই দেখি ভারতীয় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর দল জাতীয়তাবাদী অভীপ্সায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কংগ্রেসের পতাকাতলে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং হিন্দু মুসলমান উভয়কেই ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানাচ্ছেন। তার কারণ আর কিছু নয়, ততদিনে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি ইংরাজের বিমাতৃসুলভ নীতির অবসান হয়ে গেছে এবং তার বদলে দেখা দিয়েছে বিভেদাত্মক নীতি অনুসরণের আবরণে হিন্দু-স্বার্থের সুস্পষ্ট প্রতিকূলতা-চরণ। এই পরিবর্তন ভারতীয় হিন্দুর মানসিকতায় অনিবার্যভাবেই দূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল।

যাই হোক, এ সকল পুরাতন কথার গহনে অধিকদূর প্রবেশের দরকার নাই। শুধু এখানে এই কথা বলাই যথেষ্ট যে, সামাজিক বা রাষ্ট্রিক স্থিতিকে বাদ দিয়ে লেখকের চলবার জো নেই। আমরা রবীন্দ্রকাব্যের আপেক্ষিক নির্বস্তুকতা তথা বিমূর্ততার কথা বলেছি। আমাদের কথা নয়, বাংলাদেশের একাধিক প্রথিতযশা সমালোচক রবীন্দ্রকাব্যের এই দিকটির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে গেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও তো মনে রাখতে হবে যে, আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের ধন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্বাধীনচিত্ততার এক অসাধারণ

মুহ্যমান হয়েও পরাধীন ভারতের মৃত্তিকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে গেছেন, এবং পরাধীনতার মর্মান্তিক বেদনা এক স্থায়ী ধূম্রের মত তাঁর সকল রচনার আপাত আনন্দোজ্জ্বল সৃষ্টিরহস্যকে ঘিরে থেকে এক নিবিড় বিষাদের সুর চারদিকে রচিত করে তুলেছিল। তা যদি না হত তো কাব্যে আত্মমগ্ন মনোভাবের সর্বোচ্চ প্রতীক হয়েও শত শত প্রবন্ধে, গানে, কবিতায়, বিশেষ করে জাতীয় ভাবোদ্দীপক অগণিত স্বদেশী সংগীতে, তিনি ভারতবাসীর পরাধীন অবস্থার বেদনাকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতেন না। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বেও তিনি ইংরেজ শাসনকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অভিসম্পাত জানিয়ে গেছেন। ইংরেজ শাসনের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপের উপর এক নূতন প্রভাতের অভ্যুদয় তিনি চাক্ষুষ করে যেতে পারেননি কিন্তু এই প্রত্যাশার চাঞ্চল্যে তাঁর শেষের দিকের সকল রচনা থমথমে হয়ে ছিল।

এর থেকে একটি কথাই শুধু প্রমাণ হয়, তা এই যে, সাহিত্যিক যিনি যে ভাবেরই উদ্গাতা হোন্ না কেন, তিনি ভাববাদেরই প্রচারক হোন আর বাস্তববাদেরই প্রচারক হোন, সমাজের বস্তুগত অবস্থা তাঁর এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। তিনি কেমন করে তা এড়িয়ে যাবেন, যখন দেখতে পাওয়া যায় যে তাঁর চিন্তা-ভাবনা-কল্পনার পঞ্জরে পঞ্জরে সেই সমাজের ঘটনাপ্রবাহের কলকোলাহলের নিত্য অনুরণন? সমাজের কাছ থেকে তিনি শুধু যে তাঁর সৃষ্টির প্রেরণা সংগ্রহ করেন তা-ই নয়, তাঁর গোদ অস্তিত্বই সমাজের বস্তুগত অবস্থার সঙ্গে জড়িত এবং কোন-না-কোন ভাবে ওই অবস্থা থেকেই তিনি তাঁর বাঁচার উপকরণ সংগ্রহ করে থাকেন। প্রেরণার অঙ্কুশ-তাড়না কেবল বৃহত্তম সমাজের কাছ থেকেই আসে না, আসে সেই সমাজের খণ্ড খণ্ড অংশের সহিত নৈকট্যের প্রভাববশেও। আবার, প্রেরণা যেমন আসে তেমনি প্রেরণার প্রতিবন্ধকতাও আসে। কখনও প্রেরণার বিস্ফার আবার কখনও প্রেরণার অভাবজনিত স্ফূর্তিহীনতা ও অবসাদ এই দুই বিপরীত মনোভাবের টানাপোড়েনে আলোড়িত-মথিত হতে হতে লেখক ঢেউয়ের দোলায় দোদুল্যমান নৌকার মত ভাসতে ভাসতে তাঁর চলার পথে এগিয়ে চলেন। লেখক যে জীবিকায় নিরত থাকেন, যে জাতীয় বন্ধুসংস্পর্শে তিনি আসেন, যে সমাজ পরিবেশে তাঁকে বিচরণ করতে হয়, যে ধরনের আদর্শের টান তিনি তাঁর অন্তরে অনুভব করেন, অবধারিতভাবে সে সকলেরই ছাপ তাঁর লেখায় পড়ে। এক দিকে তাঁর স্বকীয় রুচি ও প্রবণতা, অন্য দিকে যে সামাজিক গণ্ডীর ভিতর তিনি চলাফেরা করেন তার প্রভাব এই দুয়েরই ভাব-সংঘাতে গড়ে ওঠে

তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী। কোন লেখক মার্ক্সবাদের বিরোধিতা করেন বা পোষকতা করেন, গান্ধীবাদের প্রতি আনুগত্য নিবেদন করেন কি তার প্রতিকূলতা করেন, ভিয়েতনামের প্রশ্নে মার্কিনীদের মতের প্রতিধ্বনি করেন কি মানবতার দাবীতে ভিয়েতনামী সংগ্রামী জনগণের পাশে এসে দাঁড়ান, তথাকথিত ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের 'পবিত্র অধিকার' রক্ষার ঘোষণায় উচ্চকণ্ঠ হন কি জনসাধারণের রুটির লড়াইয়ের সামিল হন— একগুচ্ছ বিকল্পদ্বয়ের কোন একটি অবলম্বনের মূলে সবসময় যে ব্যক্তিগত প্রত্যয়ের সুদৃঢ় প্রণোদনা থাকে তা নয়, যাঁদের সঙ্গে লেখক চলেন-ফেরেন, জীবিকার যোগে যুক্ত থাকেন, অন্যান্য ভাবেও বাধ্যবাধকতার টান অনুভব করেন, তাঁদের দ্বারাও দৃষ্টিভঙ্গী অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হতে দেখা যায়। এই ক্ষেত্রে স্বকীয় প্রত্যয়ের ভূমিকা কতটা সামাজিক পরিবেশের ভূমিকা কতটা অথবা কোন্ ভূমিকা এখানে অগ্রবর্তী কোন্ ভূমিকা পশ্চাৎবর্তী সে নিরূপণ করা এক দুরূহ কাজ, কেন না সমস্ত ব্যাপারটাই ঘটে তালগোল পাকানো এক মিশ্র সংঘটনের আকারে এবং সে জটিলতার জট ছাড়ানো মোটেই সহজসাধ্য নয়। বোধ হয় একমাত্র বিচক্ষণ মনস্তাত্ত্বিকের দ্বারাই এই কঠিন রহস্যভেদ সম্ভব।

ইউরোপীয় সাহিত্যের নজীর থেকেও লেখকদের উপর তৎকালীন সামাজিক স্থিতির প্রভাবের প্রমাণ পাই। ফরাসী বিদ্রোহের আগে ফরাসী দেশে অভিজাত ও যাজকদের অত্যাচার চরমে উঠেছিল, "third estate" অর্থাৎ জনসাধারণের অধিকার বলতে বিশেষ কিছুই ছিল না। রাজতন্ত্র জনগণের দাবীর প্রতিকূলাচরণে অভিজাততন্ত্র ও যাজকতন্ত্রের প্রতি সুস্পষ্ট পক্ষপাতিত্ব করে চলেছিল। এই অবস্থার প্রতিক্রিয়াতেই রুশো ও ভলটেয়ার এবং ভল-টেয়ারের সহযোগী দিদেরো, হলবাক, দ্য আমবার্ট প্রমুখ যুক্তিবাদী, জগতের mechanistic বা যান্ত্রিক ধারণায় প্রত্যয়শীল 'এনসাইক্লোপিডিস্ট' লেখকদের জন্ম। এঁদের "যান্ত্রিক" মতবাদ আজকে আর বেঁচে নেই কিন্তু এঁদের আপসহীন সম্মিলিত লেখনী চালনার ফলেই যে ফরাসী বিদ্রোহ সম্ভব হয়েছিল তা ইতিহাসবিদিত। ইংলণ্ডের ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ প্রমুখ কবিগণ গোড়ায় ফরাসী বিদ্রোহের 'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা'-র আদর্শের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন কিন্তু জ্যাকোবিনদের অনুষ্ঠিত 'Reign of terror' এর হিংসার মাত্রাতিশয্যে ভীত-সন্ত্রস্ত-প্রতিহত হয়ে শেষ পর্যন্ত নির্বিরোধ রোমান্টিকতার শান্তির কোলে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। 'লেক ডিস্ট্রিক্টের' সুস্থির সমাহিত আবহাওয়ায় নিরবচ্ছিন্ন প্রকৃতিচর্চা বিরূপ অভিজ্ঞতার আঘাতে ছিন্নভিন্ন

স্নায়ুতন্ত্রীকে বিশ্রামের বিশল্যকরণীর দ্বারা আরোগ্য করে তোলার মানসেই শুধু নয়, বাস্তব থেকে পালিয়ে বাঁচবার প্রাণান্তকর তাগিদেও বটে। এ মজ্জাগত রোমান্টিকেরই উপযুক্ত আচরণ।

আরও এক শতাব্দী পরে এই ফরাসী দেশেই জোলা, আনাতোল ফ্রাঁস, রোলাঁ প্রমুখ লেখকের অভ্যুদয় ঘটেছিল। এঁরাও সমাজমননের দ্বারা সবিশেষ প্রভাবান্বিত লেখক। প্রকৃতিবাদী লেখক জোলা ও মূলতঃ সৌন্দর্যবাদী লেখক ফ্রাঁস-এর "Dreyfus Affair" এর চরম অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে রুখে দাঁড়ানো এখনও বিশ্ব-শিল্প-সংস্কৃতির জগতের মূল্যবান স্মৃতির সম্পদ হয়ে রয়েছে। আনাতোল ফ্রাঁস অবশ্য পরে, প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ সংঘটিত হবার কালে, উগ্র জাতীয়তাবাদের আবর্তের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন কিন্তু সেই সময়ে রোলাঁর বীরত্ব অবিস্মরণীয়। তিনি ফরাসী-জর্মান নৃশংস ভ্রাতৃযুদ্ধের শরিক হতে দৃঢ়রূপে অস্বীকার করে লেখকের ব্যক্তি-বিবেকের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। পরেও তিনি একাধিক উপলক্ষ্যে মানবতার বিজয় পতাকা উচ্চে তুলে ধরেছিলেন। আর-একজন প্রণম্য লেখক হলেন টলস্টয়। তাঁর ভগবৎপ্রেম ও অহিংসা-তত্ত্ব বিদিত, কিন্তু তাতেই তাঁর পরিচয় নিঃশেষিত নয়। ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা বিপন্ন ও রাজরোষ অগ্রাহ্য করে তিনি শুদ্ধমাত্র ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য স্বৈরতন্ত্রী জারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে 'দুখোবর'দের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ও তাদের দেশত্যাগে সাহায্য করেছিলেন। যুগ যুগ ধরে নিপীড়িত সর্বহারা রুশ কৃষক সমাজের প্রতি তাঁর মমত্বের তুলনা ছিল না। রাজনীতিতেও মত ছিল খুবই বৈপ্লবিক। যদিও দুইয়ের পথের ভিন্নতা সুস্পষ্ট তবু টলস্টয়ের নৈরাজ্য-তত্ত্বের সঙ্গে মার্ক্সীয় "রাষ্ট্রশূন্যতা" বা "Statelessness" তত্ত্বের আশ্চর্য মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

আমাদের কালে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আমরা একাধিক লেখককে বীরত্বপূর্ণ ভাবে সংগ্রাম করতে দেখেছি। তাঁদের কারও কারও জীবন ফ্যাসিষ্ট ঘাতকদের হস্তে বিনষ্ট হয়েছে, অনেকেরই জীবন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে অবসিত হয়ে গেছে। এঁদের সকলেরই নাম আজ আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালে, তিরিশের দশকে যে সকল লেখক স্পেনের গৃহযুদ্ধে গণতন্ত্রীদের পক্ষে লড়াই করে যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মদান করেছিলেন তাঁদের মহিমময় স্মৃতি পরবর্তী লেখকদের মনের মণিকোঠায় অক্ষয় হয়ে আছে। ফ্যাসীবিরোধী ও কম্যুনিষ্ট সমর্থক লেখকদের মধ্যে পরে অবশ্য কেউ কেউ ফ্রন্ট বদল করেছেন—দৃষ্টান্তস্বরূপ স্টীফেন স্পেণ্ডার, কোয়েস্টলার, হাওয়ার্ড

কাস্ট প্রমুখ লেখকদের নাম করা যায়—কিন্তু তাতে এঁদের ক্ষীণপ্রাণতাই বোঝায়, যে আদর্শের বর্তিকা তাঁরা একদা জ্বালিয়েছিলেন তার দ্যুতির মলিনতা বোঝায় না। মাঝপথে রণে ভঙ্গ দেওয়ার নজির এই প্রথম ঘটল না যে এই দৃষ্টান্তে মুষড়ে পড়তে হবে।

দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধে নাৎসী বাহিনী কর্তৃক ফরাসী ভূমি পর্যুদস্ত হওয়ার কালে প্রগতিশীল ফরাসী লেখকদের প্রাণতুচ্ছকারী প্রতিরোধ সংগ্রাম এবং পরে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আলজিরীয় বুদ্ধিজীবীদের আপসহীন লড়াই লেখকের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক দায়িত্ব পালনের ঐতিহ্যকে উজ্জ্বল করে রেখেছে। ফরাসী প্রতিরোধ সংগ্রামের অন্যতম নায়ক জাঁ-পল-সার্ত্রের সংগ্রামের আজিও বিরাম হয়নি। অসমসাহসিক লেখক ব্রিটিশ দার্শনিক বার্টর্যাণ্ড রাসেলের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতা ও ক্রূর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে তিনি একাই একশোর সাহস নিয়ে সুদৃঢ় প্রতিরোধ চালিয়ে গেছেন। ব্যক্তিগত প্রভাবে বার্টর্যাণ্ড রাসেল কম্যুনিস্টতন্ত্রের বিরোধী শিবিরভুক্ত ছিলেন; কিন্তু কী তাঁর সাহস, কী তাঁর সংকল্পের অজেয়তা! মার্কিন বর্বরতার বিরুদ্ধে কী তাঁর ঘৃণা! মানবতাবাদের ধূমলেশহীন শিখাটিকে অনির্বাণ জ্বালিয়ে রাখতে আধুনিক যুগের যদি কোন লেখক সবচেয়ে বেশী সাহায্য করে থাকেন তো তিনি বার্টর্যাণ্ড রাসেল। এই দৃঢ়চেতা সংগ্রামী মনীষীর উদাহরণ আমাদের উদ্দীপিত করুক।

এই সব সমাজ ও রাষ্ট্র সচেতন সাহসী ইউরোপীয় লেখকদের দৃষ্টান্ত এত সবিস্তারে বলবার আবশ্যক হত না, যদি আমাদের দেশে আমরা এঁদের মহান্ আদর্শবাদ থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করতুম। পরিতাপের বিষয়, আজও আমাদের লেখকদের একাংশ তথাকথিত শুদ্ধশিল্পবাদের ধারণায় বুঁদ হয়ে থেকে সমাজের জনগণের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব অবহেলা করে চলেছেন। যে সব লেখক ব্যক্তিস্বার্থে প্ররোচিত হয়ে অথবা অজ্ঞতা বশতঃ প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলির অনুকূলে স্বীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে চলেছেন তাঁদের চোখ ফোটাবার জন্যে হলেও বার বার এই সব দৃষ্টান্ত তাঁদের সামনে তুলে ধরা আবশ্যক। তাঁরা তা হলে বুঝতে পারবেন সাহিত্যসেবা একটি পবিত্র অধিকার, এই অধিকার প্রয়োগে সর্বদাই অতন্দ্র প্রহরার দরকার; কৃতকার্যের তাৎপর্য না বুঝে, সমাজমনের উপর তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার হিসাব না

করে, আর যা-ই করা যাক, সাহিত্য সেবা অন্ততঃ করা চলে না। সাহিত্য-ব্রত পালনে হেলাফেলার মনোভাবের কোন স্থান নেই।

প্রতিক্রিয়ার শিবিরভুক্ত যে সকল লেখকের কথা বললুম এঁদের একটা অংশ জীবিকার সূত্রে তথাকথিত জাতীয়তাবাদী বৃহৎ সংবাদপত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত, একটা অংশ মুনাফাপরায়ণ স্থূলমনা ব্যবসায়ী প্রকাশকের আজ্ঞাবহ, একটা অংশ আত্মীয়তার সুবাদে বিগতকালীন ক্ষয়িষ্ণু অভিজাততন্ত্রের সঙ্গে মমত্বের যোগে যুক্ত। বৃহৎ সংবাদপত্রগুলির সঙ্গে যে সকল লেখকের যোগ, অর্থোপার্জনের তাগিদে তাঁরা এতটাই বিবেকধর্ম শূন্য হয়ে পড়েছেন যে ভিয়েতনামের প্রশ্নে মার্কিনী দস্যুতাকে সমর্থন করতে তাঁদের বাধেনি, ভিয়েতকঙ্ গেরিলাদের গভীর বিস্ময় ও শ্রদ্ধা উদ্রেককারী ঐতিহাসিক প্রতিরোধ-সংগ্রামের খবর চেপে ও মার্কিন পক্ষের একতরফা বক্তব্য ও বিবৃতি ছেপে তাঁরা মালিক-মনোরঞ্জনে ব্যস্ত ছিলেন। কিছু কিছু লেখক আছেন যাঁরা এ বাবদে মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ থেকে আর্থিক সাহায্য পান। বাংলাদেশে লেখক-শ্রেণীর একাংশের সঙ্গে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের ঘৃণিত অঙ্গ সি, আই, এর আর্থিক যোগাযোগ আজ আর কথার কথা হয়ে নেই, সি, আই, এর কর্তারাই সেই সংযোগের কথা প্রকাশ করে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছেন। এই কেলেঙ্কারী আজ এতটাই ছড়িয়ে পড়েছে যে সংশ্লিষ্ট লেখকেরা আত্মরক্ষায় সচেতন হয়ে উঠেছেন এবং নানা ছেঁদো যুক্তির আড়াল রচনা করে স্বীয় দোষ স্খালনের চেষ্টা করছেন। এতে ভবী ভোলবার নয়। কেন না এতকাল এঁরা যে "গণতন্ত্র" ও "ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের" পবিত্রতার জয়গানে মুখর ছিলেন, এখন দেখা যাচ্ছে সেই জয়ঘোষণা নিঃস্বার্থ নয় বা প্রত্যয়জনিত নয়; পর্দার আড়ালে তার সুতো ধরা ছিল মার্কিন প্রচার বিশারদের সুদক্ষ অঙ্গুলিতে। একটানা মার্ক্সবাদের বিরুদ্ধে প্রচার ও তথাকথিত গণতন্ত্রের উদ্‌ঘোষণের রহস্য এখন দিবালোকের মত স্পষ্ট। কিন্তু এতকাল এই পুতুলনাচের খেলা খুব ভালোই জমানো হয়েছিল। মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের টাকা খেয়ে ব্যক্তি-স্বাধীনতার মহিমা কীর্তন—এ মনুষ্যলোকের ত বটেই, দেবতাদেরও অবলোকন করবার মত দৃশ্য!

একদল লেখক মুনাফাগৃধ্নু প্রকাশকের বশম্বদ হয়ে তাঁদের মর্জিমাফিক লিখে কী ভাবে দিনের পর দিন বাংলা সাহিত্য ও শিল্প সংস্কৃতির মানের অপকর্ষ ঘটিয়ে চলেছেন সে তথ্যও আজ আর কারুর অবিদিত নেই। আজকাল এক ধরনের "ঐতিহাসিক" উপন্যাসের চল হয়েছে। তারই বাজারদর আজ

প্রকাশক মহলে সবচেয়ে বেশী। এক শ্রেণীর লেখক কে কার আগে এই-জাতীয় উপন্যাস লিখে প্রকাশকের মুনাফা বৃদ্ধির সহায়তা করবেন তার এক অলিখিত প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত। কিন্তু এই জাতীয় উপন্যাসের কিছু-কিছু খোঁজ-খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা জানেন এই সকল উপন্যাস আসলে কী বস্তু। ইতিহাসের নামমাত্র ছিটাফোঁটার ফোড়ন দিয়ে অনেকাংশেই আদিরসাত্মক কল্পিত ঘটনার মিশাল যোগে যে দুষ্পাচ্য বস্তুটি প্রায়শঃ তৈরী হয় তা ইতিহাসও নয়, উপন্যাসও নয়, তা আসলে নবাব-বাদশাদের হারেম-বিহারিণী অসূর্যম্পশ্যা বেগম ও বাঁদীদের নিয়ে বানানো কেচ্ছাকাহিনী। আমাদের দেশের পাঠকের সমাজবোধ এখনও যথেষ্ট পরিমাণে উদ্রিক্ত হয়নি, তাই তাঁরা কাছে যা পান তা-ই গেলেন। পাঠকদের এই আপেক্ষিক অচেতনতা ও প্রস্তুতিহীনতার সুযোগের অপব্যবহার এখনই কঠোর হস্তে দমন করা দরকার। দীর্ঘদিনের সাধনায় বাংলা সাহিত্যে প্রগতিশীলতার একটা সংস্কার গড়ে উঠেছে। কিছু সমাজবিরোধী লেখকের উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়াকলাপের সংস্পর্শে আমরা সে সুস্থ-সংস্কার কলুষিত হতে দিতে পারি না।

আর একশ্রেণীর লেখক আছেন যাঁরা প্রগতিশীলতার বুলি আওড়ান কিন্তু কার্যত প্রতিক্রিয়াশীলতার অপরাধে অপরাধী। অস্তিবাদ (Existentialism) বা ওই-জাতীয় আধুনিকদের গ্রাহ্য অন্য কোন মনোহর মতবাদের রাংতা মুড়িয়ে গল্পোপন্যাসের আকারে এঁরা আসলে যা পরিবেশন করেন তা পর্নোগ্রাফী ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু প্রচার মাহাত্ম্যে ওই সকল বইয়ের কী কাটতি! এমনিতেই এ ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক, তার উপর এই সব অপকৃষ্ট সৃষ্টির অনুকূলে সার্টিফিকেট দেবার মত লেখকের বা সমালোচকের অভাব হয় না। তাতে দুর্ভাগ্য আরও মর্মান্তিক হয়ে উঠেছে। এই সব দেহগন্ধী বইয়ের সঙ্গে আবার অধুনা যুক্ত হয়েছে বিদেশী গল্পের নকল কিছু মনোবিকলনধর্মী "জনপ্রিয়" সিনেমা-গল্পের বই। বাংলা সাহিত্যের সুস্থ ঐতিহ্যের উপর নানা দিক থেকে আঘাত আসছে। এই আঘাত ও তজ্জনিত ক্ষতি অচিরেই বন্ধ হওয়া দরকার। বাংলার আধুনিক প্রগতিশীল লেখকবৃন্দ এই ক্ষতি নিবারণে যত্নবান হবেন এটা আমরা সঙ্গতভাবেই তাঁদের কাছ থেকে আশা করব। সাহিত্যের প্রতি যেমন তাঁদের দায়িত্ব আছে তেমনি সমাজের প্রতিও তাঁদের দায়িত্ব আছে। বস্তুতঃ ওই দুই দায়িত্ব অচ্ছেদ্য এবং একই লেখকধর্মের এ-পিঠ আর ও-পিঠ। সার্থকনামা লেখক হতে গেলে যুগপৎ সাহিত্যমনা ও সমাজমনা লেখক হওয়া আবশ্যক।

আলোচনা শেষ করার আগে একটি বিতর্কমূলক বিষয়ের অবতারণা করতে চাই। বিষয়টি বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক বলেই এখানে সে কথার উল্লেখ করতে চাইছি, নয় তো অন্য কোন অবসরে তা করা যেত।

লেখক সমাজ-সচেতনতা ও প্রগতিশীলতার আদর্শে বিশ্বাসী হলেও প্রগতিশীল সমাজবাদী রাজনৈতিক দলগুলির কোন-একটিতে যোগ দেওয়া তাঁর উচিত কিনা এই হল প্রশ্ন। এই প্রশ্নে আমার কোন কোন সাহিত্যিক-সুহৃৎ সদর্থক অর্থাৎ রাজনৈতিক দলে যোগদানের অনুকূলে মত প্রকাশ করেছেন। সবিনয়ে নিবেদন করি, এই প্রশ্নে আমার মত কিছু ভিন্ন। আমার ধারণা, জগৎ, জীবন ও মানুষের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্নে লেখক প্রগতিমুখী সমাজবোধের দ্বারা চালিত হয়েও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান থেকে নিজেকে বিমুক্ত রাখতে পারেন। এবং সম্ভবতঃ তা-ই তাঁর রাখা উচিত। লেখক সমাজবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হবেন তাতে সন্দেহ কী, কিন্তু তাঁর সাহিত্যধর্মের মধ্যেই এমন একটা কিছু আছে যা তাঁকে স্বাতন্ত্র্যের অভিমুখী করে, নির্দলীয় করে। এই স্বাতন্ত্র্য তাঁর ব্যক্তি-বিবেকের রক্ষাকবচ স্বরূপ এবং সব প্রশ্নকেই তাদের গুণাগুণের নিরিখে বিচারের প্রেরণাদাতা। আগে ভাগেই তিনি কোন একটা চিন্তা বা মতের সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে বসে থাকবেন না, তিনি খোলা মন নিয়ে বিচার করে তবে সিদ্ধান্তে আসবেন। তিনি রাজনীতির প্রবহমান ঢেউয়ের গতি অবশ্যই পর্যবেক্ষণ করবেন, শুধু একটু দূরে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করবেন; ঢেউয়ের স্রোতে তিনি মিশে যাবেন না, তিনি তটস্থ হয়ে তরঙ্গভঙ্গ লক্ষ্য করবেন। এই "তটস্থতা" তাঁর সাহিত্যিক স্বরূপেরই একটি অঙ্গ।

রাজনৈতিক সংস্থা, তা সে যতই অগ্রসর মনোভাবাপন্ন হোক, তার সঙ্গে লেখকের নিজেকে একাত্ম করায় সুবিধা-অসুবিধা দুইই আছে। বোধ হয় খতিয়ে দেখলে অসুবিধার ভাগই বেশী। সুবিধা এই যে, তাতে অনেকের সঙ্গে মিলিত হয়ে কাজ করবার ঐক্যবোধ, সঙ্ঘশক্তি অনুভব করা যায় এবং তার ফলে একাকিত্বের বোধ কমে আসে ও আত্মপ্রত্যয় বাড়ে। অন্যান্য ব্যবহারিক সুবিধা, যেমন প্রচারভাগ্য, সঙ্ঘসুখ, গোষ্ঠীবদ্ধতাজনিত নানা বৈষয়িক লাভ এ সব তো আছেই। কিন্তু অসুবিধা এই যে, তাতে লেখকের আনুগত্যবোধের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে। দলের খাতায় নাম লেখাবার অর্থই হল পুরোপুরি দলীয় নীতির অনুগত হয়ে চলা, অন্ততঃ শৃঙ্খলাপরায়ণ সদস্যের কাছ থেকে এইটেই আশা করা হয়। কিন্তু যে কোনো স্বধর্মনিষ্ঠ

বিবেকী লেখকের পক্ষে দলীয় শৃঙ্খলার খাতিরেও বুঝি দলের সঙ্গে পুরোটা পথ যাওয়া চলে না। লেখকের স্বাতন্ত্র্যের হানি না ঘটিয়ে এটা সম্ভব নয়। এইরূপ সর্বগ্রাসী আনুগত্য দান করা বোধ হয় তখনই সম্ভব যখন লেখক আর তাঁর স্বাধীনতাকে প্রাণের বস্তু বলে জ্ঞান করেন না এবং অল্পস্বল্প বা নামমাত্র মূল্যে তা বিকিয়ে দেবার জন্ম প্রস্তুত থাকেন। রাজনীতির ধর্ম আর সাহিত্যের ধর্ম এক নয়, যদিও এই দুইয়ের মধ্যে কোন কোন ব্যাপারে ভাবের মিল থাকা সম্ভব।

জানি প্রতিবাদীরা বলবেন, সাহিত্যিক যে আপনাকে কোন রাজনৈতিক দলীয় সংস্থার সঙ্গে পুরোপুরি জড়াতে চান না তার মধ্যে তাঁর সুবিধাবাদী চরিত্র প্রকটিত। এবং ভীরু চরিত্রও। সুবিধাবাদ এইখানে যে, তার ফলে তাঁর পক্ষে হাওয়ার গতিক বুঝে যে-কোন দলের সঙ্গে গা-শোঁকাশুঁকি করা সম্ভব হয়: তাল বুঝে তিনি এ-দল বা ও-দলের সঙ্গে মিশে নানা ব্যবহারিক সুবিধা করে নিতে পারেন। ভীরুতা এইজন্ম যে, জনগণের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে কিংবা অনুরূপ অন্য কোন প্রশ্নে জনদরদী কোন দলের নীতির সঙ্গে ষোল-আনা একাত্ম হয়ে চলবার ও তার ফলাফল ভোগ করতে প্রস্তুত থাকবার মত তাঁর মনোবল নেই বলেই তিনি দূরে সরে থাকতে চান। লেখকের স্বাতন্ত্র্যের যুক্তি একটা অজুহাত, অপ্রিয় পরিণাম থেকে আত্মরক্ষার একটি কৌশল।

এই যুক্তিক্রমের মধ্যে কিছুটা জোর আছে এবং এমন ব্যাপার যে ঘটে না তা-ও নয়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও বলব, এমনতরো ভুল-বোঝাবুঝির ঝুঁকি নিয়েই লেখককে তাঁর স্বনির্দিষ্ট স্বতন্ত্র কক্ষপথে চলতে হবে। তার সাহিত্যের ধর্ম সুরক্ষিত রাখবার জন্যই তাঁকে তাঁর নিজের পথ আঁকড়ে থাকতে হবে। প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নিজের সত্তা মিশিয়ে দিয়েছেন এমন শক্তিমান সাহিত্যিকের অভাব নেই পৃথিবীতে, আবার তার বিপরীত দৃষ্টান্তও ভূরি-ভূরি আছে। শেষোক্ত বর্গের লেখকদের কেউ কেউ হয়তো প্রতিক্রিয়াশক্তির কুক্ষিগত হয়ে থাকবেন কিন্তু বেশীর ভাগ লেখকই তাঁদের নির্দল স্বাতন্ত্র্য অব্যাহত রেখে প্রগতির অনুকূলে জোরালো ভাবে লেখনী চালনা করেছেন। রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে যাঁরা বিচক্ষণ তাঁরাও বোধ হয় স্বদলের সঙ্গে সাহিত্যিকের একাত্মীভূত হয়ে যাওয়াটা পছন্দ করেন না। তাঁরা সাহিত্যিকের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা সব সময়ই কামনা করেন কিন্তু রাজনৈতিক কারণেই এই দুই ধারার, সম্ভবতঃ ভিন্ন প্রকৃতিরও, মানুষের মধ্যে কোথাও

না কোথাও একটা সীমারেখা থাকুক এটা দেখতে চান। রাজনীতিজ্ঞের এই মনোভঙ্গীটিই আমার নিকট সুস্থ মনোভঙ্গী বলে মনে হয়—কি রাজনীতির দিক্ থেকে, কি সাহিত্যের দিক্ থেকে।

লেখক তাঁর স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রাখবেন কিন্তু অবশ্যই তিনি তাঁর শক্তি প্রতিক্রিয়ার সপক্ষে প্রয়োগ করবেন না, তাঁর সবটুকু বল ও নিষ্ঠা দিয়ে প্রগতির আদর্শের সেবা করবেন। তিনি জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক দাবির অতন্দ্র প্রহরী। এই প্রশ্নে বাদী-প্রতিবাদী উভয় পক্ষ যদি একমত হন তা হলে বাদানুবাদের আর কোন ক্ষেত্র অবশিষ্ট থাকে বলে মনে করি না।

রুশ বিপ্লব ও কাজী নজরুল

রুশ দেশের নভেম্বর বিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসে এক যুগান্তকারী সংঘটন। এই বিপ্লবের ফলে শুধু যে রাশিয়ার কুড়ি কোটি অধিবাসীরই দীর্ঘকালের অত্যাচার-বঞ্চন-পীড়ন থেকে মুক্তি ঘটেছিল তা-ই নয়, গোটা পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষের জীবনেও তাতে এক প্রচণ্ড আশা ও উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল। এই বিশ্বাসে যে, বিশ্বমুক্তির সম্ভাবনা অতঃপর আর দূরাগত হয়ে থাকতে পারে না, নভেম্বর বিপ্লব যে-পথে সাধিত হয়েছে বিশ্ব-বিপ্লবও একদিন সেই পথেই সাধিত হবে। রুশ বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল জারতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করে সে দেশের শ্রমিক ও কৃষকদের হাতে ক্ষমতার হস্তান্তরণের জন্য। প্রকৃতপক্ষে, রুশ বিপ্লবের প্রধান নায়ক মহামতি লেনিন এই বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখে বিগত শতাব্দীর শেষ দশক থেকেই সচেতন ভাবে প্রস্তুত হয়ে আসছিলেন এবং একটির পর একটি ধাপে অগ্রসর হয়ে অবশেষে ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর তারিখে চূড়ান্ত আঘাত হেনেছিলেন। রুশ বিপ্লবের ঐতিহাসিকদের মতে লেনিনের সময়জ্ঞান ছিল নিখুঁত—তিনি তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণ করতে গিয়ে আঘাত হানার নির্দিষ্ট দিনটিকে একদিন আগেও আনেননি, একদিন পিছিয়েও দেননি, ঠিক দিনে ঠিক কাজটি করে অত্যাচারী জার শাসনকে রাশিয়ার মাটি থেকে চিরতরে বিদায় দিয়েছিলেন এবং তার জায়গায় জনগণের শাসন কায়েম করেছিলেন সোভিয়েত বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। দেশে দেশে এই ঘটনা প্রচণ্ড অভিঘাতের সৃষ্টি করে—একদিকে কোটি কোটি সাধারণ মানুষের মনে আনন্দ ও উদ্দীপনার ঢেউ বয়ে যায়, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী ধনবাদী ক্ষমতাগর্বী সকল প্রকার কায়েমীস্বার্থ সংস্থষ্টদের মনে জাগে আতঙ্ক, হতাশা ও বিহ্বলতা। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে নাস্তি ও অস্তিবানদের মধ্যে দুটি সুস্পষ্ট শিবির বিভাগ হয়ে যায়।

এইখানে প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি রাশিয়ার পুরাতন পঞ্জিকা অনুযায়ী বিপ্লব সাধিত হয়েছিল অক্টোবর মাসে। এতদিন তাই এই বিপ্লবকে অক্টোবর বিপ্লব নামেই অভিহিত করা হয়ে আসছিল। কিন্তু সংশোধিত নূতন পঞ্জিকা অনুযায়ী বিপ্লবের তারিখ পড়ে নভেম্বরে। সেই থেকে রুশ বিপ্লব নভেম্বর বিপ্লব নামেই সমধিক পরিচিত হয়ে চলেছে।

ভারতবর্ষের তদানীন্তন ইংরেজ সরকার সর্বপ্রকারে চেষ্টা করেছিল রুশ বিপ্লবের সংবাদ এদেশে চেপে রাখবার জন্য। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সতর্কতার সমস্ত বেড়াজাল ভেদ করে এই সংবাদ ক্রমেই ভারতীয় জনগণের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। স্বভাবতঃই জনগণ এই সংবাদে প্রচণ্ডভাবে নাড়া খায়। এদেশের মানুষের কাছ থেকে পৃথিবী-কাঁপানো এত বড় ঘটনাকে আড়াল করে রাখা কি তাঁদের কর্ম? অরণ্যানী জুড়ে যখন ব্যাপক দাবানলের সৃষ্টি হয়ে চারদিক আলো হয়ে ওঠে, তাকে কি কোনমতে ঢেকে রাখা যায়? সে যে স্বপ্রকাশ। দুরবীণ দিয়ে তাকে দেখবার দরকার হয় না, তার তাত আপনিই এসে চোখে লাগে। এও সেই রকমের ব্যাপার। রুশ দেশের নভেম্বর বিপ্লব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘটনায়, তাৎপর্যে ও পরিণামে এতই বহ্নিমান ছিল যে তার থেকে ছিটকে আসা দুটো একটা আগুনের ফুলকি ইংরেজের সমস্ত জারিজুরি ব্যর্থ করে দিয়ে এদেশের মাটিতে উড়ে এসে পড়েছিল। ইংরেজ যখন দেখল যে নীরবতার সাত-পাল্লা কম্বল চাপা দিয়েও এ ঘটনাকে ঢেকে রাখবার উপায় নেই, তখন শুরু হলো অপপ্রচার—সত্যের ইচ্ছাকৃত বিকৃতি। রুশ বিপ্লবের মহানায়ক লেনিন থেকে শুরু করে তাঁর অন্যান্য তাবৎ সহকর্মীদের ভাবমূর্তি মলিন করবার চললো চক্রান্ত। যেন তাঁরা একদল দস্যু ভিন্ন আর কিছু নয়, গোপন ষড়যন্ত্রের ছিদ্রপথে বলপ্রয়োগের সাহায্যে রুশ সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী জার নিকোলাসকে শাসনতক্ত থেকে উৎখাত করে তার জায়গায় উড়ে এসে জুড়ে বসেছে- বিপ্লবীদের কাজের পিছনে যে গোটা দেশের শ্রমজীবী জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল এ কথা সযত্নে চেপে যাওয়া হয়। মিথ্যা প্রচারের প্রবলতায় অনেক সময় সত্যসন্ধ মানুষও বিভ্রান্ত হয়। তার প্রমাণ দাখিল করতে গিয়ে এই বলাই যথেষ্ট যে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর ভাবশিষ্য প্রমথ চৌধুরীর মত মুক্তমনের মানুষেরাও ইংরেজের এই অপপ্রচারে গোড়ায় কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন (প্রমথ চৌধুরীর রায়তের কথা ও রবীন্দ্রনাথ কৃত ওই বইয়ের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু পরে তাঁরা তাঁদের ওই ভ্রান্তি উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিশেষ, রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েত রাশিয়া পরিদর্শনান্তে যে-অমর পত্রগুচ্ছ লেখেন (রাশিয়ার চিঠি) তাতে তিনি তাঁর পূর্বকৃত ভুলের পুরোপুরিই প্রায়শ্চিত্ত করেন বলা যায়।

রুশ বিপ্লবের ঢেউ বাংলাদেশের তীরে এসেও আছড়ে পড়েছিল। দুটি ঘটনায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথম ঘটনা কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ, কমরেড আবদুল হালিম প্রমুখ কৃষক শ্রমিক নেতাগণ কর্তৃক ১৯২০ সালে ভারতের

কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা। দুই, বাংলা সাহিত্যে নভেম্বর বিপ্লবের প্রতিফলন। অবশ্য গোড়ার দিকে এই প্রতিফলন স্বতঃই অত্যন্ত ক্ষীণরেখ ছিল কিন্তু যতই দিন যেতে থাকে ততই কালপ্রভাবে প্রবলতাপ্রাপ্ত হতে থাকে। প্রথম দিকে কমরেড মুজফ্ফর আহমদের সহযোগী-সুহৃৎ কবি কাজী নজরুল ইসলামের রচনাতেই বিপ্লবী ভাবের স্ফুরণ সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য করা যায়। বিদ্রোহী কবি নজরুল তখনও বাংলা কাব্যসাহিত্যে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করেননি, তখনও তিনি ৪৯নং বাঙালী পল্টনের সৈনিক রূপে করাচীতে অবস্থান করছিলেন। কিন্তু তখন থেকেই তাঁর রচনার মধ্যে রুশবিপ্লবের ছায়াপাত হতে থাকে। করাচীতে সৈনিক ব্যারাকে নজরুলের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন সহ-সৈনিক জমাদার শম্ভু রায়। জমাদার শম্ভু রায়ের এক পত্র ('কাজী নজরুল', প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, দ্বিতীয় সংস্করণ ও 'কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা', মুজফ্ফর আহমদ, চতুর্থ মুদ্রণ দ্রষ্টব্য) থেকে জানা যায় করাচীর সৈন্য ব্যারাকে অবস্থিতিকালে নজরুল রুশ বিপ্লবের ভাবের দ্বারা বিশেষভাবে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর কাছে রুশ বিপ্লবের কাগজপত্র যেভাবেই হোক আসত এবং তিনি সেগুলি পড়ে খুবই অনুপ্রাণিত বোধ করতেন। এ কথা যে কথার কথা নয় তা তাঁর ওই সময়কার রচিত 'ব্যথার দান' নামক পত্রোপন্যাস ও 'রেনা' নামক গল্পটি পড়লেই বোঝা যায়। 'ব্যথার দান' উপন্যাসে আছে কাহিনীর নায়ক দুরন্ত বী (পরে পুস্তকাকারে ছাপানোর সময় এই নাম পরিবর্তন করে দারা রাখা হয়) ও তার বন্ধু সৈফুল মুক্ত লালফৌজে যোগ দিয়েছিল এবং যে-বিপ্লববিরোধী শক্তি বিপ্লবকে পর্যুদস্ত করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে, লালফৌজের সামিল হয়ে তারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।

মুদ্রিত বইয়ে অবশ্য 'লালফৌজ' কথাটির উল্লেখ নেই, তার জায়গায় আছে 'মুক্তিসেবক সৈন্যদের দল'। এর কারণ এই যে, এই উপন্যাসটি যখন কিস্তিওয়ারী-ভাবে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়' প্রকাশিত হচ্ছিল তখন ওই পত্রিকার পরিচালক মুজফ্ফর আহমদ ইংরেজের চোখে ধুলো দেবার জন্য লালফৌজ কথাটি কেটে তার জায়গায় 'মুক্তিসেবক সৈন্যদের দল' কথাটি বসিয়ে দিয়েছিলেন। কেন না লালফৌজের উল্লেখ থাকলে পত্রিকাটিকে ঝামেলায় পড়তে হতো এবং তার ফলে পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়াও অসম্ভব ছিল না। এমনই ছিল সে সময় ইংরেজ সরকারের রুশবিপ্লবভীতি ও সাবধানতা। মুজফ্ফর আহমদ সাহেব তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন পত্রিকাটির বাজেয়াপ্তকরণ এড়াবার জন্যই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে তাঁকে তখন এই কৃত্রিম নামান্তরের আশ্রয়

নিতে হয়েছিল—এখন আর ওই ছলটিকে টিকিয়ে রাখার কোন যৌক্তিকতা নেই।

নজরুলের একাধিক কবিতায় রুশ বিপ্লবের প্রভাব পড়েছে বলে অনুমান করবার কারণ আছে। তাঁর "বিদ্রোহী", "সাম্যবাদী", "ফরিয়াদ", "আমার কৈফিয়ৎ", "সর্বহারা", "প্রলয়োল্লাস" প্রভৃতি কবিতা ও একাধিক গান এ অনুমানের যাথার্থ্য বহন করছে। সব কবিতায় প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে এ কথা হয়ত ঠিক নয় কিন্তু পরোক্ষ প্রভাব নিশ্চয়ই আছে। একটা ভাব যখন প্রবলভাবে জনমনকে অধিকার করে তখন আকাশে-বাতাসে তার দ্যোতনা সঞ্চারিত হতে থাকে, হাওয়ায় কান পাতলেই তখন সেই ভাবের অনুরণন শুনতে পাওয়া যায়। রুশ বিপ্লবের আদর্শও বুঝি সেইভাবে বাংলার জলেস্থলে অন্তরীক্ষে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, আর তা থেকে নজরুল প্রয়োজনীয় প্রেরণার সমিধ্ সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন অগ্নিবীণার সুরের উপাদান রূপে। বিদ্রোহী কবিতার বিদ্রোহ তো বিদ্রোহের একটা ভঙ্গি মাত্র নয়, সে যে বিপ্লবেরই পূর্বাভাস। তার মধ্যে আমিত্বের অহংকারের যে ব্যঞ্জনা, তা তো জরাজীর্ণ প্রথাবদ্ধ পুরাতন যা কিছু তাকে গুঁড়িয়ে দেবারই নিশানা। সাম্যবাদী কবিতার প্রথম চার লাইন: গাহি সাম্যের গান/যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান। যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুস্লিম ক্রীশ্চান/গাহি সাম্যের গান!—এ ভারতের অনুষঙ্গে লেখা হলেও পরিষ্কার বোঝা যায় এর পিছনে নভেম্বর বিপ্লবের সাম্যের দ্যোতনা রয়েছে। কিংবা ওই সুদীর্ঘ কবিতারই আর একটি স্তবকের প্রথম চার পঙ্ক্তি: গাহি সাম্যের গান/মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কিছু মহীয়ান্/নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,/সব দেশে সব কালে ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।/ এর মধ্যে যে আন্তর্জাতিকতার সুরটি নিহিত রয়েছে তারও মূল খুঁজতে গেলে রুশ বিপ্লবের ভাবের গহনেই তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে করি। কিংবা, ফরিয়াদ কবিতার শেষ চার লাইন: মুক্ত কণ্ঠে স্বাধীন বিশ্বে উঠিতেছে একতান—/জয় নিপীড়িত প্রাণ!/জয় নব অভিযান/জয় নব উত্থান!—এ কোন্ অভিযান, কোন্ উত্থানের নান্দী পাওয়া হচ্ছে? গণমানুষেরই নয় কি? আর সেই গণমানুষেরই জয়ধ্বনি কি উদ্গীরিত হয়নি রুশবিপ্লবের সাফল্যের মধ্য দিয়ে? কিংবা আমার কৈফিয়ৎ কবিতার শেষ দুই পংক্তি: প্রার্থনা করো—যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,/যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ!/এ কোন্ সর্বনাশের ইঙ্গিত চরণ দুটির মধ্য দিয়ে স্ফুরিত হচ্ছে? সর্বহারা শ্রেণীর কোটি কোটি মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে খেয়ে যাদের ঐশ্বর্যের প্রাকার উত্তুঙ্গ, সেই সব অত্যাচারী শাসক ও

শোষকের অস্তিত্বটাই কি ব্যাহত হচ্ছে না এই ভয়ঙ্কর অভিসম্পাতবাণীর লেখার লেখায়? প্রকৃতপক্ষে রুশবিপ্লব একটা সর্বব্যাপী ভাবের পটভূমি রূপে নজরুলের কবিতার পিছনে বিদ্যমান রয়েছে। দুইয়ের ভিতর যোগসূত্র অতিনিবিড়।

১৯২২ সালের এপ্রিল মাসে নজরুল কুমিল্লায় অবস্থান কালে "প্রলয়োল্লাস" নামে একটি কবিতা লেখেন। এটি পরে কোরাস গান রূপেও বহুলভাবে গীত ও প্রচারিত হয়। রচনাটির আরম্ভ এইরূপ :

তোরা সব জয়ধ্বনি কর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর।
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে
কালবোশেখীর ঝড়।

জাতীয়তাবাদীরা দাবি করেন এই রচনাটি গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রে রচিত হয়েছিল। কিন্তু মুজফ্‌ফর আহমদ এই মত খণ্ডন করে বলেছেন, রচনাটির মূল প্রেরণা রুশ বিপ্লব। অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা ১৩২০ সালে, ২১ সালে তার তুঙ্গ স্পর্শ করে, ২২ সালে চৌরীচরার ঘটনার পর আন্দোলন হঠাৎ একেবারে জুড়িয়ে যায়, আগুন আকস্মিক দপ্‌ করে নিবে যাওয়ার মত। যে কবিতার জন্ম ২২ সালের এপ্রিলে তা অসহযোগ আন্দোলনকে সামনে রেখে রচিত হয়েছে এ কথা সহজ বুদ্ধিতে বিশ্বাস্য বলে মনে হয় না। মুজফ্‌ফর লিখছেন ১৯২১ সালের শেষাশেষি থেকে তাঁরা এদেশে কম্যুনিস্ট পার্টিকে জোরদার করে তোলার জন্য উঠেপড়ে লাগেন। তাঁদের এই পরিকল্পনার পিছনে কাজী নজরুল ইসলামও ছিলেন। তাঁদের সেই পরিকল্পনা থেকেই সুবিখ্যাত "প্রলয়োল্লাস" কবিতাটির সৃষ্টি। কবিতাটির একাংশে আছে—

মাভৈঃ মাভৈঃ! জগৎ জুড়ে প্রলয় এবার ঘনিয়ে আসে।
জরায় মরা মুমূর্ষুদের প্রাণ লুকানো ঐ বিনাশে!

মুজফ্‌ফর মনে করেন জগৎ-জোড়া যে-প্রলয়ের ইঙ্গিত করা হয়েছে তা রুশ বিপ্লব ভিন্ন আর কিছু নয়। কবিতাটির অন্য এক অংশে "সিন্ধু-পারের সিংহ-দ্বারে ধমক হেনে" 'আগল' ভাঙার কথা আছে, এটিও মুজফ্‌ফরের মতে রুশ বিপ্লবের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করছে। মুজফ্‌ফরের উক্তি : "তার সিন্ধুপারের 'আগল ভাঙা' মানে রুশ বিপ্লব। তার প্রলয় মানে 'বিপ্লব'। আর জগৎ-জোড়া বিপ্লবের ভিতর দিয়েই আসছে নজরুলের নূতন অর্থাৎ আমাদের দেশের বিপ্লব। এই বিপ্লব আবার সামাজিক বিপ্লবও।" (কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা, ৪র্থ মুদ্রণ, পৃঃ ২১১)।

১৯২০ সালে এ, কে, ফজলুল হক সাহেবের অর্থানুকূল্যে এবং মুজফ্ফর আহমদ ও কাজী নজরুলের যুক্ত সম্পাদনায় কলকাতা থেকে 'নবযুগ' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল সান্ধ্য দৈনিক। এই পত্রিকায় নজরুল একাধিক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন যার পিছনে রুশ বিপ্লবের অস্পষ্ট হলেও কিছু প্রণোদনা ছিল এরূপ মনে করবার কারণ আছে। বিশেষ করে তাঁর "মুহাজিরিন হত্যার জন্ম দায়ী কে?" এবং "ধর্মঘট" শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয় তো নিঃসন্দেহেই এই দিকে ইঙ্গিত করছে। 'মুহাজিরিন' কথাটার মানে হলো স্বেচ্ছা নির্বাসন বরণকারীর দল। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের সমাপ্তিতে ইংরেজ তুরস্কের খলিফার প্রতি চূড়ান্ত অবিচার করে। এ দেশে খিলাফৎ আন্দোলনের সূত্রপাত সেই থেকে। খিলাফৎ আন্দোলনেই শুধু ভারতীয় মুসলমানদের বিক্ষোভ সীমিত ছিল না, তুরস্কের প্রতি ইংরেজ কৃত অন্যায়ের প্রতিবাদে প্রায় আঠারো হাজার ভারতীয় মুসলমান স্বদেশ ত্যাগ করে আফগানিস্থান অভিমুখে রওনা হন। এঁরা ছিলেন সব পাঞ্জাব, সিন্ধুদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসী। এঁদেরই বলা হয় "মুহাজিরিন"। এই মুহাজিরিনদের একটা দল কাবুল থেকে টাসকেণ্ট অভিমুখে চলে যান রুশ বিপ্লবী সৈন্যদলে যোগ দেবার অভিপ্রায়ে। টাসকেণ্টে তাঁদের স্বাগত জানাবার ও বিপ্লবী চিন্তাধারায় দীক্ষিত করে তোলবার জন্ম সোভিয়েত সরকার এম. এন. রায়কে টাসকেণ্টে প্রেরণ করেছিলেন তা যাঁরা মানবেন্দ্র রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত আছেন তাঁরাই জানেন।

এইরূপ জনা চল্লিশেক মুহাজিরিনকে অতর্কিতে পেয়ে ইংরেজ সরকারের নিযুক্ত ভারতীয় বাহিনীর সেনারা নৃশংসভাবে হত্যা করে। তারই প্রতিবাদে ও তারই ক্ষোভ জনিত বেদনায় এই বিখ্যাত প্রবন্ধটির জন্ম। ইংরেজ সরকার এই প্রবন্ধটির জন্ম নবযুগের উপর খুবই খাপ্পা হয়ে ওঠেন এবং পত্রিকা-পরিচালককে সতর্ক করে দেন। তারই কিছুদিন বাদে কোন একটা ছুতোয় সরকারের কাছে জামানত রাখা নবযুগ পত্রিকার একহাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। প্রবন্ধটির গভীর ভাবাবেগের আবেদনে পাঠক অভিভূত বোধ না করেই পারেন না। পরে এই প্রবন্ধ ও নবযুগের অন্যান্য প্রবন্ধ মিলে 'যুগবাণী' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

কাজী নজরুল ইসলামের মারফতেই প্রথম বাংলা সাহিত্যে নভেম্বর বিপ্লবের আবাহনী রচিত হয়। পরে অন্যান্য লেখকেরা সেই সূত্রটিকে তুলে ধরেন এবং আরও সম্প্রসারিত করেন কিন্তু পাথিকৃত্যের কৃতিত্ব নজরুলের সে কথা বলতেই হয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের এক আশ্চর্য প্রতিভা। আশ্চর্য প্রতিভা এই দিক থেকে যে, সহজাত শক্তিমত্তার সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গীর অনন্যতা ও চিন্তার স্বাতন্ত্র্যের এমন বিস্ময়কর সমাবেশ বাংলা কথাসাহিত্যের আর কোন শিল্পীর জীবনে পরিলক্ষিত হয়নি। তিনি লেখনী ধারণ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৌলিকতার অভ্রান্ত পরিচয় দিয়েছিলেন। এর প্রমাণ পাই তাঁর 'অতসী মামী' গল্পের কাহিনী-বয়নের ছাঁচের মধ্যে, 'জননী' উপন্যাসের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতার মধ্যে, সর্বোপরি 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসের প্রেম সম্বন্ধীয় প্রচলিত রোমান্টিক ধারণার চূড়ান্ত নির্জিতকরণের মধ্যে। দিবারাত্রির কাব্য উপন্যাসের ধারাধরণ থেকেই প্রথম পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল এই লেখক বাংলা ভাষায় প্রচলিত কথাসাহিত্যের অভ্যস্ত রেখাচিহ্নের উপর দাগা বুলনোর জন্য আবির্ভূত হননি, কাজেই মামুলী ধারায় গল্পোপন্যাসের সংখ্যাবৃদ্ধির কাজে তাঁর সৃষ্টিক্ষমতাকে নিয়োজিত দেখতে চাওয়ার মত ভুল প্রত্যাশা আর কিছু হতে পারে না। একেবারে গোড়াতেই এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি এক অসাধারণ মনের অধিকারী, যে-মন গতানুগতিক পথে চলে না, গতানুগতিক ভাবে ভাবে না, প্রথাবদ্ধ চিন্তাচর্চায় যে মনের কণামাত্র উৎসাহ নেই। তিনি বাংলা কথাসাহিত্যে সম্পূর্ণ নয়া এক ঐতিহ্যের সৃষ্টি করবেন বলেই কলম হাতে নিয়েছেন আর সে-ঐতিহ্যের গতিপথের পদে পদে স্বকীয়তার চিহ্ন স্পষ্ট।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখক হওয়ার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় ছিল না, তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন এবং বিজ্ঞানকেই জীবনে অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ আকস্মিক এক বাজী ধরার ঘটনা তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল এবং তাঁকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এনে হাজির করেছিল। সেই যে সাহিত্যকে অবলম্বন করলেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সাহিত্য সেবা থেকে আর বিচ্যুত হননি—সুখে-দুঃখে আপদে-বিপদে আধি-ব্যাধিতে সাহিত্যই তাঁর মুখ্যাকর্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাজী ধরে অতসী মামী রচনার মারফতে প্রবাসী পত্রিকায় ছোট গল্প প্রতিযোগিতায় জেতার ঘটনা থেকে বোঝা যায় সাহিত্য প্রতিভা তাঁর ভিতর সুপ্ত ছিল, শুধু নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হওয়ার জন্য বাইরের একটি উত্তেজক কারণের প্রয়োজন ছিল। বাজী ধরাটা নিমিত্ত মাত্র, তা না হয়ে অন্য কোন কারণেও তাঁর অন্তরের নিরুদ্ধ সৃষ্টি প্রেরণার স্রোতমুখ খুলে যেতে

পারতো। প্রথম আবির্ভাবেই তিনি চমক লাগিয়ে দিলেন ওইতেই বোঝা যায় প্রতিভার শক্তি নিয়ে তিনি এসেছিলেন, আর সে-শক্তি, যে-কথা গোড়াতেই বলেছি, অভ্রান্ত মৌলিকতার লক্ষণ মণ্ডিত।

মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল তাঁর মানুষকে দেখার দৃষ্টিকোণের ভিতর। তিনি মানুষের বহির্জীবনকে গুরুত্ব না দিয়ে তার অন্তর্জীবনের গহনে তাঁর দৃষ্টি স্থাপন করেছিলেন। প্রতিটি মানুষ বাইরের পৃথিবীতে যেমন বিচরণ করে তেমনি তার সমান্তরালে তার একটি মনোজীবন আছে—সে জীবন অন্ধকারের জটিলতায় ভরা এবং সেখানে সম্পূর্ণ একক তার পদচারণা। নানা অতৃপ্ত বাসনা-কামনার সেখানে আনাগোনা এবং তারই সূত্র ধরে নানা নির্জ্ঞান ইচ্ছার বিচরণ। মানিক তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রারম্ভিক অধ্যায়ের বেশ কয়েকটি বছর মানুষের এই আঁধার ঘেরা জটিল মনের রহস্য উন্মোচনে সমধিক ব্যস্ত ছিলেন। মানুষের মনের গূঢ়তম ইচ্ছার ততোধিক গহনতম লীলার পশ্চাদ্‌বর্তী সূক্ষ্ম অভিপ্রায়কে চিড়ে ফেঁড়ে ব্যবচ্ছেদ করে তার থেকে এক ধরণের বৈজ্ঞানিক আত্মপ্রসাদ লাভ করায় ছিল তাঁর আনন্দ। তাঁর এই মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধানক্রিয়ার পিছনে হয়ত ফ্রয়েডের নির্জ্ঞান মনের তত্ত্ব প্রেরণা জুগিয়েছে, কিন্তু ফ্রয়েডের আদর্শ যদি তাঁর সামনে না-ও থাকত তাহলেও এই অসামান্য এবং সম্পূর্ণ অ-গতানুগতিক মনের অধিকারী মানুষটি একান্তভাবে স্বীয় চালিকাশক্তির প্ররোচনাতেই ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের রাস্তায় পা বাড়াতেন, এরূপ অনুমান করা যায়। তাঁর দুর্মর বৈজ্ঞানিক কৌতূহলই তাঁকে ওইদিকে চালিয়ে নিয়ে যেত।

দিবারাত্রির কাব্য উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেমের রহস্য ভেদ করতে গিয়ে যে প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিয়েছেন তাকে সর্বাংশেই মনোবিকলনের পদ্ধতি বলা যায়। আমাদের প্রচলিত ধারণায় নর-নারীর জৈব আকর্ষণ প্রায়শঃ একাধিক রোমান্টিক কুহকের স্তর দ্বারা আবৃত থাকে, তা নয় তো ওই আকর্ষণ আমাদের চোখে বড়ই আদিম আর অশালীন বলে মনে হতো। মানিক তাঁর নির্মোহ শিল্পসৃষ্টির শলাকা প্রয়োগ করে ওই রোমান্টিকতার পর্দাগুলি একের পর এক নিষ্ঠুর হাতে ছিঁড়ে ফেলেছেন এবং প্রেমকে তার জান্তব স্ব-স্বরূপে অনাবৃত করে তুলে ধরেছেন।

বাংলা সাহিত্যের গল্পোপন্যাসে মনস্তত্ত্বচর্চা এর আগে যে না হয়নি এমন নয় কিন্তু এ জিনিস সম্পূর্ণ নতুন। এর জাতই আলাদা। এই অভিনব মনস্তত্ত্ব ক্রিয়ার উপস্থাপনায় যে মন কাজ করছে তাকে জটিল বলাই যথেষ্ট নয়, কুটিল

বলতেও সাধ জাগে। আর ঠিক এই দুই বিশেষণই প্রয়োগ করেছিলেন বাংলা সাহিত্যের এক অগ্রণী সমালোচক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্কে দিবারাত্রির কাব্য উপন্যাসটির আলোচনা প্রসঙ্গে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পী জীবনের বিবর্তনে তিনটি সুস্পষ্ট স্তর লক্ষ্য করা যায়। প্রথম, অবিমিশ্র মনোবিকলনের স্তর; দ্বিতীয়, মধ্যবর্তী মিশ্র স্তর, যে-স্তরের রচনায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোবিকলনের পাশে পাশে সমষ্টিকেন্দ্রিক সমাজ ভাবনার অঙ্কুরও স্পষ্ট উদগত হয়ে উঠেছে দেখতে পাওয়া যায়; তৃতীয়, অবিমিশ্র সমাজ চৈতন্যের স্তর। প্রথম স্তরের রচনার মধ্যে কয়েকটি প্রসিদ্ধ উপন্যাসের নাম করা যায়, তার মধ্যে সবচেয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক হলো 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুল-নাচের ইতিকথা', ও 'শহরতলী' দুই খণ্ড। পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের কাহিনীবৃত্তের ভিতর চরিত্রগুলির মনস্তত্ত্বরূপায়ণ একটা বড় জায়গা জুড়ে আছে সন্দেহ নেই, সেই সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করা যায় যে, পূর্ববঙ্গের পদ্মাপারের অত্যন্ত অবনত শ্রেণীগুলির অন্যতম ধীবর সম্প্রদায়ের মানুষগুলির দুঃখ-দারিদ্র্য, শোষণ ও বঞ্চনা, কামনা ও বাসনা এই উপন্যাসে গভীর বাস্তবতায় উপস্থিত করবার চেষ্টা করা হয়েছে। নীচুতলার সমাজের নরনারীর মর্মান্তিক অভাব-দৈন্যের ছবিটি এ লেখায় অতিশয় স্পষ্ট—লেখক অনেকদিন নির্জ্ঞান মনের জটিল কুটিল অন্ধকারে বিচরণের পর সমাজ-বাস্তবতার কূলে জেগে উঠেছেন পদ্মানদীর মাঝিতেই তার প্রথম সার্থক আভাস মিলল। কুবের মাঝির দারিদ্র্য সমগ্র নির্যাতিত শ্রেণীর মানুষের দারিদ্র্যের প্রতিরূপক।

পুতুল নাচের ইতিকথাও মূলতঃ মনস্তত্ত্বপ্রধান রচনা তবে এ রচনার শক্তি তার মনস্তত্ত্বচিত্রণে নয়, তার দার্শনিক ভাবুকতায়। শশী ও কুসুম গ্রামের একজোড়া সাধারণ নরনারী হলেও এবং তারা দুজন পরস্পরের প্রতি দুর্নিবার ভাবে আকৃষ্ট হলেও তাদের জৈব কামনার বাস্তবতাকেও ছাড়িয়ে যায় তাদের ভাবুকতা, যা ভারতীয় সনাতন চিন্তাশীলতার ঐতিহ্যের দ্বারা পুষ্ট। তবে সত্যের খাতিরে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, পুতুল নাচের ইতিকথা শক্তিশালী উপন্যাস হলেও তার মধ্যে যে-বক্তব্য রাখা হয়েছে তা যথার্থ প্রগতিশীল আদর্শের পরিপোষক নয়। তা প্রকারান্তরে ভারতীয় নিয়তিবাদকেই পরিপুষ্ট করে। মানুষ সকলেই যদি অদৃষ্টের হাতের পুতুল হয়, যা কি না এই বইয়ের অভীপ্সিত বলবার কথা বলে মনে হয়, সেক্ষেত্রে মানুষের জীবনে স্বাধীন ইচ্ছার কোন ভূমিকা থাকে না।

শহরতলী এই পর্যায়ের উপন্যাসগুলির মধ্যে সবচেয়ে সমাজসচেতন রচনা।

যশোদা বাংলা সাহিত্যে একটি আশ্চর্য চরিত্র—এমনতর চরিত্রের কোন পূর্ব নজীর নেই বাংলা গল্পোপন্যাসের জগতে। পরেও এই শ্রেণীর চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে কিনা সন্দেহ। যশোদা শহরতলীর একটি পাইস হোটেলের মালিক। গরীব-গরবা খেটে-খাওয়া মেহনতী শ্রেণীর লোকেরা তার হোটেলে খেতে আসে। গ্রাম থেকে ছিটকে-আসা বিগত যৌবনা এই স্থূলকায়া প্রৌঢ়া রমণীর কাছে তার ভাতের হোটেলের খদ্দেররা নিছক খদ্দেরই নয়, তাদের সুখ দুঃখের সঙ্গেও তার আত্মীয়তার টান। শুধু তাই নয় কারখানার মালিকের সঙ্গে বিরোধে যশোদার সুস্পষ্ট পক্ষপাত তার খদ্দের শ্রমিকদের দাবী-দাওয়ার প্রতি। মায়ের স্নেহে সে এদের সংরক্ষণ করে, এদের মধ্যে কেউ নেশায় কিংবা অন্য দোষে বেচাল হলে তাকে সুপথে ফিরিয়ে নিয়ে আসে, শেষ পর্যন্ত দেখা যায় সে তাদের হয়ে কারখানা মালিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ-সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হয়েছে। এ এক অসাধারণ উপন্যাস, এই রচনার সাক্ষ্য থেকেই প্রথম সংশয়াতীতরূপে বুঝতে পারা গেল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আর পূর্বের মত ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের কায়দায় ব্যক্তি-কেন্দ্রিক অন্তর্নিবেশচর্চায় উৎসাহী নন, ইতোমধ্যে তাঁর মনোযোগের ক্ষেত্রবদল হয়ে গিয়েছে, তিনি সমষ্টিচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। সমাজকল্যাণ ভাবনা তাঁর শিল্পচর্চার একটা প্রধান উপজীব্যে পরিণত হয়েছে।

এই পর্ব থেকেই যাকে আমি মানিক সাহিত্যের তৃতীয় স্তর বলেছি তার সূচনা। যে-সময়ের কথা বলছি সেটা চল্লিশের দশকের কম-বেশী মাঝামাঝি কাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘূর্ণাবর্তের কবলে পড়ে বাঙালী সমাজে ইতোমধ্যে প্রচণ্ড ওলট-পালট ঘটে গিয়েছে। গ্রামের চাষীজীবন ছিন্নবিচ্ছিন্ন, মৃত্তিকা থেকে উৎপাটিতপ্রায়। শহরের শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ চরম অবস্থায় গিয়ে পৌঁচেছে, তারা বিক্ষোভে বিদ্রোহে ফেটে পড়তে চাইছে। যুদ্ধের বিপর্যয়কর অভিজ্ঞতার আঘাতে সংঘাতে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের লালিত মূল্যবোধ সমূহের অনেক কয়টিরই ভরাডুবি ঘটেছে, প্রাণান্তকর অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম চালাতে গেলে তাদের সনাতন নীতিবোধ একপ্রকার ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। টিকে থাকাই যেখানে সমস্যা, সেখানে ভদ্রলোক শ্রেণীর 'ভদ্রলোকী' চালচলন প্রকৃত অবস্থা ঢাকবার পোশাকী আবরণ মাত্র হয়ে উঠেছে, তার বেশী কিছু নয়—তাদের জীবনযাত্রা ফাঁকি ও মেকীতে ভরে উঠেছে।

বলা বাহুল্য, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তর্ভেদী শিল্পদৃষ্টিতে বাংলার এই হতদশা গোপন থাকেনি—তাঁর গভীরপর্যবেক্ষক চোখ বাইরের খোলস ভিঙিয়ে সমাজের তল পর্যন্ত গিয়ে পৌঁচেছিল। তাই দেখতে পাওয়া যায় এই পর্যায়ে

আর তিনি আত্মলীনতায় আবদ্ধ নন, ব্যক্তির অবচেতন মনের অন্ধকার গলি-ঘুঁজিতে ঘুরে ব্যক্তির আচরণের ব্যাখ্যা সন্ধান করার 'দর্শিত' কৌতূহল আর তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারছে না, তিনি বাইরের রৌদ্রালোকে বেরিয়ে এসে সমষ্টি জীবনের মধ্যে তাঁর শিল্পের উপকরণ—চিত্র ও চরিত্র -খোঁজবার কাজে ব্যাপৃত হয়েছেন। অন্তর্মুখী মন বহির্মুখী হয়ে উঠেছে। বহির্মুখীনতাকে সচরাচর আমরা একটু তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখতেই অভ্যস্ত, অন্তর্মুখীনতাকে আমরা সেই তুলনায় অনেক বেশী মূল্য দিয়ে থাকি। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে সমষ্টি-জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বহির্মুখীনতা মন্দ অভ্যাস নয় বরং কাঙ্ক্ষনীয় একটি গুণ। তা অতিরিক্ত চিন্তারোগের প্রতিষেধক এবং কার্যশক্তির উজ্জীবক। অন্তর্মুখী অভ্যাস অনিয়ন্ত্রিত হলে, অর্থাৎ চিন্তাচর্চাকে মাত্রাহীনভাবে লাগাম ছেড়ে দিলে, তার দুরারোগ্য আত্মকেন্দ্রিকতার আঘাটায় গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়া অসম্ভব নয়। লাগামহীন আত্মকেন্দ্রিকতা একটা অভিশাপ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেতনায় যে এই সত্য প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল তা তাঁর এই অধ্যায়ের গল্প উপন্যাস গুলির প্রকৃতি বিচার করলেই বুঝতে পারা যায়। পাঠক আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন, ব্যক্তি মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিকলন আর তাঁকে আকর্ষণ করতে পারছে না; সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের সমস্যাগুলি তাঁর চোখে ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে। সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদীদের অবদমন-অত্যাচার-শোষণের পিঠে সাধারণ মানুষের অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম এবং সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের চিত্র তাঁর লেখায় উত্তরোত্তর বেশী মাত্রায় জায়গা জুড়তে শুরু করেছে। মালিকের অনিচ্ছুক হস্ত থেকে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার লাভের লড়াই একদিকে, অন্যদিকে জমিদার-জোতদার-মহাজনদের জোটবদ্ধ নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে গ্রামের কৃষকশ্রেণীর নরনারীর রুখে দাঁড়ানোর ঘটনাবৃত্তে মিলে মানিক-সাহিত্য বলতে গেলে এখন থেকে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ঘটনার সারিবদ্ধ মিছিল চোখে পড়তে লাগলো। সেই সঙ্গে চললো শহরে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের 'ভদ্রলোকামি'র মুখোসটি খুলে ধরার ক্ষমাহীন প্রক্রিয়া। এই পচনশীল ঘুণে-ধরা নড়বড়ে' সমাজ ব্যবস্থাটাকে জিকুর্ম করে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টায় যে কারও কোন লাভ নেই, তাকে ভেঙে ফেলাই সকলের পক্ষে মঙ্গল—এই বিপ্লবী বাণীই হয়ে উঠলো তাঁর নূতন পর্যায়ের রচনাগুলির মূল অন্বিষ্ট।

ইতোমধ্যে তাঁর মানসিকতায় আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজবাদে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এই প্রত্যয়ে অবিচল থাকেন। বৈজ্ঞানিক সমাজবাদী আদর্শের

প্রতি তাঁর নিষ্ঠার গভীরতা এই থেকেই বুঝতে পারা যাবে যে, তিনি ওই বিশ্বাসের পতাকাতলে শুধুমাত্র লেখকরূপেই আপনাকে উপস্থিত করেননি, একজন দায়িত্ববান কর্মীরূপেও আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। মানিকের ব্যক্তিত্বে শিল্পী ও কর্মী একাধারে মিশে মিশে গিয়েছিল। চিন্তাচেতনার দিক দিয়ে বলতে গেলে বলা যায় সিগমুণ্ড ফ্রয়েড থেকে কার্ল মার্কস-এ উত্তরণ মানিক সাহিত্যে এক লক্ষণীয় দিক্‌পরিবর্তনরূপী ঘটনা।

'শহরতলী' থেকেই এই দিক পরিবর্তনের আভাস পাওয়া গিয়েছিল। একে একে আরও পরিচয় মিলল 'দর্পণ', 'চতুষ্কোণ', 'হরফ,' 'সোনার চেয়ে দামী,' 'জীয়ন্ত', 'স্বাধীনতার স্বাদ', 'সার্বজনীন', 'আরোগ্য', 'হলুদ নদী সবুজবন', 'প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান' প্রভৃতি উপন্যাস এবং 'হারানের নাতজামাই ' 'পেটব্যথা', 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী', 'ফেরিওয়ালা' প্রভৃতি গল্পের মধ্যে। তৃতীয় পর্বের মানিক এক গোত্রান্তরিত শিল্পী। প্রথম পর্বের অবস্থান-ভূমি আর তাঁর এই তৃতীয় পর্বের অবস্থান-ভূমির মধ্যে যোজনব্যাপী ব্যবধান বললেও চলে। ব্যবধান শুধু শিল্পের প্রকৃতিতেই নয়, বিশ্বাসের প্রকৃতিতেও। প্রকৃত প্রস্তাবে, বিশ্বাসের রূপান্তরের জন্যই তাঁর শিল্পেরও রূপান্তর সাধিত হয়েছিল—মৌলিক রূপান্তর। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বুঝতে হলে তাঁর এই মানসিক জীবনের বিবর্তনের ইতিহাসটি আমাদের ভাল করে অনুধাবন করা দরকার। তার মধ্যেই তাঁর শিল্পী ব্যক্তিত্বের গভীরে অনুপ্রবেশের চাবিকাঠিটি নিহিত আছে।

বাংলা সাহিত্যে শ্রেণী-দ্বন্দ্ব

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিবর্তনের তিনটি সুস্পষ্ট স্তর লক্ষ্য করা যায়। প্রথম যুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রধানত ধর্মীয়-চেতনার দ্বারা আচ্ছন্ন, এই যুগ চর্যাপদের কাল থেকে শুরু করে একেবারে কবিওয়ালাদের কাল পর্যন্ত অবিচ্ছেদে চলে এসেছে। অর্থাৎ চর্যাপদ, বৈষ্ণবকাব্য, শাক্ত পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ গান, পাঁচালি, কবিগান—সব এই ধারার অন্তর্ভুক্ত। কালের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে প্রায় আটশো বছরের পুরনো এই ইতিহাস. এই পর্বের সাহিত্যের মূল সুরটি লক্ষণীয়ভাবেই ধর্মীয়তায় কবলিত।

এতে আশ্চর্য হওয়ারও কিছু নেই। সব দেশের মধ্যযুগের সাহিত্যেরই এই লক্ষণ। এটি একটি প্যাটার্ন-সম্মত বৈশিষ্ট্য, যা সব দেশের মধ্যযুগের সাহিত্যের ক্ষেত্রেই কমবেশী সমভাবে প্রযোজ্য। ভারতীয় তথা বাংলা সাহিত্যের বেলায়ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়ার কোন কারণ নেই। অর্থনীতি ও সমাজ-বিজ্ঞানের পরিভাষায় মধ্যযুগ হলো সামন্তবাদের যুগ। সামন্তবাদ বা ফিউডালিজম্-এর সঙ্গে ধর্মের অতি নিকট সম্পর্ক। এই সম্পর্কেরই প্রকাশ ঘটেছে গোটা মধ্যযুগের সূচনাকাল থেকে অন্তিমকাল পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল বাংলা সাহিত্যের, কাব্য-সাহিত্যের, অবয়বের ভিতর। ধর্মই এই সাহিত্যের প্রাণ। বৈষ্ণব ও শাক্ত সাহিত্যের তো কথাই নেই, এমন কি যে-মঙ্গলকাব্যগুলি বৈষ্ণব ও শাক্ত কাব্যাদি অপেক্ষা লোকজীবনের অনেক বেশী কাছাকাছি ও লোকসংস্কৃতির রসে ভরপুর, সেখানেও দেব-দেবীর মাহাত্ম্য প্রকটনটাই রচনার মূল অভিপ্রায়। অর্থাৎ এখানেও ধর্মেরই লীলার প্রাধান্য। কোন কোন মঙ্গলকাব্যে, বিশেষ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে, দরিদ্র মানুষের দুঃখের মর্মান্তিক চিত্র আছে, কিন্তু সে দুঃখ শ্রেণী-দ্বন্দ্বের মনোভাবের সঙ্গে সামান্যই সম্পর্কিত, সে দুঃখে প্রকাশ পেয়েছে দুঃখীর আর্তি আর সেই আর্তি অপনোদনের জন্য দেব বা দেবীর কাছে প্রার্থনার কাতরতা। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে ঈশ্বর পাটনী যখন বলে "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে" তখন তার ইচ্ছার মধ্যে মানুষের জীবনযাত্রার মূল যে ভিত্তি—খাওয়া পরার সংস্থান সম্বন্ধে নিশ্চিন্তিবোধ—তার প্রতি আগ্রহের প্রমাণ পাওয়া যায় বটে কিন্তু সকল গরিব সন্তানেরা জন্যই যে এই

প্রয়োজন সমভাবে জরুরী তার কোন ইঙ্গিত মেলে না। এটি একটি বিশেষ মায়ের তার সন্তানের জন্য বিশেষ ইচ্ছার প্রকাশ।

যাই হোক, গোটা মধ্যযুগের বাংলা কাব্য-সাহিত্যে শ্রেণী দ্বন্দ্বের চিত্রের বলতে গেলে বিশেষ কিছু উপাদান-উপকরণ পাওয়া যাবে না। ধর্মভাবের প্রাধান্য সব শ্রেণী দ্বন্দ্বকে আড়াল করে রেখেছে। ধর্মের একটা কাজই হলো সর্বপ্রকার শ্রেণী চেতনাকে আফিঙ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা। শ্রেণী-চেতনা যাতে জাগ্রত না হয় তারই জন্য প্রাচীন কালের শাস্ত্র ব্যবসায়ীরা ধর্মের উদ্ভাবন করেছিল কিনা তাই বা কে বলতে পারে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্বে দেখতে পাই সামন্তযুগের অবসান হয়ে ধীরে ধীরে বুর্জোয়া আর্থনীতিক ব্যবস্থার বিকাশ ঘটতে শুরু করেছে। ইংরেজ এই বুর্জোয়া অর্থনীতিকে আমাদের দেশে নিয়ে এলো। ইংরেজ অভ্যাগমের সঙ্গে সঙ্গেই সামন্তবাদের বিলয় ঘটলো না বটে কিন্তু ইংরেজ প্রবর্তিত নয়া উৎপাদন-ব্যবস্থার রীতি প্রকরণের সঙ্গে সংঘাতের ফলে সামন্ততন্ত্র যে মস্ত বড় একটা ধাক্কা খেলো সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর যেহেতু সামন্তবাদ বা সামন্ততন্ত্রের প্রভাব ক্ষীয়মাণ হলো সেই কারণে সমাজ-মানসে ধর্মের পূর্বতন অসীম প্রভাবও আর রইলো না। ইংরেজের কালে যে নতুন সাহিত্য বাংলা দেশে গড়ে উঠলো তার মূল সুরটি ধর্মের নয়; বুর্জোয়া জীবনদর্শনসুলভ ঐহিকতার, জীবন-প্রীতির, জাতীয়তার, দেশপ্রেমের। ধর্মের রেশ পুরাপুরি বিলুপ্ত হলো না, হওয়া সম্ভব ছিল না, তাই দেখা দিল ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রাবল্য। গোটা উনিশ শতক জুড়ে বাংলায় ধর্মসংস্কার চেষ্টার জোয়ার বয়ে গেছে বললেও চলে। ঈশ্বর গুপ্তের কাল থেকে শুরু করে প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কাল পর্যন্ত যুগটিকে শ্রেণী-দ্বন্দ্বের মানদণ্ডের বিচারে বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগ রূপে অভিহিত করা যেতে পারে। এই যুগের সাহিত্যে শ্রেণী-দ্বন্দ্বের লক্ষণ কতটা কী-পরিমাণে প্রকাশ পেয়েছে তার একটা খতিয়ান করা যেতে পারে।

সামন্তবাদের ক্রমবিলীয়মানতা আর বুর্জোয়া ভাবাদর্শের উত্তরোত্তর প্রভাববৃদ্ধির মানেই হলো সাহিত্যে গ্রামীণতার ক্রমাবসান ও তার জায়গায় নাগরিকতার প্রতিষ্ঠা। বুর্জোয়া মূল্যবোধের জগতে নাগরিকতারই জয়জয়কার, গ্রামের ভূমিকা খুবই গৌণ। গ্রামের ভূমিকা গৌণ এ কারণে যে, বুর্জোয়া

ভাবদর্শনের প্রতিনিধিরা শহরেই কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকতে ভালবাসেন, গ্রামের সঙ্গে তাঁদের নাড়ীর যোগ কম, সহানুভূতিগত সম্পর্ক দুর্বল। গ্রামকে তাঁরা ব্যবহার করেন মূলতঃ শোষণের ক্ষেত্ররূপে এবং তাঁদের নাগরিক জীবন-যাপনে সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্যবিধানকল্পে প্রয়োজনীয় রসদ আহরণের উপায় রূপে। আর যেহেতু বুর্জোয়া ভাবদর্শনের ধারক এবং বাহকদের মূলতঃ শহরে অধিষ্ঠান, সেই কারণে তাঁরা একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রতীকরূপে নগর-জীবনে তাঁদের ভূমিকা পালন করেন। এই শ্রেণীটির নাম হলো মধ্যবিত্ত শ্রেণী। যদিও এই শ্রেণীটির নাম সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, তাহলেও এর একাধিক থাক আছে -উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত এই রকম কয়েকটি থাকে এই শ্রেণী বিভক্ত। সাধারণ নাম মধ্যবিত্ত।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে যে "নবজাগরণ" ঘটেছিল বলে বলা হয়, যা আসলে একটি খণ্ডিত 'রেনেসাঁস' এবং যা দু-একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তের উল্লেখ বাদ দিলে একান্তরূপে নগরনিবদ্ধ, কলিকাতাকেন্দ্রিক, তার স্রষ্টা এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী। বুর্জোয়া মূল্যবোধ এঁদের জীবনদর্শনের নিয়ামক। গোটা উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথম দেড়-দুই দশক কাল জুড়ে এঁরা বাংলা ভাষায় যে-সাহিত্যের সৃষ্টি করে গেছেন তা মধ্যবিত্ত মানসিকতার সাহিত্য। এই সাহিত্যে ধর্মের প্রভাব কম, ইহমুখিনতা বেশী, ইহমুখিনতার মধ্যেও আবার জাতীয় ভাগ্যোন্নয়নের উদ্দীপনা বেশী কাজ করেছে, অর্থাৎ জাতীয়তার ভাব প্রবলতা পেয়েছে।

এই কম বেশী একশো বছর কালব্যাপী সাহিত্যকে কি শ্রেণী দ্বন্দ্বের সাহিত্য বলা যায়? বোধহয় বলা যায় না। কারণ ঝোঁকটা পুরাপুরি মাত্রায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভিমুখে প্রসারিত, অন্য কোন শ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার চিত্র সেখানে অনুপস্থিত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে কৃষক শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বার্থসংঘাতের চিত্র পেলে তবে সেটাকে শ্রেণী-দ্বন্দ্বের সাহিত্য আখ্যা দেওয়া যেতে পারতো। কিন্তু সে-জাতীয় নজীরের খুবই অসদ্ভাব। এরকম হওয়ার কারণ কৃষক শ্রেণী তখনও সংগঠিত হয়নি, আর শ্রমিক শ্রেণীর মোটে স্ফুরণই হয়নি। একেবারে উপরের দিকে কিছু গ্রামে-অনুপস্থিত শহরবাসী অভিজাতবর্গের প্রতিপত্তিশালী জমিদার ব্যতিরেকে সমাজ-জীবনের চালকের ভূমিকায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তিরা ছাড়া আর কারও কোন প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। মধ্যবিত্তদের সৃষ্ট সাহিত্যে মধ্যবিত্ত মানসিকতারই পক্ষপাতদুষ্ট প্রতিফলন

ঘটবে সে-কথা সহজেই বোঝা যায়। বস্তুত, এই পর্বের সাহিত্যে মধ্যবিত্তেরই রমরমা, কৃষকের অস্পষ্ট পদপাত মাত্র কোথাও কোথাও শোনা যায়। শ্রমিকের পদধ্বনি কান পাতলেও শোনবার উপায় নেই কারণ শ্রমিক শ্রেণীর তখনও আবির্ভাব ঘটেনি।

বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রসারের সঙ্গে গদ্যসাহিত্যের যোগ অতি নিগূঢ়। তাই দেখা যায় এই পর্বে কাব্যসাহিত্যের পাশে পাশে গদ্যসাহিত্যেরও ক্রমিক শ্রীবৃদ্ধি এবং যুক্তিপ্রধান গদ্যের সবিশেষ চর্চা। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়-কুমার, ভূদেব, রাজেন্দ্রলাল প্রমুখের পদাঙ্কানুসরণ করে বঙ্কিমচন্দ্রে 'ন্যাশনাল প্রোজ'-এর সর্বাধিক উৎকর্ষ পরিলক্ষিত। যুক্তিনিষ্ঠার খাতিরে এবং যুক্তির ক্রম অনুসরণ করে বঙ্কিমচন্দ্রের মননের বৃত্তের ভিতর 'নয়া হিন্দুত্বের' প্রতীক নাগরিক মধ্যবিত্ত ছাড়াও বৃহত্তর গ্রামজীবনের সমস্যা প্রতিফলিত হওয়া প্রত্যাশিত ছিল কিন্তু উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টির প্রয়োজনে ছাড়া গ্রামের মানুষকে তিনি একেবারেই কোন গুরুত্ব দেননি। প্রবন্ধ-সাহিত্যের আধারে চাষী পরাণ মণ্ডলের দুঃখে তিনি সহানুভূতি দেখিয়েছেন, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত লিখেছেন, কমলাকান্তের জবানীতে প্রসন্ন গোয়ালিনীর জীবনচিত্র এঁকেছেন, 'সাম্য' গ্রন্থে ধনী ও দরিদ্রের আর্থিক বৈষম্য ঘোচাবার কথা বলেছেন ; কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে তাঁর অন্তরের মূল পক্ষপাত সর্বদা বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতীক নয়া নাগরিক শিক্ষিত ধনিক সম্প্রদায়ের প্রতিই থেকেছে। জমিদার ও কৃষকের স্বার্থদ্বন্দ্বে তিনি জমিদারের পক্ষাবলম্বী। কৃষকের বিদ্রোহকে, এমনকি সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনকে তিনি সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন, তাই 'নীলদর্পণ', 'জমিদার দর্পণ' প্রভৃতি নাটকের প্রতি তিনি বীতরাগ। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব তিনি পছন্দ করেন না, কারণ তার ফলে নাগরিক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যে-প্রতিষ্ঠার আসনে সমাসীন এবং যে বিশেষ সুবিধা-সুযোগের অধিকারী, সেগুলি বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা। তাঁর পরিকল্পনা মতে আবার নাগরিক মধ্যবিত্তেরও শ্রেণীভেদ আছে। নতুন ইংরেজী-শিক্ষিত শহরের মুসলমান ভদ্রলোকদের তিনি তাঁর প্রশ্রয়পুষ্ট মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করতে নারাজ। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বলতে তিনি মূলত হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কেই বুঝিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার আরও একটা বৈসাদৃশ্য এই যে, তিনি বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রথম সার্থক উদ্গাতা বলে কীর্তিত অথচ একই কালে তিনি ইংরেজ-শাসনেরও প্রশস্তিকারক। ইংরেজ-শাসনকে তিনি এদেশের পক্ষে

কল্যাণকর বলে বিবেচনা করেছেন। এবং সেই বিচারে সিপাহী বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছেন। জাতীয়তাবোধের প্রচার এবং ইংরেজ শাসনের গুণকীর্তন—এই দুই অবস্থানের ভিতর কেমন করে সামঞ্জস্য-বিধান সম্ভব, আমার অন্তত তা ধারণায় আসে না। জাতীয়তাবাদের হোতা, ঋত্বিক ও ঋষির এ কী ধরণের মনোভাব? বাঙালীর রেনেসাঁসের এই গোঁজামিলের জন্যই যে পরবর্তী সময়ে ওই রেনেসাঁসের সুফল স্থায়ী হয়নি তা কি বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে?

যাই হোক, শ্রেণী-দ্বন্দ্ব নিয়ে কথা হচ্ছিল, শ্রেণী-দ্বন্দ্বের কথা বলি। মাইকেল বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বগামী। তিনি জীবনযাত্রায়, ধরা-চূড়ায়, চিন্তায়-চেতনায় সাহেব, অন্তত বঙ্কিমের মত জাতীয়তাবাদের পোশাক পরে তিনি ঘোরেন না। বরং গ্রামজীবনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বঙ্কিমের অপেক্ষাও অনেক বেশী দূরবর্তী। অন্তত ক্রীশ্চিয়ান হবার পর দেশীয় জীবনধারার সঙ্গে তাঁর দৃশ্যত কোন যোগই ছিল না বলতে গেলে। অথচ দেখা যায় তিনি তাঁর 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে বাংলার গ্রামসমাজের জমিদার রায়তের যে-সম্পর্কের চিত্র এঁকেছেন, বঙ্কিমের এই ধারার গ্রামচিত্র তার ধারে-কাছেও পৌঁছায় না। মধুসূদন শুধু জমিদার-প্রজার সম্পর্কের চিত্রই ওই নাটকে উপস্থিত করেননি, তার ভিতর শ্রেণী-দ্বন্দ্বের ভাবটিকেও সার্থকভাবে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দিয়েছেন। জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান প্রজার ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের যে-ছবি তিনি উপস্থিত করেছেন ওই রচনায়, আজকের দিনেও তার উপযোগিতা হারায়নি বরং আজই তার সবিশেষ প্রয়োজন। এমন প্রাণবন্ত সাম্প্রদায়িক ঐক্যের আদর্শ এবং জমিদারী অত্যাচারের প্রতিরোধ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কোন্ বইতে তুলে ধরেছেন জানতে ইচ্ছা করে।

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' শ্রেণী-দ্বন্দ্বের বিচারে একটি 'মাস্টার পীস' রচনা। ও বই একাই একশো। নীলকর সাহেবদের অত্যাচার-নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে গ্রামবাংলায় চাষী সম্প্রদায়ের রুখে দাঁড়ানোর ঘটনা এই ঐতিহাসিক নাটকে চিত্রিত হয়েছে অসামান্য বাস্তবতার সঙ্গে। দুঃখ এই যে, এই ধারার বিষয়বস্তু সম্বলিত নাটক বা অন্যবিধ রচনা পরে আর সামান্যই লিখিত হয়েছে বাংলায়। 'জমিদার দর্পণ' নাটকের নাম ও ঘটনার ছাঁচ 'নীলদর্পণ'-এর অনুকারী বটে কিন্তু তার শিল্পের জোর কম। পূর্বেই বলেছি যে, উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের প্রবহমান ভাবধারা মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। একটি 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' কিংবা একটি 'নীলদর্পণ'

তাতে ব্যতিক্রমী সংযোজন মাত্র—আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতের চমক লাগানো সংযোজন। ব্যতিক্রম দিয়ে নিয়মের প্রমাণ হয়। নিয়মটা এই পর্বের মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়।

'নীলদর্পণ'-এর শ্রেণী-দ্বন্দ্ব পরেকার সময়ের রচনায় ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়নি কেন? প্রথম কারণ, নীলদর্পণ-এর নাট্যকারের মানসিকতা-যুক্ত লেখকের সংখ্যাল্পতা, দ্বিতীয় কারণ, সরকারের নিষেধবিধি। প্রথম কারণটির মূলে আছে লেখকদের মানসিক গঠনে মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের অতি-প্রাধান্য। তাঁরা বড়জোর দেশপ্রেমকে উপজীব্য করে কাব্য বা নাটক রচনা করতে পারেন, তার বেশী যেতে পারেন না। শ্রেণী-দ্বন্দ্বের চিত্রণ তাঁদের কাছে অকল্পনীয়। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের চেতনাই নেই তো শ্রেণী-দ্বন্দ্বের ধারণা আসবে কোত্থেকে? তাঁদের কাছে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আশা-নিরাশা অভাব-অভিযোগ দাবি দাওয়াটাই একমাত্র সমাজ-সত্য: তার বাইরে কিছু নেই, কিছু থাকতে নেই। এই যেখানে সমাজ-স্থিতি, সেখানে লেখকেরা থাক-বিভক্ত শ্রেণীগুলির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের চিত্র তাঁদের লেখায় তুলে ধরবেন এটা আশা করি বোধহয় একটু অধিক প্রত্যাশা।

জাতীয়তার আবেগটা তখন বাংলা সাহিত্যে নতুন এসেছে। অথচ বাংলার বিগত ইতিহাসে ওই আবেগের বহিঃপ্রকাশের সার্থক কোন নজীর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই জাতীয়তার উজ্জীবক ভাবপ্রকাশের উপযোগী উপকরণ-উপাদানের জন্য চারিদিকে এলোপাথাড়ি খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে গিয়েছে। কখনও মধ্যযুগের রাজপুত ইতিহাসের কাহিনী থেকে, কখনও বাংলার 'বারো ভূঁইয়া'র মুঘল আধিপত্য অস্বীকার করে স্বাধীন হবার ঘটনাবৃত্ত থেকে, কখনও 'সন্তান-বিদ্রোহের' এযাবৎ-অজ্ঞাত ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত থেকে বিষয়বস্তু আহরণ করে দেশপ্রেমের ভাবাবেগ সৃষ্টির উদ্যমের আর কোন লেখাজোখা নেই। লেখকের সবাই এই বিশেষ একটি বিষয়ের উপর যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন এবং তৎপক্ষে উপযুক্ত কাহিনীর সন্ধানে ইতিহাস খোঁড়বার কাজে যেন আদাজল খেয়ে লেগেছেন।

কিন্তু দেশপ্রেমই তো চিত্রায়ণের একমাত্র বিষয় নয়। সমাজে শ্রেণী-দ্বন্দ্ব বলেও তো একটা বস্তু আছে। তা যদি তৎকালীন লেখকদের মনোযোগের বৃত্ত-সীমার মধ্যে ধরা থাকতো তো বিষয় হাতড়াবার জন্য তাঁদের দূরে দূরে যেতে হতো না, তাঁদের স্বদেশের নিকট-ইতিহাসের মধ্যেই তাঁরা তাঁদের ওই জাতীয় রচনার উপযুক্ত মাল-মশলা খুঁজে পেতেন। যেমন ১৭৭৯ সালের চোয়াড়

বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহের আগে পরের একাধিক সাঁওতাল বিদ্রোহ, ষাটের দশকের নীলচাষীদের আন্দোলন (যাকে কেন্দ্র করে দীনবন্ধু তাঁর অবিস্মরণীয় নাটকটি লিখেছেন; হায়, এ-জাতীয় নাটক মাত্র একটিই লেখা হয়েছে!); সত্তরের দশকে উত্তরবঙ্গের পাবনা জিলায় ও অন্যত্র কৃষক-বিদ্রোহ, যে বিদ্রোহ মীর মশারফ হোসেনকে তাঁর জমিদার দর্পণ নাটকটি লিখতে প্রেরণা জুগিয়েছে; আশির দশকে আসামের চা বাগিচাগুলিতে শ্রমিকদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচারের ঘটনাবলী, যা সরেজমিনে তদন্তের জন্য ব্রাহ্ম-নেতা দ্বারিকনাথ গাঙ্গুলী ও রামকুমার কবিরত্ন সরকারী বাধানিষেধ অগ্রাহ্য করে আসামে ছুটে গিয়েছিলেন; উড়িষ্যার পাইক বিদ্রোহ; ইত্যাদি। কিন্তু কোথায় এসব ঘটনার যথাযথ মাত্রায় চিত্রণ বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠায়? দুই-একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম-দৃষ্টান্ত বাদ দিলে এ সব ঘটনার আদৌ কোন রূপায়ণ হয়েছিল কি সমসাময়িক বাংলা কাব্যে বা নাটকে বা উপন্যাসে? আজ ১৭৯৯ সালের চোয়াড় বিদ্রোহ নিয়ে নাটক লেখা হচ্ছে, সাফল্যের সঙ্গে তা অভিনীতও হচ্ছে, কিন্তু উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কি তার পরে ওই ঘটনাকে উপজীব্য করে নাটক প্রণয়নের পথে কি বাধা ছিল? সরকারী নিষেধাজ্ঞার ভয় কি? নাকি, খোদ্ লেখকদের মধ্যেই ছিল প্রয়োজনীয় চেতনার অভাব? শেষোক্ত অনুমানটাই অধিক সত্য বলে মনে হয়, কেননা সরকারী বাধানিষেধমূলক 'ড্রামাটিক পারফরমেন্স অ্যাক্ট' তো বিধিবদ্ধ হয়েছিল ১৮৭৬ সালে, তার আগে লিখতে কি হয়েছিল?

আসলে আমাদের উনিশ-শতকীয় লেখকেরাই ছিলেন, পুনরপি ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে বলছি, শ্রেণী-দ্বন্দ্ব-অচেতন। এই অচেতনতা অজ্ঞতা-প্রসূতও হতে পারে, আবার শ্রেণী-স্বার্থভাবনা-প্রসূতও হতে পারে। শ্রেণী-স্বার্থভাবনা থেকে অজ্ঞতার জন্ম হওয়া কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়, মনস্তত্ত্বের লীলায় এই জাতীয় প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব স্বীকৃত। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অন্যান্য কবি ও নাট্যকারগণ এত-এত বিষয় নিয়ে কাব্য বা নাটক লিখলেন—কখনও তাঁদের রচনার বিষয় লেখকভেদে পৌরাণিক ভক্তি, ঐতিহাসিক জাতীয়তা, সামাজিক সংস্কার, রূপকাশ্রিত কাব্য-কল্পনা বা নৃত্য গীতমূলক খণ্ডনাট্য—কিন্তু একটি বারের জন্যও তাঁরা শ্রেণী-দ্বন্দ্ব মূলক বিষয়াবলম্বী সাহিত্যসৃষ্টির ধার ঘেঁষেও গেলেন না, এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বলা'ই বাহুল্য, অজ্ঞতা কোনমতেই এই অস্পৃশ্যতার কারণ হতে পারে না, আসল কারণ তাঁদের শ্রেণী-স্বার্থের মধ্যে নিহিত। মজ্জাগত বুর্জোয়া স্বার্থ-

বোধহই তাঁদের এ জাতীয় চিত্রণ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, এরূপ ভাবাই যুক্তিযুক্ত।

প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য সংসারের কম বেশী এই পরিস্থিতি, যার কথা উপরে এসেছি। অর্থাৎ বুর্জোয়া ভাবাদর্শেরই সেখানে প্রায় সর্বময় কর্তৃত্ব, তার বেড়া ডিঙিয়ে দুই-একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ কখনও কখনও ছিটকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে, এই যা। কিন্তু যুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে সে-কথা বলা চলে না। তখন কারও কারও লেখায় শ্রেণী-দ্বন্দ্বের চেতনা স্পষ্টভাবেই উঁকিঝুঁকি দিতে আরম্ভ করেছে। হয়ত তখনও সেটা একটা বিধিবদ্ধ আন্দোলনের রূপ পায়নি, কিন্তু ভাবনাটা এসে গিয়েছে। এখানে-সেখানে, ইতস্তত-বিক্ষিপ্তভাবে, সেই ভাবনা-চিন্তার প্রতিফলন ঘটছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের যুদ্ধোত্তর যুগে রচিত গল্প-উপন্যাসগুলির মধ্য থেকে কতিপয় বিশিষ্ট দৃষ্টান্তের নাম করা যায়। যথা, 'মহেশ' ও 'অভাগীর স্বর্গ' গল্প, 'পথের দাবী' উপন্যাস, অসমাপ্ত 'জাগরণ' উপন্যাস, প্রভৃতি। এর প্রত্যেকটিই শ্রেণী-দ্বন্দ্বের চেতনায় ভাস্বর। এসব রচনা এত সুপরিচিত যে এগুলির কাহিনীর বিশদ পরিচয় দেওয়ার আবশ্যকতা দেখি না। তবে পথের দাবী উপন্যাস সম্পর্কে একটি কথা বলা প্রয়োজন। পথের দাবী-ই বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস, যাতে শ্রমিক-জাগরণের চিত্র আঁকা হয়েছে। শ্রমিকরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে তাদের বেঁচে থাকার ন্যায্য অধিকার দাবী করলে সে দাবী ঠেকিয়ে রাখা যায় না, একতার শক্তিতে মালিকের অনিচ্ছুক হাত থেকে অধিকার আদায় করা যায়– শ্রমিকের এই আত্মপ্রত্যয়ের বাণী বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন সুর, যাকে আবাহন করে এনেছিলেন শরৎচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের আধারে। তার পরে শ্রমিক-সংহতির ও শ্রমিক-প্রতিরোধের বহু কাহিনী বাংলা গল্প-উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু পথিকৃতের গৌরব একান্তভাবে শরৎচন্দ্রেরই প্রাপ্য। রেঙ্গুনের বস্তি এলাকার শ্রমিক-অধ্যুষিত 'ব্যারাক'গুলির বর্ণনা, শ্রমিকদের আত্ম-ক্ষয়কর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মর্মস্পর্শী চিত্র, ফয়ার-মাঠের সভায় শ্রমিকদের দাবী-দাওয়ার সপক্ষে রামদাস তলোয়ারকরের তেজোদীপ্ত ভাষণ, এসব কোনমতেই ভোলবার নয়। শরৎচন্দ্র তাঁর মধ্যবিত্ত মানসিকতার পেছুটান সত্ত্বেও যে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজে এগিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁর সাহিত্য-মাধ্যমকে সে-কাজে ব্যবহার করেছিলেন এতে তাঁর অত্যাশ্চর্য যুগ-সচেতনতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম শ্রেণী-দ্বন্দ্বের রূপায়ণে আজও বাংলার কাব্যাকাশে একটি উজ্জ্বল ধ্রুবনক্ষত্রের মত শোভা পাচ্ছেন। তাঁর এই ধারা পরে নবীন-প্রবীণ আরও অনেক কবি অনুসরণ করেছেন—সুকান্ত তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ—; তবে নজরুলের গৌরব এইখানে যে, তাঁর আগে বাংলা ভাষায় এই সুরের ও ভাবের কবিতার কোন অস্তিত্ব ছিল না, তিনিই সাহসভরে প্রথম বাংলা কাব্যের বিষয়বস্তুতে শ্রেণী-দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন সচেতনভাবে। গৌরবটা শুধু পথিকৃতেরই নয়, নির্ভীকতারও। কেননা বাংলার কাব্যসংসারে একদিকে ছিল অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যের ধ্যান, অন্তহীন প্রকৃতিপ্রেমের বিস্তার, ঐশীশক্তির মহিমাগতি; অন্যদিকে ছিল মধ্যবিত্ত সমাজের প্রথাবদ্ধ মূল্যবোধপালিত নরনারীসমূহের নিতান্ত তুচ্ছাতিতুচ্ছ পারিবারিক সুখ-দুঃখের চিত্রণ। এ ছাড়া যে কাব্যের আর কোন বিষয় থাকতে পারে তা আমাদের কবিদের ধারণায় ছিল না। এই ধারণাকে প্রথম সজ্ঞানে আঘাত করেছেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁর দুঃখবাদী কবিতার দ্বারা, তার পরেই নজরুল। যতীন্দ্রনাথ বিদ্রোহী কবি হলেও শ্রেণী-দ্বন্দ্বের চেতনা-সমৃদ্ধ কবি ছিলেন না—তাঁর বিদ্রোহটা ছিল রবীন্দ্রনাথের আনন্দবাদের বিরুদ্ধে একটা আবেগী প্রতিবাদ মাত্র, তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু নজরুল সচেতনভাবেই শ্রেণী-দ্বন্দ্বের কবি। 'মাটির কাছাকাছি স্তর থেকে সমুদ্ভূত এই কবি যত শোষিত-নিপীড়িত অত্যাচারিত মানুষের দুঃখ-বেদনার গান গেয়েছেন এবং যারা এই সর্বহারা মানুষের দুর্গতির জন্য দায়ী তাদের উদ্দেশে ক্ষমাহীন অভিসম্পাত হেনেছেন রোষে ক্ষোভে ও ঘৃণায়। তাঁর এক চোখে বেদনাশ্রু, অন্য চোখে বজ্রাগ্নিজ্বালা। এক হাতে ভালবাসার ভৃঙ্গার, অন্য হাতে ভৎর্সনার চাবুক।

এই দ্বৈত ভাবেরই এককালীন প্রকাশ দেখতে পাই তাঁর 'সাম্য', 'ফরিয়াদ', 'আমার কৈফিয়ৎ' প্রভৃতি অবিস্মরণীয় কবিতাগুলির মধ্যে। নজরুল নানা দিক দিয়েই বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি উজ্জীবক নাম—এখানে শুধু তাঁর শ্রেণী-চেতনার প্রসঙ্গটি নিয়েই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা হলো মাত্র।

শ্রেণী-দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে কাব্য-কবিতা গল্পোপন্যাস রচনা করার প্রয়াস একটা বিধিবদ্ধ আন্দোলনের আকারে উপস্থিত করার কৃতিত্ব 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর লেখকদের। হয়ত কল্লোলের লেখকদের মধ্যে অনুভবের আন্তরিকতা অপেক্ষা যুগের ফ্যাসান দ্বারা চালিত হওয়ার মনোভাব সমধিক কাজ করেছিল, হয়ত তাঁদের সর্বহারা-প্রীতির প্রদর্শনীর দ্বারা তাঁরা তাঁদের মজ্জাগত মধ্যবিত্ত মানসিকতা সাময়িকভাবে আড়াল করে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন, যে-লক্ষণ কিনা পরে তাঁদের

অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচরণ করেই তাঁদের লেখায় ফুঁড়ে বেরিয়েছিল; কিন্তু এ কথা তো কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না, করলে ইতিহাসের অপলাপ করার দায়ে পড়তে হবে যে, তাঁরাই এই ভাবের রচনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটা আন্দোলনের জোয়ার এনেছিলেন। জগদীশ গুপ্তের বস্তি-ব্যারাকের ক্ষয়কর সব পরিবেশের গল্প, শৈলজানন্দের কয়লাকুঠির কাহিনী, প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক' উপন্যাস ও হুইটম্যানীয় ছন্দে গ্রথিত 'আমি কবি যত কামারের মজুরের ও ইতরের' কিংবা 'মহাসাগরের নামহীন কূলে হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই' প্রভৃতি কবিতাগুচ্ছ; অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে', মনীশ ঘটকের 'পটলডাঙার পাঁচালী' প্রভৃতি গল্পোপন্যাস; সুকুমার দে সরকারের বোহেমীয় রসের কবিতা: শিবরাম চক্রবর্তীর 'লোয়ার ডেপথ্‌স্‌'-এর রূপায়ণ মূলক নাটক, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের গর্কির 'মা' উপন্যাসের অনুবাদ—এ সব একটা জিনিসের প্রতিই সুনির্দিষ্টরূপে অঙ্গুলিক্ষেপ করছে। তা হলো, শ্রেণী-দ্বন্দ্ব বাংলা সাহিত্যে একটি অপ্রতিরোধ্য বিষয়রূপে তার স্থান করে নিয়েছে এবং তাকে হটানোর আর কোন উপায় নেই। বাংলা সাহিত্যের আকাশে-বাতাসে এই ভাব পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছে, সর্বত্রগসঞ্চারী একটি ধূয়ার মত তার অনুরণন কান পাতলেই শোনা যাবে।

কথাটা যে কথার কথা নয়, তা পরবর্তীকালের লেখক-পরম্পরা এবং তাঁদের রচনার বিষয় অনুধাবন করলেই বোঝা যায়। দু'জন লেখক এরই মধ্যে আবার সবার মাথা ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠেছেন—গদ্যসাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যসাহিত্যে সুকান্ত ভট্টাচার্য। উভয়েরই রচনা শ্রেণী-দ্বন্দ্বের চেতনায় ভরপুর। এই দুই সম্পর্কে এখানে বিস্তৃত আলোচনা করার অবকাশ নেই। শুধু তাঁদের রচনা-বৈশিষ্ট্য বোঝাবার জন্য এইটে বলা প্রয়োজন যে, মানিক বাংলা কথাসাহিত্যে নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠ বাস্তবতার রূপকার; সুকান্ত রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যের শ্রেষ্ঠ ফ্যাসিবাদ-বিরোধী কবি। গণ-চেতনার সংগ্রামী ঐতিহ্যে উভয়েরই রচনা অত্যন্ত বিশিষ্টরূপে সমৃদ্ধ। মানিক তাঁর গল্পে উপন্যাসে নিছক শ্রেণী-সংগ্রামের কথা বলেই ক্ষান্ত হননি, ওই সংগ্রামে কীভাবে জয়ী হওয়া যায় তারও উপায় বাতলে দিয়েছেন। প্রতিবাদ আর প্রতিরোধই হলো সেই উপায়। অর্থাৎ মানিক শুধু সমস্যা উত্থাপন করেই নিরস্ত হলেন না, তিনি সমস্যা সমাধানেরও ইঙ্গিত দিলেন। এইখানেই শরৎচন্দ্র ও অনুরূপ কথাকারদের থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যের ভিন্নতা। তিনি শিল্পী ও সংগ্রামী-ভাবুক দুই-ই। গণ-সংগ্রামের তিনি একজন সার্থক পথপ্রদর্শক।

সুকান্তের রচনাও সংগ্রামের আকুতিতে আদ্যন্ত পূর্ণ। বিদ্রোহ আর

প্রতিবাদ একটি স্থায়ী সুরের মত তাঁর সমস্ত কবিতার কেন্দ্রমধ্যে অনুস্যূত। যত কবিতা তিনি তাঁর স্বল্পকালীন জীবনে লিখেছেন, আগাগোড়া তার একটিই মাত্র বক্তব্য : প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, 'অন্নদাতার' দ্বারা অন্যায়ের প্রতিবিধানে যত্নবান হও, বিদ্রোহ ও বিপ্লবের সাঁড়াশি-পেষণে পিষ্ট ক'রে অত্যাচারের বিষদাঁত ভেঙে ফেল। বোধন, মৃত্যুঞ্জয়ী গান, দিনবদলের পালা, জনতার মুখে ফোটে বিদ্যুৎ-বাণী, লেনিন, বিবৃতি, ১লা মের কবিতা, ২১শে নভেম্বর, ১৯৪৬—সব কবিতার এই এক ধুয়া। এমনকি আপাত নিরীহ সিগারেট, দেশলাই কাঠি, সিঁড়ি প্রভৃতি কবিতারও এই এক প্রতিপাদ্য।

বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, শ্রেণী-দ্বন্দ্বের চেতনাই ছিল সুকান্তের কাব্য-কবিতার মূল নিয়ামক। সমাজের বস্তুগত পরিস্থিতি শিল্পীর ভাবজীবনকে নিয়ন্ত্রিত তো করেই, কখনও কখনও গঠিতও করে। সমকালীন পারিপার্শ্বিকের চেতনা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর প্রভাব কবিমনে প্রতিফলিত হয়ে কখনও কখনও তার মৌলিক রূপান্তর ঘটায়। সুকান্ত এই সত্যের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। সমাজের শ্রেণী-দ্বন্দ্বের অভিজ্ঞতাই সুকান্তের কবিকৃতির পৃষ্ঠপট।

বাংলা ভ্রমণ সাহিত্য

বাংলা ভাষার ভ্রমণ সাহিত্য ইদানীং খুবই পুষ্ট হয়ে উঠেছে। বলতে গেলে বলা যায়, কথা সাহিত্য অর্থাৎ গল্পোপন্যাস সাহিত্যের সঙ্গে প্রায় সমান তালে পাল্লা দিয়ে চলেছে সাম্প্রতিক বাংলা ভ্রমণ সাহিত্য। এক হিসাবে, উপন্যাসের চেয়েও বোধ হয় ভ্রমণ সাহিত্যের অগ্রগতি সন্তোষজনক। কারণ আজকাল উপন্যাসের নামে যা লেখা হচ্ছে, তার একটা মোটা ভাগই হল তথাকথিত ইতিহাস রসাশ্রিত উপন্যাস। কিন্তু অভিজ্ঞ পাঠকেরা জানেন এইগুলিতে ইতিহাসের আবরণে ভেজালের প্রভাবই বেশী। লোক-দেখানো ইতিহাসের সরু সুতোয় ঝুলিয়ে আধা কাল্পনিক আধা-ঐতিহাসিক হারেমনিবাসিনী বেগম ও 'বাঁদী'দের পুতুল-নাচানোই এইসব উপন্যাস লেখকদের প্রধান কাজ। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, হারেমের কেচ্ছাকাহিনীর আবহ সৃষ্টি করে পাঠক মনোরঞ্জন ও সেই সুবাদে ব্যবসায়িক লোভ চরিতার্থ করা। ছোটগল্পে অবশ্য এখনও এই-জাতীয় ভেজালের উৎপাত দেখা দেয়নি, কিন্তু যে রকম দিনকাল পড়েছে, তাতে ছোটগল্পও অচিরে ওই প্রবণতার দ্বারা আক্রান্ত হলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না।

সুখের বিষয়, ভ্রমণ সাহিত্যে এখন পর্যন্ত তেমন কোন দৌরাত্ম্যের উদ্ভব হয়নি। অবশ্য আধা-বাস্তব আধা-অবাস্তব কাহিনীর রস মিশিয়ে কিছুকাল হল ভ্রমণ পরিবেশনের একটা রেওয়াজ দাঁড়িয়েছে সন্দেহ নেই, তবে তার প্রভাব বা প্রসার তেমন ভয়ংকর নয়। পাঠক সেই জাতীয় ভ্রমণের গল্পই সমধিক পছন্দ করেন যা বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং হুবহু দেখা জিনিসের বর্ণনা। পাঠকদের মধ্যে যাঁরা প্রবন্ধ হোক, রম্যরচনা হোক, ভ্রমণ-কাহিনী হোক, সব-কিছুতে গল্পের রস খোঁজেন এবং গল্পের রস না পেলে হতাশ হন, তাঁরা যেমন ভ্রমণ 'উপন্যাসরসসিক্ত' দেখতে পেলে খুশী হন, তেমনি আবার অনেক পাঠক আছেন যাঁরা ভ্রমণের বাস্তব অভিজ্ঞতার উপকরণের ভিতর কল্পনার এই অনাহূত অনুপ্রবেশ ঠিক বরদাস্ত করতে পারেন না। মনে হয় শেষোক্ত গোত্রের পাঠকের সংখ্যাই এখন পর্যন্ত বেশী, আর তাইতেই সম্ভবতঃ বাংলা ভ্রমণ সাহিত্য এখন পর্যন্ত কল্পনার নিরঙ্কুশ অত্যাচার থেকে আপনাকে অল্পাধিক পরিমাণে রক্ষা করে আসতে পেরেছে। সমকালীন উপন্যাসের তুলনায় সমকালীন ভ্রমণকাহিনীতেই বোধহয় সুস্থতার মাত্রা অধিক বিদ্যমান।

ইংরেজ এদেশে আসার আগে যাতায়াত ব্যবস্থার দুরূহতার জন্য ভ্রমণের তেমন প্রচলন ছিলনা। যখন থেকে এদেশে রেলপথের সূচনা হল, তখন থেকেই বলতে গেলে ভ্রমণের রেওয়াজ শুরু হল। প্রাক বৃটিশ যুগের বাঙালী গৃহকোণ ছেড়ে বাইরে বড়ো একটা কোথাও বেরিয়েছে তার নজীর নেই। তখনকার দিনের বাঙালী স্বীয় নির্দিষ্ট বসবাসের সীমার মধ্যে অনড়-অচল আপনাতে-আপনি-তৃপ্ত জীবন যাপন করতেই বেশী ভালোবাসত। অবশ্য দূর দূর অঞ্চলে তীর্থযাত্রা মানসে বাঙালী তখনও ঘর ছেড়ে বেড়িয়েছে এবং তীর্থের পুণ্যলাভের আশায় অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করে অতি দুর্গম স্থানে যেতেও তার আটকায়নি, কিন্তু তৎকালীন বঙ্গদেশের সামগ্রিক অধিবাসী-সংখ্যার তুলনায় ওইরকম তীর্থযাত্রীর সংখ্যা খুব অল্পই ছিল বলা যায়। তীর্থের পুণ্যে লোভ ছিল প্রায় সকলেরই কিন্তু তার ধকল পোয়ানো বড়ো সহজ ব্যাপার ছিল না। ফলে সত্যি-সত্যি পায়ে হাঁটা তীর্থযাত্রী অপেক্ষা, 'মনসা মথুরা গমন' করে ভ্রমণ সুখ উপভোগেচ্ছু, স্বস্থানলগ্ন, স্থাণু তীর্থযাত্রীই যে সংখ্যায় বহু বহু গুণে বেশী ছিল, তা অনুমান করে নিতে কষ্ট হয়না।

পুরাতন লেখকদের সাক্ষ্য থেকে দেখা যায়, বাঙালীর মধ্যে উদ্ভিজ্জ স্বভাব প্রবল। 'উদ্ভিজ্জ স্বভাব' অর্থাৎ গাছের মত স্থাণুত্বের লক্ষণ-বিশিষ্ট স্বভাব। তার মানে এ নয় যে, বাঙালী স্থাণুধর্মী, জড়তার লক্ষণাক্রান্ত। মোটেই তা নয়। তার মানসিক সক্রিয়তা অতিশয় প্রবল, শুধু বহির্জীবনে চলাচলের প্রতিবন্ধকতার জন্য তাকে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, গৃহবদ্ধ হয়ে বাস করতে বাধ্য হতে হয়েছে। কেবল তা-ই নয়, তার ভিতর জীবন-চাঞ্চল্য সেই পরিমাণে বেশী, যে পরিমাণে তার বহির্গমনাগমনের সুযোগ সংকুচিত। চলাচলের সুযোগের আপেক্ষিক অভাবজনিত স্ফূর্তিহীনতা সে মননজীবিতার দ্বারা পুষিয়ে নিয়েছে। তাকে কূপমণ্ডুক কোনক্রমেই বলা চলে না। যাই হোক, এই নিয়ে আর অধিক বাক্যব্যয়ের আবশ্যকতা নেই, শুধু এই বলাই যথেষ্ট যে, রেল ব্যবস্থার প্রবর্তনের আগে বাংলাদেশে ভ্রমণের রেওয়াজ তেমন ছিল না। ভ্রমণের রেওয়াজ ছিল না, সুতরাং ভ্রমণ সাহিত্যও ছিল না। কোন কোন লেখকের মতে শ্রীচৈতন্যই বাংলার প্রথম উল্লেখযোগ্য ভ্রমণকারী এবং তাঁর উড়িষ্যা ও দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সঙ্গী ও পরিকর গোবিন্দ-রচিত 'গোবিন্দদাসের কড়চা'ই বাংলা ভাষার প্রথম ভ্রমণকাহিনী।

ইংরেজ এদেশে আসার পরে অবস্থার পরিবর্তন হল। চারদিকে রেললাইন পাতা হবার সঙ্গে সঙ্গে রেলযোগে ভ্রমণের অভ্যাস শুরু হল, এবং দেখতে দেখতে

ওই অভ্যাস সংক্রামক হয়ে উঠল। যে ব্যক্তি কখনও ঘর ছেড়ে দু'পা বাইরে যায়নি, তারও এবার ভ্রমণের সাধ জাগল। কতক জীবিকার তাগিদে কর্মের সন্ধানে, এবং কতক বা বিশুদ্ধ ভ্রমণেচ্ছার তাড়নায়, বাঙালী নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ল। ক্রমে ক্রমে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল, বিভিন্ন প্রান্ত তার অভিজ্ঞতার বলয়সীমার মধ্যে এসে পড়ল। তারই অনিবার্য পরিণতিতে ভ্রমণ সাহিত্যের সৃষ্টি। যে ব্যক্তির শুধু ভ্রমণেরই পা নেই, দেখবারও চোখ আছে, আরও বড়ো কথা, লেখবারও হাত আছে, তিনি কি শুধু বেড়িয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন? তাঁর বেড়ানোর আনন্দ আরও দশজনের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করতে না পারা পর্যন্ত তাঁর তৃপ্তি কোথায়? আর সে তৃপ্তি পেতে গেলেই তাঁকে ভ্রমণের স্মৃতি রোজনামচারূপে হোক, কি সুগ্রথিত বৃত্তান্তের আকারে হোক, কলমের মুখে লিপিবদ্ধ করতেই হবে। ভ্রমণ সাহিত্যের সূচনা এইভাবেই হল, বলা যেতে পারে।

বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের বিকাশ হয়েছে শোয়া শো বছরের অনধিক কাল হল। এই সময় মধ্যে সাহিত্যের এই বিভাগটির যা পরিপুষ্টি হয়েছে, তাকে বিস্ময়কর বলা চলে। একেবারে গোড়ার দিকে ভ্রমণ সাহিত্য রচনার যেসব নমুনা পাই সেগুলির লেখকদের মধ্যে আছেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, যদুনাথ সর্বাধিকারী প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে শেষোক্ত লেখকের 'তীর্থ ভ্রমণ' বইখানি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। ডায়েরীর আকারে লেখা এই বইটিতে যদুনাথ সর্বাধিকারী বাঙালীর ঘরোয়া ভাষায় উত্তর ভারতের সমতলের বিভিন্ন তীর্থ এবং হিমালয়ের কেদারবদরী, গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী, কুলু ও কাঙড়া উপত্যকার দ্রষ্টব্য স্থানগুলির বর্ণনা দিয়েছেন। তারপর ভ্রমণকারী লেখক হিসাবে নাম পাই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু, দুর্গাচরণ রক্ষিত, নবীনচন্দ্র সেন, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাচরণ রায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জানকীনাথ বসাক প্রমুখের।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আলাদাভাবে কোন ভ্রমণবৃত্তান্তের বই লেখেননি, তাঁর আত্মজীবনীর যে অংশে তিনি তাঁর উত্তর ভারতের ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন, তাকেই এই ভ্রমণ-সাহিত্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কলিকাতা থেকে জলপথে রওনা হয়ে তিনি পাটনা গাজিপুর, কাশী, এলাহাবাদ, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, এবং সবশেষে দিল্লী পর্যন্ত বজরাযোগে ভ্রমণ করেন। তারপর দিল্লীতে কয়েক দিন অবস্থান করবার পর, ডাকের গাড়ীতে করে পাঞ্জাবে যান। প্রথমে আম্বালা তারপর লাহোর এবং সবশেষে অমৃতসর—এইখানে

এসে তাঁর ভ্রমণ পরিসমাপ্ত হয়। দেবেন্দ্রনাথের ভ্রমণের ভাষা গভীর গম্ভীর কিন্তু খুবই চিত্তাকর্ষক। ভ্রমণের সাহিত্যে তাঁর অনুভবের বিচিত্র অভিজ্ঞতা যুক্ত হওয়ায় বৃত্তান্তটি আরও স্বাদু হয়ে উঠেছে। কাহিনীর ধারার মধ্যে আন্তরিকতার পূর্ণ স্বাক্ষর থাকায় রচনা হয়ে উঠেছে প্রাঞ্জল,—গাম্ভীর্য প্রাঞ্জলতার বাধা হয়নি।

কবি নবীন সেনের ভ্রমণবৃত্তান্ত 'প্রবাসের পত্র', স্ত্রীকে পত্রাবলীর আকারে লিখিত। নবীন সেনের গদ্য রচনা ভঙ্গীর পরিচয় আমরা তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আমার জীবন'-নামীয় আত্মচরিতমূলক রচনায় বিশেষভাবেই পেয়েছি। এই পত্রগুলিতেও তার অসদ্ভাব দেখতে পাই না। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বোম্বাই প্রবাসের অভিজ্ঞতা-সংবলিত 'বোম্বাই চিত্র' একখানি সুন্দর ভ্রমণ গ্রন্থ। প্রথম মণিপুরের উপর বই লিখেছিলেন জানকীনাথ বসাক। তাতে অন্য অনেক জ্ঞাতব্যের সঙ্গে মণিপুরের বীর সেনাপতি টিকেন্দ্রজিতের ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও পরিণামে ফাঁসীর বিবরণ সংকলিত আছে। দুর্গাচরণ রায়ের 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন' স্বর্গবাসী দেবতাদের জবানীতে তাঁদের কল্পিত মর্ত্য ভ্রমণের কাহিনী। বেশ উপভোগ্য রচনা, তবে জায়গায় জায়গায় রুচিবিকৃতি থাকায় রসোপভোগের বাধা ঘটেছে। এক সময়ে এ বইটি বহুল পঠিত ছিল।

কিন্তু পূর্বোক্ত নামপঙ্ক্তীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লেখক হলেন 'পালামৌ' রচয়িতা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর বিশ্রুতকীর্তি ভ্রাতার ন্যায় সর্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় দিতে না পারলেও ভ্রমণ সাহিত্যে তাঁর শক্তির অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর রেখে গেছেন। 'পালামৌ' ভ্রমণ কাহিনীর উপজীব্য বিষয়টি অকিঞ্চিৎকর—ছোটনাগপুরের পালামৌ নামক পাহাড় ও অরণ্য অধ্যুষিত জায়গার নিতান্তই উপকরণরিক্ত বৃত্তান্ত—কিন্তু রচনার জাদুতে ওই ক্ষীণসম্বল কাহিনীই অপূর্ব হৃদ্য হয়ে উঠেছে। রচনার জাদুর মূলে আছে, লেখকের সহজ কথন ভঙ্গী, সরস কৌতুক, মানবতাবোধ, সর্বোপরি সুতীক্ষ্ণ সৌন্দর্য চেতনা। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার মধ্যে আমরা সৌন্দর্যচেতনার যে অপরূপ বিস্ফার দেখতে পাই (এ কথার অনেক উদাহরণের মধ্যে উল্লেখ্য উদাহরণ, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ প্রভৃতি উপন্যাস), সমালোচক মোহিতলাল-কথিত বঙ্কিমের সেই কবিস্বভাব এই সৌন্দর্য চেতনার দ্বারাই বিশেষভাবে অভিষিক্ত ও পুষ্ট হয়েছে। তুলনীয় না হলেও তার সহধর্মী গুণ সঞ্জীবচন্দ্রের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। সৌন্দর্য চেতনার 'সামান্য' লক্ষণে সঞ্জীবচন্দ্র নিশ্চয়ই বঙ্কিমচন্দ্রের সমকক্ষতা দাবি করতে পারেন না, তবে তাঁদের দুইয়ের সৌন্দর্যানুভূতির চরিত্রটি যে এক, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। এর থেকে স্বতঃই এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে,

তাঁরা কৌলিক সূত্রে এই গুণটি লাভ করেছিলেন। পরে বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিভার মার্জনার দ্বারা বৈশিষ্ট্যটিকে অগ্রজের তুলনায় বহুগুণিত করে তোলেন। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রমণ সাহিত্যের কোনো নজির খুঁজে পাওয়া যায় না।

'পালামৌ'র রচনাভঙ্গীটি কৌতুকরসোপেত বললে কমই বলা হয়, তা অকপটতার গুণেও বিশেষ সমৃদ্ধ। কৃত্রিম সৌজন্য বোধের দ্বারা চালিত হয়ে মনের কথা ঢেকেঢেকে বলার রীতি সঞ্জীবচন্দ্র গ্রহণ করেননি তাঁর এই রচনায়। যা সত্যি-সত্যি অনুভব করেছেন, তাকেই ভাষা দিয়েছেন কলমের মুখে। তাতে বিবরণ আরও বেশী আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে।

এঁদের অব্যবহিত পরেকার যুগের বৃত্তান্তকার রূপে এই সমস্ত লেখকের নাম পাই শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, প্রসন্নময়ী দেবী, কেদারনাথ দাস, দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, ঈশ্বরচন্দ্র বাগচী, বরদাপ্রসন্ন বসু, স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রভৃতি। এঁদের প্রত্যেকের বইয়ের বিষয়ে আলাদা করে লেখা সম্ভব নয়, তবে শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীর 'সচিত্র দক্ষিণাপথ ভ্রমণ' বইটির সম্বন্ধে উল্লেখ না থাকলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। নামেই পরিচয়, শাস্ত্রী মহাশয় ছিলেন একজন শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, কিন্তু এই বইয়ের রচনায় তিনি এমন দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যঞ্জনা রেখেছেন, যাকে কোনমতেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতসুলভ রক্ষণশীলতার দ্যোতক বলা চলে না। বইয়ের "উজ্জয়িনী" অংশে এক প্রৌঢ় শেঠ ও তার তরুণী ভার্যার যে দাম্পত্য চিত্র তিনি এঁকেছেন তা যে-কোনো আধুনিক গল্পোপন্যাসের বিষয়ীভূত হতে পারতো।

এঁদের সমসাময়িক কালেই রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, প্রমুখ প্রভৃত শক্তিশালী লেখকদের আত্মপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ ভারতের আভ্যন্তর ভ্রমণের বিবরণ খুব কমই লিপিবদ্ধ করেছেন, তবে বিদেশ ভ্রমণের উপরে তাঁর একাধিক বই আছে। যথা, 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী', 'জাভা-যাত্রীর পত্র', 'জাপান-যাত্রী', 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী', 'রাশিয়ার চিঠি', 'পারস্যে', 'পথের সঞ্চয়'। এ ছাড়া কবির অগণিত চিঠির মধ্যে ভ্রমণ অভিজ্ঞতার বহু প্রাসঙ্গিক উল্লেখ ছড়িয়ে আছে। বেশীর ভাগই বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত ('পথে ও পথের প্রান্তে' দ্রষ্টব্য), কিছু কিছু মাত্র আভ্যন্তর ভ্রমণ-বিষয়ক। 'ছিন্নপত্রের' অনবদ্য চিঠিগুলিতে পূর্ববঙ্গের শিলাইদহ, পতিসর, সাজাদপুর পল্লী-অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি, লোকযাত্রা, বিশেষ করে পদ্মা নদীর বিশদ বর্ণনা আছে, কিন্তু সে সব চিঠি ভ্রমণের উদ্দেশ্যে লেখা নয় বলে তাদের ঠিক ভ্রমণ সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করা চলে না। চিঠিগুলি অসাধারণ সংবেদনশীল এক কবি চিত্তের ঋতুভেদে অনুভূতির রঙ্-বদলের

কাহিনী, পল্লীবাসীর জীবনযাত্রার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের ফলপরিচয় বাহী ; ভ্রমণের রস যদি তাতে থেকে থাকে, তাকে উপরিপাওনা বলে গণ্য করতে হবে।

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ লিখিত ভ্রমণ কাহিনীর পরিমাণ বেশী নয়, তবে যেটুকু লিখেছেন তার মধ্যেই তাঁদের রচনায় শিল্পসৌন্দর্য সুপরিস্ফুট। অবনীন্দ্রনাথের 'পথে বিপথে' বইয়ের ভ্রমণ বৃত্তান্ত সমূহ লেখকের স্বভাবসিদ্ধ চিত্রধর্মী লেখনরীতির এক চমৎকার উদাহরণ। কাব্যসুষমামণ্ডিত ও ছবির মত উজ্জ্বল। তাঁর অনবদ্য লিপিভঙ্গীর বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর পাল্কিতে করে কোনারক যাত্রার কাহিনীর মধ্যে।

অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'নদীপথে' একটি অপরিসর, কিন্তু সুলিখিত ভ্রমণকাহিনী।

বাংলার অপরাজেয় কথাশিল্পী সর্বলোকপ্রিয় লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রমণ সাহিত্যের কোন বই নেই, যদিও তাঁর ভ্রমণের পরিমাণ একেবারে নগণ্য বলা চলে না। অবশ্য 'শ্রীকান্ত', 'পথের দাবী' প্রভৃতি উপন্যাসের বর্মা-প্রবাসের চিত্রগুলিকে যদি ভ্রমণের পর্যায়ভুক্ত করা যায় তবে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। শরৎচন্দ্র দিন কয়েকের জন্য বৃন্দাবন বেড়াতে গিয়েছিলেন, সঙ্গে ছিলেন সুরসাধক দিলীপ-কুমার রায় ও উত্তরা-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। তার একটি অপূর্ব রসান্বিত কৌতুককর বিবরণ তিনি প্রবন্ধের আকারে লিপিবদ্ধ করেছিলেন, সেটি সম্প্রতি শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী ও শ্রীমতী সুষমা চক্রবর্তী সম্পাদিত 'শতবর্ষের পথযাত্রা' নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তা থেকে পাঠক দেখতে পাবেন শরৎচন্দ্র যদি ভ্রমণরচনায় হাত দিতেন তা হলে দেশবাসীকে কী অপরূপ সম্পদই না উপহার দিয়ে যেতে পারতেন!

বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের সঙ্গে হিমালয়ের নাম অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত রয়েছে বললেও চলে। কত কত ভ্রমণলেখক যে হিমালয় পর্বতের অন্তর্গত তীর্থাবলী ও নৈসর্গিক গন্তব্যগুলিকে কেন্দ্র করে গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন, তার সীমা-সংখ্যা নেই। সকলের নাম করা সম্ভব নয়, সকলের নাম জানাও নেই, শুধু এইমাত্র এখানে বলা চলে যে, শুধুমাত্র এই বিষয়টিকে নিয়েই একটা স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচিত হতে পারে। যাই হোক, সেরকম বিস্তৃত আলোচনার অবসর এই প্রবন্ধে নেই, এখানে শুধু যাঁরা বিশিষ্ট তাঁদের নামোল্লেখ ও তাঁদের রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান করেই ক্ষান্ত থাকব।

হিমালয়-সাহিত্যে একেবারে গোড়ার দিকের বইয়ের মধ্যে নাম করা যায়, যদুনাথ সর্বাধিকারীর 'তীর্থভ্রমণ' বইটির, যার পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। তার পরেই মনে পড়ে, বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর 'অব্যক্ত' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত

"ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে" নামক বহুল পঠিত প্রবন্ধটির কথা। এটিতে তিনি একটি বৈজ্ঞানিক-ভৌগোলিক তথ্যের প্রতিষ্ঠা করলেও সেই সূত্রে নন্দাদেবী ও ত্রিশূল গিরিশৃঙ্গের যে কাব্যসুরভিত বর্ণনা দিয়েছেন তা নামতঃ ভ্রমণ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত না হলেও, কার্যতঃ নিশ্চয়ই অন্তর্ভুক্ত হবার যোগ্য।

হিমালয়-সাহিত্যের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বই হল, জলধর সেনের 'হিমালয়'। এতে তিনি হরিদ্বার থেকে বদরিকাশ্রম ভ্রমণের কাহিনী সংকলিত করেছেন। ভাষার প্রাঞ্জলতায়, মানবতাবোধের উজ্জ্বলতায়, বর্ণিত বিবরণের স্বাদুতায় বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যে হিমালয় গ্রন্থটির কোনো তুলনা হয় না। বইটিতে নিসর্গ বর্ণনার যথেষ্ট অবকাশ থাকা সত্বেও, এবং স্থানে স্থানে তা করা হলেও, লেখকের নিসর্গ-চেতনাকে ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর মানবচেতনা। মানবতাই এই বইয়ের সর্বপ্রধান সম্পদ্। এই একটি মাত্র গ্রন্থের দ্বারাই জলধর সেনের নাম বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য তিনি আরও ভ্রমণের বই লেখেন তবে তার কোনটিই 'হিমালয়'-এর খ্যাতিকে অতিক্রম করতে পারেনি।

জলধর সেন-এর পর আর যাঁরা হিমালয় পর্বতমালা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলগুলির দ্রষ্টব্যকে কেন্দ্র করে উল্লেখযোগ্য সাহিত্য রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট তিনজন হলেন—প্রবোধকুমার সান্যাল, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় ও উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। প্রবোধকুমার সান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে' ও 'দেবতাত্মা হিমালয়' নামক গ্রন্থদ্বয় এবং অন্যান্য আরও অনেক ছড়ানো রচনার মাধ্যমে তিনি হিমালয়ের বিশাল বিস্তৃত রূপের যতদূর সাধ্য একটি ব্যাপ্ত আভাস বাংলাভাষা-ভাষী পাঠক পাঠিকাদের সামনে ধরে দিয়েছেন। তাঁর 'মহাপ্রস্থানের পথে' বইয়ের বর্ণনার ভিতর কিছু কাল্পনিকতার মিশেল থাকলেও, নিছক ভ্রমণরসের দিক থেকেই বইটির আবেদন অনস্বীকার্য। তবে 'দেবতাত্মা হিমালয়' আরও অনেক বেশী তথ্যসমৃদ্ধ, অনেক বেশী পূর্ণাঙ্গ। বর্ণনার ভঙ্গীটিও সমধিক গভীর-গম্ভীর। হিমালয় সম্পর্কে তাঁর আর একখানি বই হল 'উত্তর হিমালয় চরিত'। এ ছাড়া, ভ্রমণের পটভূমিতে রচিত প্রবোধকুমার সান্যালের কিছু ভালো ছোট গল্পও আছে।

শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় একজন সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী। তাঁর রেখাঙ্কনের বলিষ্ঠতা ও চিত্রিত বিষয়বস্তুর পরূষব্যঞ্জকতা তাঁর লিখিত ভ্রমণকাহিনীর মধ্যেও তাদের ছাপ ফেলেছে। বেশ সবল লেখনী প্রমোদকুমারের। তাঁর 'তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ' ও 'হিমালয় পারে মানস সরোবর ও কৈলাস' নামক গ্রন্থদ্বয় বাংলা হিমালয়-সাহিত্যের দুটি মূল্যবান্ সম্পদ্।

শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সংজ্ঞার্থে সাহিত্যিক না হলেও, একজন খাঁটি হিমালয় প্রেমিক লেখক। হিমালয়ের পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়ানো ও সেই সূত্রে সাধু-সঙ্গ করা তাঁর নেশা। সেইসব সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতারই ফসল হল তাঁর 'হিমালয়ের পথে পথে,' ও 'গঙ্গাবতরণ' প্রভৃতি গ্রন্থ।

এ ছাড়া আরও যাঁদের রচনার দানে বাংলা হিমালয় সাহিত্য পরিপুষ্ট হয়েছে, তাঁদের মধ্যে আছেন সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য ('অমরনাথ'), উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ('মায়াবতীর পথে'), রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্তা লেখিকা রাণী চন্দ ('পূর্ণকুম্ভ'), রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক সুবোধকুমার চক্রবর্তী ('রম্যাণি বীক্ষ্য' হিমাচল পর্ব ও 'একজন লামা ও মানস সরোবর'), রামপদ মুখোপাধ্যায় ('হিমালয়ের আঙিনায়'), দেবপ্রসাদ দাশগুপ্ত ('একই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে', ২য় পর্ব ও 'একই আকাশ ভুবন জুড়ে'), শঙ্কু মহারাজ ('বিগলিতকরুণা জাহ্নবী-যমুনা'), অবধূত ('নীলকণ্ঠ হিমালয়'), বীরেন্দ্রনাথ সরকার ('রহস্যময় রূপকুণ্ড'), গৌরকিশোর ঘোষ ('নন্দকান্ত নন্দাঘুন্টি'), চিত্তরঞ্জন মাইতি ('শৈলপুরী কুমায়ুন'), প্রভৃতি।

হিমালয়ের আনুষঙ্গিক উত্তর ভারতের নানা তীর্থভূমি এবং ভূস্বর্গ কাশ্মীর সম্পর্কেও বহু বই আছে। এ সম্বন্ধে যাঁরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধারায় লিখেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, স্বামী দিব্যাত্মানন্দ, প্রবোধকুমার সান্যাল, দিলীপকুমার রায়, বিমলচন্দ্র সিংহ, সুবোধকুমার চক্রবর্তী, দেবপ্রসাদ দাশগুপ্ত, ডক্টর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রমুখ সন্ন্যাসী-গৃহী, বিগত-বর্তমান, প্রবীণ নবীন বিভিন্ন শ্রেণীর লেখক। অজ্ঞতা ও অনবধানতা বশতঃ আরও অনেক লেখকের নাম হয়তো বাদ পড়ল ; তাঁদের কাছে মার্জনা ভিক্ষা ছাড়া গত্যন্তর দেখছি নে।

এ তো গেল উত্তর ভারতের ইতিবৃত্ত। দক্ষিণ ভারত সম্পর্কিত ভ্রমণ কাহিনীর পরিমাণও বড়ো কম নয়। যাঁদের সৃষ্টির দানে ভ্রমণের এই বিভাগটি সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, পূর্বে উল্লিখিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী ('সচিত্র দক্ষিণাপথ ভ্রমণ'), নির্মলকুমার বসু ('পরিব্রাজকের ডায়েরী'), সুবোধকুমার চক্রবর্তী ('রম্যাণি বীক্ষ্য', দাক্ষিণাত্য ও দ্রাবিড় পর্ব), অপূর্বরতন ভাদুড়ী ('মন্দিরময় ভারত', ৩য় খণ্ড), চপলাকান্ত ভট্টাচার্য ('দক্ষিণাপথ'), রামপদ মুখোপাধ্যায় ('দেউলতীর্থ দ্রাবিড়'), প্রবোধচন্দ্র চৌধুরী ('দাক্ষিণাত্যের দেবদেউল'), অমল ঘোষ ('দেবভূমি দক্ষিণ') প্রভৃতি। এই নামপঞ্জীতেও নাম বাদ পড়া খুবই স্বাভাবিক, অনুক্ত লেখকদের কাছে ক্ষমাভিক্ষাই এই ক্ষেত্রে ত্রুটী লাঘবের একমাত্র পথ।

লিখিয়ে ও পড়ুয়া

লেখাপড়ায় যাঁরা চর্চা করেন তাঁদের দুটি স্পষ্ট-চিহ্নিত ভাগে ভাগ করা যায় : লিখিয়ে এবং পড়িয়ে। শব্দানুপ্রাসমিলের খাতিরে 'পড়িয়ে' কথাটি ব্যবহার করলুম, কিন্তু বাংলা ভাষায় 'পড়ুয়া' কথাটারই সমধিক চল। তবে 'পড়িয়ে' বা 'পড়ুয়া' যে শব্দেরই ব্যবহার হোক-না কেন, প্রশংসাসূচক হয়েও ওই দুটি শব্দের ধ্বনির মধ্যে কোথায় যেন একটা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ রয়েছে।

অপরপক্ষে 'লিখিয়ে' কথাটার মধ্যেও একটা সূক্ষ্ম তাচ্ছিল্যার্থ নিহিত রয়েছে বলে মনে হয়। 'লিখিয়ে' কথাটার ঠিক ঠিক ইংরেজী প্রতিশব্দ যদি প্রয়োগ করতে হয় তো 'স্ক্রাইব' বা 'কুইল-ড্রাইভার' কথা দুটির শরণাপন্ন হতে হয়। বলা বাহুল্য, ও দুটির কোনটিই যথেষ্ট সম্ভ্রমার্থে ব্যবহৃত শব্দ নয়। 'লেখক' বলতে মনে যে ভাব জেগে ওঠে, 'লিখিয়ে' বললে মনে ঠিক সেই ভাব জাগে না। 'লেখক' একটি সম্ভ্রমপূর্ণ শব্দ, 'লিখিয়ে' সেরূপ নয়। লেখা যাঁদের পেশা বা অভ্যাস, লিখে অর্থাৎ কলম চালিয়ে যাঁরা জীবিকা নির্বাহ করেন, তাঁদের লক্ষ্য করেই যেন 'লিখিয়ে' কথাটার সচরাচর ব্যবহার। তবে প্রবন্ধের শিরোনামায় 'লিখিয়ে' ও 'পড়িয়ে' বা 'পড়ুয়া' এই দুটি শব্দের নির্বাচন করলুম কেন? নির্বাচন করেছি এইজন্য যে, ওই দুই শ্রেণীর মানুষেরই মানসিকতা যে একপেশে, দৃষ্টিভঙ্গী খণ্ডিত, অভ্যাস ত্রুটিযুক্ত—সেটির প্রতিপাদন এই প্রবন্ধের মুখ্য বিচার্য। কিন্তু যেহেতু ত্রুটি-বিচ্যুতির আলোচনা গঠনাত্মক নয়, বিনাশাত্মক, সেই কারণে কী হলে একজন লেখাপড়ার চর্চাকারী ব্যক্তি সত্যি সত্যি একজন আদর্শ বিদ্বান বলে সমাজে পরিচিত হতে পারেন সেটি নিরূপণ করাও আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হবে। অর্থাৎ বিদ্বান কে, পণ্ডিত কাকে বলে, এটিও এই রচনার নির্দেশ্য।

প্রথমে 'লিখিয়ে'-র কথা বলি।

লেখাপড়ার চর্চাকারীদের মধ্যে এক শ্রেণীর ব্যক্তি আছেন যাঁরা লিখতে ভালোবাসেন এবং অনবরত লিখেই চলেছেন। গোড়ায় হয়তো তাঁদের 'লেখক'রূপে প্রতিষ্ঠা অর্জনের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিল, সেজন্যে প্রযত্নেরও অভাব ছিল না; কিন্তু অবস্থার চক্রে এবং ভাগ্যের ফেরে ইদানীং তাঁদের 'লেখক' হবার আকাঙ্ক্ষা ঘুচে গেছে; জীবিকা নির্বাহের তাগিদেই হোক আর

অঢেল অর্থ রোজগারের ধান্দাতেই হোক, তাঁরা বিরামবিহীন ভাবে দিনরাত লিখেই চলেছেন। তাঁদের জীবনে অবসর বলে কিছু নেই, যেটুকু অবসর আছে সেটুকু লিখিত রচনাদির বিলি-ব্যবস্থা করতেই কেটে যায়। লোকে যখন বিশ্রামসুখ ভোগ করছেন, এঁরা তখন পাণ্ডুলিপি বগলে করে প্রকাশকের দুয়ারে হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন কিংবা লেখার তাড়া হাতে নিয়ে সম্পাদকের দপ্তরে ছুটছেন। কাগজের পাতায় অক্ষর সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে লেখা তৈরী করা এবং লেখা সম্পূর্ণ হলে সে লেখার গতি করার জন্য প্রকাশক বা সম্পাদকের দ্বারস্থ হওয়া—লিখিয়ের সময় এ-দুটি কাজের মধ্যেই মূলতঃ বিভক্ত। ওই প্রায়-নিশ্ছিদ্র ঠাস-বুনন কাজের ফাঁক-ফোকর দিয়ে কখনও অন্য চিন্তা গলতে পারে কিনা তাতে সন্দেহ আছে।

অথচ আমরা জানি, লেখক হতে হলে যথেষ্ট পরিমাণে পড়াশুনো করতে হয়। অধ্যয়ন চিন্তন-মনন-অনুধ্যানের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কোন ভাব যখন মনে বিশেষভাবে দানা বেঁধে ওঠে এবং প্রকাশের জন্য আকুলি-বিকুলি করতে থাকে, তখনই শুধু তাকে খাতার পাতায় লিপিবদ্ধ করার প্রশ্ন ওঠে, তার আগে নয়। একটা ভাব বা কল্পনা বা আইডিয়া মনে যথেষ্ট পরিমাণে আলোড়ন তুললে ও আকার লাভ করলে তবেই তার—আলংকারিকেরা যাকে বলেছেন externali-zation, শৈল্পিক বহিঃ-প্রকাশ—এর কথা আসে। কিন্তু বক্তব্য মনের মধ্যে তেমনভাবে দানা বাঁধলো না অথচ লেখবার অভ্যাসের খাতিরে হোক, বক্তব্য আধা-খেঁচড়া বা অপরিপক্ক হোক—তাকেই ভাষা দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলুম এটা প্রকৃত লেখকের ধর্ম নয়, কলম চালিয়ের কর্ম।

লিখিয়ে বলতে যাঁদের বোঝায় তাঁদের বেশীর ভাগই এই শ্রেণীর—অভ্যাসের বশে লেখক, পেশার তাগিদে লেখক, অর্থোপার্জনের প্ররোচনায় লেখক। এ-জাতীয় লেখক লিখন রূপ পবিত্র কার্যের বলতে গেলে অবমাননাই করেন।

লেখা জিনিসটা বড়ো সহজ ব্যাপার নয়। পূর্বেই বলেছি ভাব অন্তরে সুগ্রথিত না হলে তাকে লেখায় রূপ দিতে যাওয়া কোনো কাজের কথা নয়। বক্তব্য কিছুই নেই অথচ লেখবার খাতিরেই লেখা— এ রকম রচনার কী মূল্য? কিংবা কল্পনা দুর্বল বা অগ্রথিত, তাকে সৃষ্টিমূলক রচনার আকার দিতে যাওয়ারই বা কী সার্থকতা?

রচনা দুই প্রকার : বক্তব্যপ্রধান রচনা, সৃষ্টিধর্মী রচনা। প্রথমটির ভিত্তি জ্ঞান, দ্বিতীয়টির ভিত্তি কল্পনা। একটি চায় ভাবসৃষ্টি করতে, অন্যটি চায় রূপসৃষ্টি করতে। কিন্তু যিনি যে ধরনের রচনারই চর্চা করুন-না কেন, তাঁর

কাজের পিছনে প্রভূত পরিমাণে অবসরের ভূমিকা না থাকলে সে রচনা সার্থক হয় না। অবসর অর্থে হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নয়, গা এলিয়ে দিয়ে চিন্তাশূন্যতায় প্রশ্রয় দেওয়া নয়, অবসর অর্থে এখানে বুঝতে হবে অধ্যয়ন মনন নিদিধ্যাসনের অনুশীলনের অবকাশ। অবসরের মুহূর্তগুলিকে অনেক পড়ে, অনেক ভেবে, অনেক কল্পনা ও অনুভূতির অভ্যাস দিয়ে ভরিয়ে তুলতে পারলে, তবেই লিখনকর্মের যথার্থ প্রাগ্‌ভূমিকাটি প্রস্তুত করে তোলা যায়। পড়তে হবে অজস্র, ভাবতে হবে প্রচুর, লিখতে হবে একরত্তি—এই অনুপাত অনুযায়ী যদি আমরা চলবার চেষ্টা করি তা হলেই শুধু লেখায় প্রকৃত শক্তিমত্তার সঞ্চার করা সম্ভব। পড়লুম না, ভাবলুম না, অনুভব করলুম না অথচ অভ্যাসমোতাবেক দিনরাত ঘসঘস করে কলম চালিয়ে গেলুম এ রকম হলে আর লেখা লেখা থাকে না, তা ছাপাখানায় কম্পোজিটরের টাইপ সাজানোর মতো কালির আঁচড়ে অক্ষর সাজানোর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়—যান্ত্রিক ব্যাপার, অভ্যাসগত ব্যাপার।

এইজন্য দেখা যায়, বড় বড় লেখকেরা ভাবেন বেশী, পড়েন বেশী, লেখেন কম। এই জাতীয় বিশ্রুত-কীর্তি লেখকদের মধ্যে কাউকে কাউকে রীতিমতো অলস বলা যায়—লেখার পরিমাণকে যদি শ্রমশীলতার একমাত্র মানদণ্ডরূপে বিচার করা যায় সেই বিচারের নিরিখে। কিন্তু লেখার পরিমাণ কম হলেই ভাবনার পরিমাণ কম হয় না, পড়ার পরিমাণ কম হয় না। বরং ওই দুইয়ের মধ্যে প্রায়ই বিপরীত অনুপাতের সম্পর্ক বিরাজ করতে দেখা যায়। অনেক পড়া ও চিন্তা-ভাবনার পর দৃষ্টিগ্রাহ্য মাত্রায় স্বল্প পরিমাণ লেখা রচনার সার্থকতার একটা প্রধান নিশানা। অবশ্য সব সময়েই যে এ নিয়ম খাটে তা নয়, তবে মোটামুটি ভাবে এ নিয়ম সত্য। সত্য এই কারণে যে, উপযুক্ত পরিমাণ প্রস্তুতি ব্যতিরেকে কোন কাজই সার্থকতা-মণ্ডিত হয় না—তা লেখার কাজই হোক আর অন্য যে-কাজই হোক। অভ্যাসই যে লেখার একমাত্র যৌক্তিকতার উৎস, যার পিছনে প্রাণের বা মনের গভীরতর কোন অভীপ্সা নেই, যা যথেষ্ট-পরিমাণ তথ্য, তত্ত্ব বা চিন্তাশীলতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তা আয়তনের দিক দিয়ে যতোই ভূরিপরিমাণ হোক-না কেন, প্রকৃতিতে তা কৃত্রিমতাযুক্ত হতে বাধ্য। এ-জাতীয় তাগিদবিহীন রচনায় যান্ত্রিকতার দোষ এড়ানো সম্ভব নয়।

শোনা যায় রবার্ট লুই স্টিভেনসন উদ্দেশ্যহীনভাবে একা একা ঘুরে বেড়াতে খুব ভালোবাসতেন। তাঁর আত্মকথনমূলক একটি রচনায় বলেছেন, তিনি বেড়াবার সময় সঙ্গী পছন্দ করেন না, সঙ্গে আর কেউ থাকলে তাঁর চিন্তার তন্ময়তা আর আলস্যের আবেশ ব্যাহত হয় বলে তিনি একা বেড়াতেই অধিক

আরাম পান। এই বেড়ানোর ঝোঁক আর একা বেড়াবার ইচ্ছা আর কিছু নয়, মনকে সার্থক সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে অত্যাবশ্যক চিন্তা-কল্পনার উপকরণে ভরিয়ে তোলার আয়োজন মাত্র। একা বেড়াবার অবসরে, আলস্যমন্থর মুহূর্তগুলিতে মনের ভিতর ভাব-কল্পনার যে রোমন্থন চলে, পরে লেখার টেবিলে এসে খাতার পাতায় তাকেই ওগড়াবার এটি ভূমিকা।

হ্যাজলিট, ডি-কুইন্সি প্রমুখ বিশিষ্ট ইংরেজ প্রাবন্ধিকদের লেখায়ও আমরা লেখকের পক্ষে এ-জাতীয় ভ্রমণবিলাস আর অবসর বিনোদনের ভূমিকার গুরুত্ব লক্ষ্য করি। চার্লস ল্যাম্বের স্বীয় রচনার বাচনিক আমরা জানতে পারি, ল্যাম্ব অবসরক্ষণে লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন, উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, পুরাতন লণ্ডন শহরের আবহের সৌগন্ধ্য বুক ভরে গ্রহণ করবার চেষ্টা। ঘুরতে ঘুরতে যদি প্রাচীন দিনের এক-চিলতে বাতাস নিঃশ্বাসে উঠে আসে, সেটাই একটা মস্ত লাভ।

আমাদের প্রাণপ্রিয় শরৎচন্দ্র ঘোরতর আলস্যবিলাসী লেখক ছিলেন। নেশাসক্ত ব্যক্তি যেমন মৌজ করে নেশার মৌতাত জমান, তিনিও তেমনি যথেষ্ট মৌজ করে আলস্য ভোগ করতেন। ছিলিমের পর ছিলিম তামাক পুড়ত, হাতে গড়গড়ার নল নিয়ে আরাম-কেদারায় অর্ধ-শয়ান অবস্থায় আপাত-নিষ্ক্রিয় ভাবে বসে রয়েছেন তো রয়েছেনই, লিখবার নাম নেই, তার জন্য তাড়াহুড়োরও কোন লক্ষণ নেই। দর্শনার্থীদের সঙ্গে একটানা আলাপ-আলোচনায় নিরত, যেন আলাপ-আলোচনাটাই জীবনের একমাত্র মুখ্য কৃত্য, সংসারে আর-কোন কর্তব্য নেই। বাইরে থেকে দেখলে শরৎচন্দ্রকে কুঁড়ের হদ্দ লেখক বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি করা হত না। লেখার জন্য প্রয়োজনীয় আড়মোড় ভাঙতে তাঁর অনেক সময় লাগত, লেখার টেবিলে বসতে ছিল ঘোরতর অনিচ্ছা, সম্পাদককে লেখা দেবার তারিখ দিয়ে সেই তারিখ বেমালুম ভুলে যেতেন অথবা মনে থাকলেও তারিখ পাল্টাতেন। অপরাজেয় কথাসাহিত্যিক রূপে জীবনের যে পর্বে তিনি বাংলাদেশের হৃদয়মধ্যে আপনার সুপ্রতিষ্ঠিত আসন করে নিয়েছেন, সেই পর্বে এসে তাঁর অন্তরে যেন আর লেখার জন্য বিশেষ মমতা অবশিষ্ট ছিল না। ওই সময়ে আপাত-আলস্যবিলাসে এমন আসক্ত হয়েছিলেন যে, লিখতে বসতে যাতে না হয় তার অনুকূলেই যেন সর্বদা যুক্তি খুঁজে বেড়াতেন। যুক্তি অর্থাৎ অছিলা—না-লেখবার অছিলা।

শোনা যায় 'বিজলী'-সম্পাদক নলিনীকান্ত সরকার শরৎচন্দ্রের উপর্যুপরি প্রতিশ্রুতিভঙ্গে হতাশ, ক্ষুব্ধ আর ক্ষিপ্ত হয়ে, শেষ পর্যন্ত একপ্রকার মরিয়াভাবেই

এক কৌশল অবলম্বন পূর্বক শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে লেখা আদায় করেছিলেন। তিনি কী করেছিলেন? না, শরৎচন্দ্রকে ঘরে বন্দী করে বাইরে থেকে দরজায় কুলুপ এঁটে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন লেখা যতক্ষণ না শেষ করছেন ততক্ষণ তিনি ছাড়া পাবেন না। এই কৌশলে কাজ হয়েছিল। কয়েক ঘণ্টা ঘরে আবদ্ধ থেকে লেখা শেষ করবার পর তবে শরৎচন্দ্র ঘর থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন। অবশ্য নলিনীকান্তের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ছিল গভীর স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক, তাইতেই নলিনীকান্ত শরৎচন্দ্রের মতো এমন মানী ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সঙ্গে এমনতর চাতুর্য অবলম্বন করতে সাহসী হয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রকে আচ্ছা জব্দ করেছিলেন তিনি। তবে এই ফাঁদ-পাতার আয়োজনের ভিতর, বলাই বাহুল্য, ক্রূরতার কোন স্থান ছিল না। ফাঁদের যিনি শিকারী তিনি তাঁর শিকারের জন্য জানলা দিয়ে অবিরাম চা-সিগারেটের জোগান দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। আপসে ঝগড়ার মতো এ-ও এক ধরনের আপসমূলক ষড়যন্ত্র। ক্রমাগত কথার খেলাপে ক্ষুব্ধ নলিনীকান্তের আহত অভিমানপ্রসূত এই ফন্দী, ভক্তের প্রতি অপরিসীম স্নেহ-বাৎসল্যের টানে শরৎচন্দ্র একপ্রকার অপ্রতিবাদেই মেনে নিয়েছিলেন।

কিন্তু এই-যে বৃত্তান্ত, যা বেশ খানিকটা সবিস্তারেই বলা হল, এর ভিতরের কথাটা কী? শরৎচন্দ্র কি লিখনবিমুখ ছিলেন? কুঁড়ে ছিলেন? তবে বাংলাদেশের নরনারীর মনোহরণকারী এত এত অনবদ্য গল্পোপন্যাস তিনি লিখলেন কী করে এবং কখন? আসলে শরৎচন্দ্রের ওই আলস্য লিখতে বসার আবশ্যিক প্রস্তুতিপর্বের একটি প্রাথমিক পর্যায় মাত্র। যতক্ষণ তিনি লোকজনের সঙ্গে গল্পগাছা করে দৃশ্যতঃ উদ্দেশ্যহীনভাবে সময় কাটাতেন, ছিলিমের পর ছিলিম তামাক পোড়াতেন, কিংবা কাছেপিঠে যখন মানুষ থাকত না, হাতে সিগারেট ধরে আলগোছে ঠায় বসে থাকতেন, সারা সময় জুড়ে তাঁর মনে মন্থন চলত সম্ভাবিত সৃষ্টিক্রিয়ার। এটা আমাদের অনুমান মাত্র নয়, শরৎচন্দ্রকে যাঁরা কাছে থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরাই শরৎচন্দ্রের এই সৃষ্টিরহস্য অবগত ছিলেন। আর শরৎচন্দ্র বলে কথা কেন, শক্তিমান্ সৃষ্টিধর্মী লেখকমাত্রেরই তো এই মনোধর্ম। তাঁদের বেলায় আলস্য একটা ভঙ্গী, লোক-দেখানো আলস্যের অবসরে অন্তর গভীর সৃষ্টির আকূতিতে পূরে রেখে তাঁরা তাঁদের সাহিত্যকর্মকে প্রকৃত সৃষ্টির লক্ষণাক্রান্ত করেছেন এবং এইভাবে অনেক কালজয়ী সাহিত্যের জন্ম দিয়েছেন।

অবিরাম লেখা, ঊর্ধ্বশ্বাসে লেখা, অনর্গল লেখা—এই প্রায়-জনশ্রুত উৎক্ষিপ্ত

রচনাপ্রয়াসের পিছনে বিশ্রামের কোন পটভূমিকা নেই, নেই আলস্যের মধুর রোমন্থনের কোন সুস্থির ক্রিয়া। অধ্যয়ন-মনন-জল্পন-কল্পনের মন্থর কিন্তু অপরিহার্য অধ্যায়টি এই শ্রেণীর ব্যস্ততাতাড়িত অস্থির রচনাক্রিয়ায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ফলে এই জাতীয় রচনার ফসল প্রাচুর্যমণ্ডিত হলেও সারবান হয় না, তাতে বিস্তার থাকলেও গভীরতা আসে না, এবং···সবচেয়ে যেটা বিচ্যুতি, এরকম লেখা প্রায়ই কৃত্রিমতা দোষযুক্ত হয়, ক্লান্তিকর অভ্যাসের যান্ত্রিকতার ছাপ ওই লেখার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে মলিন করে দেয়। ফসলের অজস্রতাটাই বড় কথা নয়, তার প্রাণপ্রদায়িণী শক্তিটাই আসল। প্রাচুর্যের পিছনে মনোহারিত্ব না থাকলে নিছক প্রাচুর্যের বিশেষ মূল্য নেই। সাহিত্য আনন্দের দান, অধ্যবসায়ের নয়।

কথিত আছে, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের ছক আগাগোড়া মনে মনে প্রস্তুত থাকত, আগেভাগে সমস্ত কাহিনীটা ছকে নিয়ে তবে তিনি লিখতে বসতেন। ফলে এমনও হয়েছে যে, কোন উপন্যাসে আত্মনিয়োগ করে প্রথম দু' অধ্যায় লেখার পর মাঝের অধ্যায়গুলি ডিঙিয়ে ত্রয়োদশ কি চতুর্দশ অধ্যায় আগে লিখেছেন। সর্বশেষ অধ্যায় আগে লিখে পূর্ববর্তী অধ্যায় পরে লিখেছেন কিনা সে কথা জানা নেই, তবে সমস্ত গল্পের রূপরেখাটি এমনভাবে তাঁর মনে গাঁথা থাকত যে, চেষ্টা করলে বোধহয় তা-ও তিনি পারতেন।

এতে কী প্রমাণ হয়? প্রমাণ হয় না কি যে, শরৎচন্দ্র মনের দিক দিয়ে অতিমাত্রায় সক্রিয় ছিলেন? এই-যে গোটা উপন্যাসের কাঠামো আগে ভেবে নিয়ে তারপর লেখায় হাত দেওয়া—এ কি মনের আলস্যের নিদর্শন? মোটেই নয়, বরং সম্পূর্ণ তার উল্টো। এর দ্বারা এই কথারই সার্থকতার পরিচয় মেলে যে, বড় বড় লেখকদের বেলায় আলস্যবিলাস আর অবসরবিনোদন অবিস্মরণীয় সৃষ্টিকর্মের গর্ভসূচনার অতিমন্থর কিন্তু অত্যাবশ্যক প্রারম্ভিক পর্ব মাত্র।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর গোটা জীবনে অবিশ্রান্ত লিখে গেছেন সত্যি কথা কিন্তু তাঁর ভাবকল্পনা এতোই উচ্চস্তরের যে তাঁর কাছে লেখা জিনিসটা মোটেই অভ্যাসগত বা যান্ত্রিক ব্যাপার ছিল না, ছিল সৃষ্টির লীলা, ছিল অফুরন্ত আনন্দের উৎস। সংসারের ঊষর বাস্তবতা ও তজ্জনিত যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি লাভের একটি নিশ্চিত উপায় ছিল তাঁর সাহিত্যকর্ম—তা ছিল তাঁর মুক্তির প্রকরণ। যান্ত্রিক লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মূলেই পার্থক্য। অর্থকরী প্ররোচনা, অভ্যাসের যান্ত্রিক আনুগত্য, ক্রমাগত লিখে ও বই ছাপিয়ে লেখকরূপে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা—এ সব রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অবান্তর প্রসঙ্গ ছিল। যে উচ্চ কবি-কল্পনা ও ঐকান্তিক সৃষ্টির আকুতিতে সর্বদা তিনি বিভোর

হয়ে থাকতেন, তাঁর কাব্য ও সাহিত্য তারই নৈমিত্তিক ফসল মাত্র ; কাব্যগ্রন্থ রচনার জন্যই তিনি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেননি। রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছেন, কবিতা না লিখে তিনি থাকতে পারেননি ব'লে। নিরন্তর সৃষ্টির লীলায় তিনি ভরপুর হয়ে ছিলেন, তাই তাঁর সৃষ্টির এতো প্রাচুর্য, বৈচিত্র্য আর সৌন্দর্যসুষমা।

কিন্তু এই আপাত-অন্তহীন, বিরতিচ্ছেদ-বিবর্জিত কাব্যসাধনার ফাঁকে ফাঁকে রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন বিস্তর, তার চেয়েও ভেবেছেন বেশী, তার চেয়েও হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন অনেক, অনেক বেশী মাত্রায়। প্রকৃতিকে কী গভীর ও নিপুণভাবে কবি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তার সহস্রবিধ পরিচয় তাঁর রচনায় ছড়িয়ে আছে। মেঘ ও রৌদ্রের লুকোচুরি খেলার সূক্ষ্মতম লীলা, হাওয়ার দোলা আর বৃক্ষের পত্রমর্মরের অব্যক্ত সংকেত, বর্ষার অবিশ্রাম ধারাপতনের প্রাণ-আনচান করা শব্দে সংবেদনশীল অন্তরে যে গূঢ়-গহন ভাবের অনুরণন জাগে, কবিতায় ও গানে তাকে আভাসিত করে তোলবার চেষ্টার মধ্য দিয়ে বোঝা যায় সৃষ্টিকর্মের বাইরে লোক-চক্ষুর অগোচর কবির যে জীবন, তা অবসরের আনন্দে কী নিশ্ছিদ্রভাবে ভরা ছিল। অবসরকে যদি তিনি কাজে না-ই খাটাবেন, তবে প্রকৃতির এই বিচিত্র নর্মলীলা এবং তার ঋতুবদলের নাট্যের এতো অজস্র খুঁটিনাটি তিনি পর্যবেক্ষণ করলেন কখন এবং কীভাবে? কবির অপরিসীম সৃষ্টিচাঞ্চল্যে ভরা অবসর-মুহূর্তগুলিই তাঁর সক্রিয় কাব্যজীবনের অপরিহার্য ভূমিকা রচনা করেছিল।

কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্টান্তও অনেক আছে। সব লেখকের সৃষ্টির প্রকরণ এক নয়। বিশেষ, বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে একাধিক জন আছেন যাঁদের ধারাধরন একেবারে উল্টো গোত্রের। ফরমায়েসের তাগিদ আর ব্যস্ততার অঙ্কুশ-তাড়না ছাড়া জীবনে এঁরা এক লাইনও লিখেছেন কিনা সন্দেহ। তাঁদের জীবনে অবসরের কোন ভূমিকা ছিল না, থাকলেও তাঁরা তার সদ্ব্যবহার করতে পারেননি। ক্রমাগত ঊর্ধ্বশ্বাসে নিরবচ্ছিন্ন যান্ত্রিকতায় অনবরত লিখে যাওয়াই ছিল তাঁদের সাহিত্যিক নিয়তি। অবশ্য তাই বলে তাঁদের সাহিত্যকর্ম যান্ত্রিকতামণ্ডিত ছিল না, ছিল তা লেখকভেদে কমবেশী উচ্চস্তরের সৃষ্টির লক্ষণে ভূষিত।

এই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে আমরা আলেকজাণ্ডার ডুমা, ব্যলজাক আর ডস্টয়েভ্‌স্কির নাম করতে পারি। ডুমা লিখতেন জানিয়ে-শুনিয়েই অর্থ-রোজগারের ধান্দায়, ব্যলজাক লিখতেন পাওনাদারের ঋণশোধের প্রাণান্তকর তাগিদে এবং কতক পরিমাণে রাজকীয় জাঁকজমকে থাকবার মোহবশতঃও

বটে। আর ডস্টয়েভ্স্কি ক্রমাগত লিখে গেছেন তাঁর জুয়ার নেশার মাশুল গোনবার চাপে পড়ে। শোনা যায় জুয়ার টেবিলে যে প্রচণ্ড ঋণ হয়েছিল তা শোধ করবার তাগিদে ডস্টয়েভ্স্কি এক পত্রিকা-সম্পাদকের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন, পত্রিকার কি সংখ্যায় 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট' উপন্যাসটি কিস্তি-ওয়ারীভাবে লিখে দেবেন ব'লে। বিশ্বসাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের জন্ম জুয়ার নেশার সূত্রে, ভাবতেও অবাক্ লাগে।

আপাতদৃষ্টিতে দেখলে, এই তিন লেখকের বেলাতেই অত্যন্ত স্থূল প্ররোচনা তাঁদের সাহিত্যসৃষ্টিতে প্রবৃত্ত করেছিল। কিন্তু এটা সৃষ্টিকর্মের বহিরঙ্গ-বিচার মাত্র, তার দ্বারা সৃষ্টিরহস্যের মূলে যাওয়া যায় না। লেখকের মনোজীবনকে বুঝতে তাঁর প্রাণমনের লীলায় আরও গভীরে প্রবেশ করা দরকার। হতে পারে বালজাক পাওনাদার ঠেকাবার জন্য লিখতেন বা ডস্টয়েভ্স্কি জুয়ার রসদ সংগ্রহের তাগিদে লিখতেন, কিন্তু তাঁদের লেখায় তো সেই বৈষয়িকতার ছাপ মোটেই দেখতে পাওয়া যায় না। সেখানে সৃষ্টির আনন্দ-উত্তেজনারই একাধিপত্য। বালজাক সম্বন্ধে শোনা যায়, তিনি রচনাকে নিখুঁত আর সর্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্যে কোন আয়াস-প্রয়াসই যথেষ্ট বলে মনে করতেন না। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গভীর যত্নে তিনি তাঁর রচনার সংশোধন কার্য করতেন—যতক্ষণ না তাঁর মন অনুমোদন করত ততক্ষণ তিনি তাঁর লেখা ধরে রাখতেন, ছাপতে দিতেন না। এরকমও শোনা যায়, বইয়ের প্রকাশ বাবদে পাবলিশারের কাছ থেকে তাঁর যে টাকা প্রাপ্য হত তার চেয়ে বেশী টাকা তাঁকে গুণে দিতে হত ছাপাখানাকে ক্রমাগত পাণ্ডুলিপি-পরিবর্তন আর প্রুফ-সংশোধন বাবদে অতিরিক্ত খরচের খাতে। এটা নিশ্চয়ই বৈষয়িকতার প্রমাণ নয়—গভীর শিল্প সচেতনতারই প্রমাণ।

আসলে পত্রিকা-সম্পাদকের ফরমায়েসই বলুন আর পাওনাদার কিংবা জুয়ার কর্জ শোধের তাগিদই বলুন, নিছক এই মানদণ্ডে বড় লেখকদের সৃষ্টিকর্মের বিচার করতে যাওয়ার মতো ভুল আর-কিছু হতে পারে না। এসব বাইরের অঙ্কুশ-তাড়না মাত্র, তাতে শক্তিমান লেখকের চলার বেগ আরও প্রাণবন্ত হয়, সচল হয়। ফরমায়েসের চাপে সেরা লেখার সৃষ্টি হয়েছে, বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে এমন নজীর ভুরি-ভুরি।

এবার পড়ুয়াদের প্রসঙ্গে আসা যাক। লেখাপড়ার চর্চাকারীদের মধ্যে এমন বহু লোক আছেন—তাঁদের সংখ্যা অগুনতি বললেও চলে—যাঁরা জীবনভোর শুধু পড়েই যান, কিন্তু পারতপক্ষে দোয়াতে কলম ডোবাতে চান না। এক কলম লিখতে হলেই প্রচণ্ড আলস্য এসে তাঁদের ভর করে। পড়তে

তাঁদের প্রকৃত আনন্দ, বস্তুতঃ এমন অনেক মানুষ দেখতে পাওয়া যায় যাঁরা এক মুহূর্ত বই ছাড়া থাকতে পারেন না। কিন্তু যা-ই এইসব গ্রন্থকীটদের দু-ছত্র লিখতে বলা হল অমনি যেন এঁদের মাথায় বাজ পড়ে। নানা ছলছুতোর লেখার দায় থেকে অব্যাহতি লাভ করে পুনরায় পড়ার কোটরে মুখ লুকোন।

ছলছুতোর মধ্যে একটি বহুবিদিত ছুতো হল, আগে পড়ে-শুনে তৈরী হওয়া যাক, তারপর রচনাকার্যে হাত দেওয়া যাবে। কিনা, লেখার কাজ অতিশয় দায়িত্বপূর্ণ, তার জন্য যে মানসিক প্রস্তুতি দরকার তা আগে অধিগত করে নিয়ে তারপর লেখায় হাত দিলে তবেই লেখার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব, নচেৎ নয়।

কিন্তু খতিয়ে দেখতে গেলে, এ আলস্যের কুমন্ত্রণা ভিন্ন আর কিছু নয়। কবে লিখে-পড়ে, গ্রন্থসমুদ্র মন্থন করে, নিজেকে সব দিক্ দিয়ে প্রস্তুত করে তুলব, তার পর রচনা-কর্মে আত্মনিয়োগ করব—এই করতে গেলে সারা জীবনে লেখা আর হয়েই উঠবে না। কথায় বলে, "গাইতে গাইতে গায়েন, বাজাতে বাজাতে বায়েন।" পড়তে পড়তেই লিখতে হবে, পাঠক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লেখক-জীবনের ভিত্ গড়ে তুলতে হবে। হয়তো প্রথম প্রথম লেখার মধ্যে অনেক অসম্পূর্ণতা থাকবে, অনেক ভুলভ্রান্তি থাকবে—কিন্তু লিখতে লিখতেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তার শোধন হতে থাকবে। লেখার অনলস চেষ্টা করাই লেখক হওয়ার শ্রেষ্ঠ ছাড়পত্র। কবে পড়েশুনে বিদ্যায় বুদ্ধিতে সর্বতোমুখী নৈপুণ্যের অধিকারী হব তার পর লেখায় হাত দেব—এই করতে গেলে আয়ু ফুরিয়ে যাবে, অনেক জীবনের আয়ুতেও ওই চৌকস হওয়ার অবস্থায় পৌঁছুনো যাবে না।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আর্নল্ড জোসেফ টয়েনবী এই-জাতীয় লিখন-বিমুখ নিখুঁত-বনবার-বাতিকওয়ালা গ্রন্থকীটদের দিনরাত বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকার অভ্যাসকে প্রশংসা তো করেনই নি, বরং তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। বইয়ের পাতায় মুখ-গুঁজে-পড়ে-থাকা লিখন-পরাঙ্মুখের দল এই বলে আত্মপক্ষ সমর্থন করবার চেষ্টা করেন যে, নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধির দীনতা সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে বিনয়ের বোধ আছে বলেই তাঁরা সহসা লেখায় হাত দিতে যান না। কিন্তু টয়েনবী এই যুক্তিকে মোটেই আমল দেননি। তাঁর মতে, এ নম্রতা তো নয়ই, বরং সম্পূর্ণ তার উল্টো। নম্রতার ছদ্মবেশে এর মধ্যে উগ্র রকমের অহংকার লুকিয়ে আছে। অহংকার, আর দায়িত্ব এড়াবার মনোবৃত্তি। কাজ-ফাঁকি-দেওয়া রূপ কর্মশৈথিল্য। **"An excuse for suspending the hard labour of intellectual activity".**

টয়েনবী তাঁর স্বীয় জীবনের ঘটনার উল্লেখ করে বলেছেন, নানা অভিজ্ঞতার প্রসাদে প্রথম যেদিন তাঁর উপলব্ধি হল যে, কাজই জীবনের সারাৎসার, সেটা তাঁর জীবনের এক সন্ধিলগ্ন। সেদিন থেকে পড়া নয়, লেখাতেই তিনি তাঁর সবচেয়ে বেশী মনোযোগ ও উদ্যম নিয়োগ করেছিলেন। তিনি এটা নিঃসংশয়েই উপলব্ধি করেছিলেন যে পড়ার কাজ যতোই বাঞ্ছিত আর আদরণীয় হোক, লেখার কাজ তার চেয়েও বহুগুণ বেশী কঠিন ও বহুগুণ বেশী সৃষ্টিলক্ষণাক্রান্ত। পড়ুয়া এই বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারেন যে, তাঁর কাজ বুদ্ধিবৃত্তি চালনার কাজ, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির কাজ হলেও তার মধ্যে কোথায় যেন একটা আলস্যের প্রশ্রয় আছে। মুদ্রিত অক্ষর পংক্তির উপর দিয়ে দৃষ্টিসঞ্চালন করে যেতে অভিনিবেশের প্রয়োজন হয় না। লেখায় শেষোক্ত উদ্যমের প্রয়োজন পদে পদে। সুতরাং দুইয়ের ভিতর কোন তুলনাই চলতে পারে না।

ইংরেজীতে একটা কথাই আছে যে, 'Writing makes a man perfect', লেখা মানুষের ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ করে। কেন এই কথা বলা হয়? বলা হয় এইজন্য যে, লিখনচর্চার মধ্য দিয়ে ভাবনার জট খুলে যায়, অস্পষ্ট চিন্তা স্পষ্টীকৃত হয়, চিন্তাকে গুছিয়ে লিখবার শিল্প আয়ত্ত করবার চেষ্টা করতে করতে সেইসঙ্গে বলার শিল্পও অবলীলাক্রমে আয়ত্ত হয়ে যায় এবং বলার কৌশল অধিগত হবার সঙ্গে ব্যক্তিত্বের গোত্রবদল হতে শুরু করে। আমাদের চিন্তার মধ্যে যে কত অস্বচ্ছতা, কত অস্পষ্টতা লুকিয়ে থাকে তা কাগজের পৃষ্ঠায় চিন্তা লিপিবদ্ধ করবার চেষ্টার আগে পর্যন্ত আমরা টের পাই না। যা-ই লিখতে বসি তখন বুঝি, মনোগত ভাবনা-চিন্তাকে লেখায় প্রাঞ্জলভাবে পরিবেশন করা কী শক্ত ব্যাপার। লিখতে না বসা পর্যন্ত ভাবনার আড়মোড় সহজে ভাঙে না, তার কোণা ও ভাঁজগুলি মসৃণ হয় না— যতই কেন না আমরা এই অগ্রিম আত্মপ্রসাদকে প্রশ্রয় দিই যে, লেখবার উপকরণরূপে আমি মনে-মনে যা ভেবে রেখেছি তা সর্বাঙ্গসুন্দর, সর্বব্যাপক, সর্বত্রুটিমুক্ত। কিন্তু লিখতে গিয়েই দেখি ওই আত্মপ্রসাদের কোন ভিত্তি নেই, চিন্তার মধ্যে কত যে ত্রুটিবিচ্যুতি লুকিয়ে ছিল তার আর সীমাসংখ্যা নেই। তাসের ঘরের মতোই তখন সে আত্মপ্রসাদের সৌধ ভেঙে পড়ে।

উচ্চ চিন্তা, উচ্চ ভাব নিরন্তর মনের ভিতর মন্থন করলে ব্যক্তিত্বের উপর তার ছাপ পড়ে, ব্যক্তিত্ব পরিশুদ্ধ হয়। চিন্তাকে বৈজ্ঞানিক আর শিল্পসম্মত পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করবার চেষ্টা করলে চিন্তার শ্লথতা ও আলস্য, যুক্তির অসংগতি, চিন্তার ধোঁয়াটেপনা ইত্যাদি শতবিধ দোষ দূর হয়। এই প্রক্রিয়ার

অনুশীলন হতে হতে শেষ অবধি এমন একটা অবস্থা আসে যখন লেখকের ব্যক্তিত্বেরই গোত্রবদল হয়ে যায়, যার কথা পূর্বেই বলেছি।

পড়ুয়াদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা পঠিত বই বা রচনার সম্পর্কে অনলীলায়িত সমালোচনায় প্রলুব্ধ হন। সমালোচনার মাধ্যমে এমন একটা ভাব প্রকাশ করেন যেন তাঁদের ওই বই বা রচনা যদি লিখতে বলা হত তা হলে এর চেয়ে ঢের ঢের নিপুণভাবে তাঁরা সেটা লিখতে পারতেন। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই এটা আত্মস্তোক ভিন্ন আর কিছু নয়। লিখতে বসলেই বুঝতে পারতেন কত ধানে কত চাল হয়। কোন-কিছু মনে ভাবা এক কথা আর তাকে কলমের মুখে প্রকাশ করা আর-এক কথা। সাহিত্যশিল্পে রূপ-কর্ম বা externalization-এর কাজকে যে এত গুরুত্ব দেওয়া হয় তা এই-জন্যই দেওয়া হয় যে, মনের আকাশে অস্পষ্ট নীহারিকাপুঞ্জ রূপে ভাসমান ভাবনা-চিন্তার বিশেষ কোন দাম নেই যতক্ষণ না তাদের সুস্পষ্ট জ্যোতিঃদেহ রূপে সুগঠিত ও সুসংহত করা হচ্ছে। লেখায় এই বাঞ্ছিত কাজটি সাধিত হয়, তাই তার এত মূল্য।

অনবরত বই পড়া, না-খেয়ে দেয়ে কেবলই বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে থাকা, বইয়ের পর বই ক্রমাগত শেষ করে যাওয়া—বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার নামে এ আসলে এক ধরনের আলস্যের ব্যায়াম মাত্র। আলস্যের ব্যায়াম এ-কারণে বলছি যে, এতে পড়ুয়ার মন মুদ্রিত অক্ষর-পংক্তিসজ্জার উপর উপর ছুঁয়ে যায় মাত্র, চিন্তা কোথাও সংহত হবার বা দানা বাঁধবার অবকাশ পায় না। পড়ার কাজ পরিশ্রমের কাজ বটে, কিন্তু যদি তার পিছনে সুস্পষ্ট কোন লক্ষ্যের দ্যোতনা না থাকে তা হলে সে পরিশ্রম লঘু পরিশ্রমের কোঠায় গিয়ে পড়ে—এমন পরিশ্রম যা করতে চিত্তের সমস্ত বৃত্তিকে সংহত করতে হয় না, যার জন্য তাবৎ উদ্যমকে একমুখী করবার প্রয়োজন হয় না। লেখাপড়া জানার প্রাথমিক বাধা উত্তীর্ণ এবং জ্ঞানের একটা স্বাভাবিক তৃষ্ণার অধিকারী হলে অনেকেই এই-জাতীয় পড়ুয়া-বৃত্তিতে, বিশেষ আয়াস স্বীকার না করেই অনেক দূর অগ্রসর হতে পারেন। আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে বসে বা বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে বইয়ের অক্ষরপংক্তির উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে যাওয়া এমন কি কঠিন কাজ? এমনতর পড়ুয়াবৃত্তির দ্বারা প্রকৃত বিদ্বানের স্বরূপ নির্ণীত হয় না, হওয়া উচিতও নয়।

জ্ঞানী ব্যক্তিরা বই-পড়ার চেয়েও সুগ্রথিত চিন্তার অভ্যাসকে বেশী মূল্য দেন। আবার চিন্তার অভ্যাসের চেয়েও অনেক বেশী মূল্যবান হল চিন্তা লিপিবদ্ধ

করবার অভ্যাস। কোন ব্যক্তি প্রকৃতই বিদ্বান কিনা তা বোঝবার উপায় তাঁর পঠিত গ্রন্থরাজির পরিমাণের নিরূপণ নয়, তিনি দেশবাসীকে সুগঠিত চিন্তার আকারে কতটা কী দিয়েছেন তার নির্ণয়। অনেক সময় এ রকমের এক-একটা 'মীথ' বা কিংবদন্তী বাজারে চালু হতে দেখা যায়, অমুক ব্যক্তি মস্ত বড়ো বিদ্বান জাঁদরেল, তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে গিয়ে দেখ বইয়ে বইয়ে আলমারী ঠাসা, দিনরাত তিনি বই পড়ায় নিবিষ্ট হয়ে আছেন তো আছেনই, মহাদেবের ধ্যান ভাঙানোর চাইতেও তাঁর পুস্তক-পাঠের ধ্যান ভাঙানো কঠিন। কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করা যায় তাঁর এই পর্বতপ্রমাণ পুস্তক-পাঠের সুফলরূপে তিনি দেশবাসীকে কী জিনিস উপহার দিয়েছেন, তা হলে দেখা যাবে যে ওই ক্ষেত্রে ফল শূন্য। এমনতর অসার বিদ্যাবত্তা দিয়ে আমাদের কী লাভ, যে বিদ্যাবত্তা প্রায়োগিক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ, সৃষ্টিশীল মৌলিক তৎপরতায় চেষ্টারহিত? কার্যক্ষেত্রে অধীত বিদ্যার পরীক্ষা-নিরীক্ষাই যদি না হল তো তেমন বিদ্যার কী সার্থকতা? অথচ, বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এ-জাতীয় অপরীক্ষিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিদ্বানের সংখ্যাই বেশী। তাঁদের চিন্তা কী, বক্তব্য কী, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী কী, দেশ তার কিছুই জানল না, শুধু মুখে মুখে প্রচার এমন বিদ্বান আর হয় না। নিছক পড়ুয়াবৃত্তি-সার এমন নিষ্ফল বিদ্বান দিয়ে আমাদের কাজ নেই। দূর থেকেই তাঁদের দণ্ডবৎ করি।

যে সকল মজ্জাগত গ্রন্থকীট সমস্ত বিদ্যা অধিগত করার পর বই লিখবেন বলে মনে মনে স্থির করে বসে আছেন, তাঁদের অহংকার অতি প্রচণ্ড। যেন চেষ্টা করলেই সমস্ত বিদ্যা এক জীবনে অধিগত করা যায়। এই সব সর্বাঙ্গ-সুন্দরতার বাতিকগ্রস্ত পড়ুয়াদের কে বোঝাবে যে, সকল প্রকারের বিদ্যা এক জীবনে কেন, বহু শত জীবনেও অধিগত করা যায় না? বরং জ্ঞানের পথে যত অগ্রসর হওয়া যায় তত এই বিনম্র বোধ বাড়তে থাকে যে, আমরা কত কম জানি এবং সারা জীবন চেষ্টা করলেও জ্ঞানের সামান্য অংশই মাত্র জানতে পারি। (নিউটনের জ্ঞানসমুদ্রের তীরে নুড়ি কুড়ানোর উপমাটা এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।) তবে কেন এই সর্ববিদ্যাকল্পদ্রুম হওয়ার অসম্ভব, অবিশ্বাস্য, হাস্যকর চেষ্টা? তার চেয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কাজেও লিপ্ত হওয়ার উদ্যোগ করা উচিত নয় কি?—লেখার কাজ, বিদ্যাদানের কাজ, বক্তব্য ও ভাবপ্রচারের কাজ?

আসলে টয়েনবীর এ কথাই যথার্থ যে, সর্ববিদ্যাবিশারদ হওয়ার চেষ্টা, খতিয়ে দেখলে, দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টার নামান্তর। এ আলস্যের ছলনা,

অহংকারের ছদ্মবেশ। লেখা যাঁরা ভালবাসেন, তাঁরা কখনই যেন এই কাঁক-ফাঁকি-দেওয়া বিদ্যার কুহকে না মজেন।

লিখিয়ে এবং পড়ুয়ার আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি নিছক লিখিয়ে হওয়াটা যেমন আদর্শ অবস্থা নয়, তেমনি নিছক পড়ুয়া হওয়াটা কোন কাজের কথা নয়। এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য হলে তবেই সেটা বাঞ্ছিত অবস্থা হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ সার্থক লেখার ভূমিকা হিসাবে চাই অবসর ও আলস্যের অগোচর প্রস্তুতি; আবার সার্থক পড়ুয়া হতে হলে চাই অধ্যয়ননিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে রচনারও অনুশীলন। প্রথমের বেলায় শর্তাধীন আলস্য অভিনন্দনযোগ্য; দ্বিতীয়ের বেলায় আলস্য ঝেড়ে ফেলে সৃষ্টিশীল কাজে লিপ্ত হওয়াটাই পন্থা। আমাদের এই মন্তব্য প্রথম দৃষ্টিতে আপাতবিরোধময় বলে মনে হতে পারে, কিন্তু লিখিয়ে এবং পড়ুয়ার কাজের প্রকৃতি বিচার করলেই আর এ মন্তব্য বিরোধাভাসযুক্ত বলে মনে হবে না। মন্তব্যটিতে দুই কাজের ত্রুটি দূর করে দুইয়ের গুণ সমন্বিত করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

লিখিয়ে এবং পড়িয়ে ছাড়া আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা লিখতেও চান না, পড়তেও চান না, তাঁরা সরস বাক্যালাপের দ্বারা মানুষের হৃদয়মন জয় করতে চান। এঁরা প্রায়শঃই হন সফল সংলাপকুশল, কথোপকথনশিল্পী, ইংরেজীতে যাকে বলে conversationalist বা table talker। বাক্যের সাহায্যে উত্তর প্রত্যুত্তরদান ক্ষমতার এঁরা হন সিদ্ধশিল্পী -repartee ও retort-এ এঁদের জুড়ি খুঁজে পাওয়া যায় না। লেখা বা পড়া দুটিই আয়াসসাধ্য কাজ, তার ধারে কাছে এঁরা ঘেঁষেন না; পরিবর্তে সহজে চিত্তজয়ের যে পথটি এঁরা বেছে নিয়েছেন তাতেই সমগ্র উদ্যম কেন্দ্রীভূত করেন। এঁরা সস্তায় কিস্তিমাতের শিল্পী, আয়াস প্রয়াসে বিশ্বাস এঁদের কম। এঁদের মনে প্রায়শঃ যে ভাব বিরাজ করে ডক্টর জনসন তাঁর একটি লেখায় তাকে ব্যক্ত করেছেন এইভাবে—

Perhaps no kind of superiority is more flattering or alluring than that which is conferred by the powers of conversation, by extemporaneous sprightliness of fancy, copiousness of language, and fertility of sentiment—অর্থাৎ সংলাপের শক্তি, স্বতঃস্ফূর্ত হৃষ্ট কল্পনাকুশলতা, বাক্যের অজস্রতা আর ভাবাবেগের উর্বরতা—এগুলির দ্বারা যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা যায় আর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্বই বুঝি তার চেয়ে আত্মতুষ্টিকর বা লোভনীয় নয়। এই ভাবটিকে বিস্তার করে জনসন তার পরেই বলেছেন যে, প্রতিভা প্রয়োগের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রশংসার

বেশীর ভাগই থাকে অজানা ও অপ্রাপ্ত, প্রশংসা পাওয়া গেলেও তাকে চোখে দেখা যায় না বা ভোগ করা যায় না। যেমন লেখক যিনি তিনি বিস্তৃত ক্ষেত্র জুড়ে তাঁর নাম বিস্তার করেন কিন্তু তাঁর এই নামের সুফল তিনি প্রত্যক্ষভাবে সামান্যই ভোগ করতে পান, নাম থেকে ফায়দা উঠানো তো আরও পরের কথা। তিনি এমন এক বিশাল রাজ্যের মালিক যে রাজ্যের প্রজাদের উপর তাঁর প্রভুত্ব নামমাত্র এবং যে রাজ্যের প্রজাদের রাজাকে শুল্ক দিতে হয় না। কিন্তু সংলাপকুশল বা ব্যঙ্গরসিক যিনি, তাঁর কথা স্বতন্ত্র। তাঁর সবকিছুই হাতে হাতে নগদ বিদায়ের তুল্য আশু প্রাপ্তি—কোন কিছুই কালকের জন্য বা দূরের জন্য ফেলে রাখা নয়। তাঁর সকল কৃতিত্বের দীপ্তি তাঁরই উপর প্রতিফলিত, যে আনন্দ তিনি লোককে বিলান সে আনন্দের চতুর্গুণ তিনি নিজের দিকে আকর্ষণ করেন; তিনি এই দেখে আত্মসন্তুষ্টি লাভ করেন যে তাঁর শক্তি লোকে অপ্রতিবাদে স্বীকার করে নিচ্ছে, তাঁর প্রতি বন্ধুত্বের আবেগ উচ্ছ্বাসে রূপান্তরিত হচ্ছে, মনোযোগ প্রশংসায় ফেটে পড়ছে।

একেই বলে ধার দিয়ে সুদে আসলে আদায়। জনসন এমন কথা বলতেই পারেন, কারণ তিনি স্বয়ং ছিলেন এক দুর্ধর্ষ সংলাপশিল্পী। তাঁর মুখনিঃসৃত বাক্য শোনবার জন্য সর্বদা লোক তাঁর চারপাশে ঘিরে থাকত। উত্তর প্রত্যুত্তরের শিল্পের তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় শিল্পী। তা বলে এমন মনে করবার কারণ নেই যে, তিনি কেবল নগদ বিদায়ের নীতিতেই বিশ্বাস করতেন। যে ডক্টর জনসন আলাপ আলোচনার টেবিলে শ্রোতাকে বুদ্ধির জৌলুষে মাতিয়ে রাখতেন সেই ডক্টর জনসনই কঠিন পরিশ্রমে *A Dictionary of the English Language* (১৭৫৫) ও দশ খণ্ড *Lives of the Poets* (১৭৭৯-৮১) লিখেছিলেন। এই অমিতশক্তিধর প্রচণ্ড পরিশ্রমী বিদ্বান লেখকের বেলায় সাবলীল কথোপকথনের দ্বারা আসর জমানো অবসরবিনোদন বা বিশ্রামেরই একটা রকমফের ছিল মাত্র, যা সার্থক লেখকমাত্রের পক্ষেই অপরিহার্য।

আত্মভাবী রচনা

সুরসিক লেখক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী লঘু চালের প্রবন্ধকে "আত্মভাবী রচনা" আখ্যা দিয়েছেন। আত্মভাবী অর্থাৎ সাবজেক্টিভ, অর্থাৎ এমন গদ্যরচনা যার মধ্যে লেখকের একান্ত ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন-কামনা প্রবন্ধের আঙ্গিকে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এতাবৎ বাংলায় প্রবন্ধ সাহিত্যের যে শাখাকে "রম্যরচনা" নামে অভিহিত করে আসা হচ্ছিল, তারই একটি সুন্দর রূপান্তরিত নাম "আত্মভাবী রচনা"। রম্যরচনা কথার চেয়ে এ কথাটি সুন্দর ও অধিক সুপ্রযুক্ত এইজন্য যে, সাহিত্যের সব বিষয়ই তো রম্য, পাঠকের মনে রম্যতার বোধ জাগাবার জন্যেই তো সাহিত্য, কাজেই আলাদা করে সাহিত্যের বিশেষ কোন এক বিভাগকে রম্য নামে চিহ্নিত করার যৌক্তিকতা দেখা যায় না। শব্দটির দ্যোতনা ব্যাপক, জোর করে তার অর্থপ্রসারের সংকোচন ঘটালে তার অর্থেরও বদল হয়ে যায়। সুতরাং ফরাসী *belles-lettres* কিংবা ইংরেজী *personal essay*-র বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে তাদেরই প্রায় সম-অর্থবহনকারী শব্দ 'আত্মভাবী রচনা' কথাটি আমরা এখানে ব্যবহার করব। 'আত্মভাবী'র স্থলে কেউ কেউ ব্যবহার করেন 'আত্মগৌরবী', তবে 'আত্মভাবী' কথাটাই অধিক ভাবপ্রকাশক বলে মনে হয়।

প্রবন্ধের দুই স্বীকৃত বিভাগ: এক বিষয়মুখ্য, তথ্যাশ্রয়ী কিংবা তত্ত্বগম্ভীর প্রবন্ধ; দুই, লঘু মনস্ক স্বচ্ছন্দচারী ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রবন্ধ। এই শেষোক্ত জাতের প্রবন্ধই আজকে আমার আলোচ্য বিষয়। বাংলা ভাষায় এই দুই জাতের প্রবন্ধেরই ঐতিহ্য আছে, তবে তুলনায় বিষয়মুখ্য, তথ্য বা তত্ত্বভিত্তিক প্রবন্ধের পরিমাণ সমধিক গুরু। এর একটা কারণ এই হতে পারে যে, বাঙালী মুখ্যতঃ কবির জাত হলেও, সাংখ্য ও নব্যন্যায়ের দ্বারা কর্ষিত এই বাংলাদেশে যুক্তির আবাদ বড়ো কম হয়নি। গোটা উনিশ শতকটাই তো হল বাঙালীর যুক্তিচর্চার কাল। ফলে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যে বিষয়ের, তথ্যের, তত্ত্বের একটা সুস্পষ্ট ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে দীর্ঘদিনের যুক্তিচর্চার ফলে। বাঙালী গদ্যলেখকেরা কাব্যকে কাব্যের ক্ষেত্রে রেখে গদ্যে গদ্যেরই চাল মূলতঃ অনুসরণ করায় বিষয়মুখ্য রচনার ধারাটাই স্বভাবতঃ সমধিক পুষ্ট হয়ে উঠেছে। আত্মভাবী রচনা যেহেতু ব্যক্তিকেন্দ্রিক সেই হেতু কতক পরিমাণে কাব্যঘেঁষা। ব্যক্তিমনের সুখদুঃখের কথায় কবিতার আমেজ না লেগেই পারে না। কিন্তু প্রায় সহস্র

সংসদের একনিবিষ্ট কাব্যের অনুশীলন, বিশেষ, বৈষ্ণব কাব্যের সুসমৃদ্ধ সঞ্চয়, যে-কাব্যসাধনার পশ্চাতে একটি শক্তিশালী প্রভাবপটরূপে সদা-বিলম্বিত আছে, সেই সাধনার সমস্ত বল, আবেগ আর নিষ্ঠা আধুনিক কালে কাব্যক্ষেত্রকে কেন্দ্র করেই এমন উদ্যাগ্রিকভাবে আবর্তিত হয়েছে যে, কবিতার গণ্ডের সীমানায় উপচে পড়ার আর তেমন অবসর মেলেনি। কবিদের প্রকাশ-আকুলতা সবটা কবিতার খাতেই বয়েছে, গদ্যের জন্য তার ছিটেফোঁটাই মাত্র অবশিষ্ট থেকেছে।

বাংলা ভাষায় আত্মভাষী রচনার সংস্কার এই হেতু দুর্বল। ফরাসী কিংবা ইংরেজী সাহিত্যে কিন্তু এই সংস্কার অতিশয় প্রবল। মতেঁন (১৫৩৩—৯২) ফরাসী সাহিত্যে এই ধারার গদ্য রচনার প্রবর্তক। তিনি বলতেন বিষয় যা-ই হোক নিজের কথা নিজের মতো করে ব্যক্ত করতে পারাটাই একটা শিল্প। সেই শিল্পেরই প্রমাণ বহন করছে তার মিতবাক্ ধীরস্থির চালে লেখা প্রজ্ঞার দ্যুতি ছিটানো ব্যক্তিগত প্রবন্ধগুলি। তাঁর রচনার ভঙ্গীতে ছিল একটি আত্মকেন্দ্রিক কিন্তু সংশয়াপন্ন বিনীত ভঙ্গী। *Que-sais-je* অর্থাৎ 'আমি আর কি জানি ?' গোছের সক্রেটিশসুলভ জ্ঞানী মনোভাব তাঁর সমগ্র রচনাদেহকে আচ্ছাদন করে আছে। মতেঁনের অনতিকাল পরে ইংলণ্ডের সাহিত্যে বেকনের (১৫৬১—১৬২৬) আবির্ভাব। তিনি ইংরেজী সাহিত্যে ব্যক্তিগত প্রবন্ধের জনকরূপে কথিত। বেকন ছিলেন দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিক ; তাঁর মূল গ্রন্থগুলি ল্যাটিন ভাষায় লেখা। কিন্তু কখনও কখনও স্বাদবদলের উপায়রূপে, এবং অবসরবিনোদনেরও প্রক্রিয়া হিসাবে, তিনি ইংরেজীতে হাল্কা সুরে তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধি ভাবনা ধারণা ইত্যাদির বিষয়ে লিখতেন। তারই থেকে জন্ম নেয় 'পার্সোনাল এসে' নামক ইংরেজী সাহিত্যের সুচিহ্নিত বিভাগ।

বেকনের পরে আরও বহু বহু ইংরেজ লেখক এই ধারার রচনায় হাত মক্সো করেছেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা রচনার বৈশিষ্ট্যগুণে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন তাঁদের কয়জন হলেন –অ্যাডিসন, স্টিল, সুইফট, ড্রাইডেন, চার্লস ল্যাম্ব, হ্যাজলিট, ডি-কুইন্সি, গোল্ডস্মিথ, রবার্ট লুই স্টিভেনসন, জি. কে চেস্টারটন, হিলেয়ার বেলক, ম্যাক্স বীরবোম, ই. ভি. লুকাস, রবার্ট লীণ্ড, গার্ডনার, স্টিফেন লীকক প্রভৃতি। লেখকতালিকা থেকে দেখা যায়, ইংরেজী সাহিত্যের এই কালেই 'পার্সোনাল এসে' সাহিত্যের চর্চা হয়েছে সবচেয়ে বেশী। বস্তুতঃ সব দেশের আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধেই এ কথাটা খাটে। বাংলা সাহিত্যের বেলায়ও আত্মভাষী রচনার ফসল এই কালেই বেশী উঠেছে।

সে যাই হোক, ইংরেজী ব্যক্তিগত প্রবন্ধের লেখকদের মধ্যে বেকনের পরেই

চার্লস ল্যাম্বের নাম। এর কারণও আছে। ল্যাম্ব তাঁর জীবনের সমস্ত বিষাদ আবেগ প্রক্ষোভ (তাঁর ব্যক্তিজীবন দুঃখময় ছিল) আশা ও হতাশা পুলক ও বেদনা তাঁর *Essays of Elia* নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলিতে ঢেলে দিয়েছিলেন। এমন আন্তরিক সুর আর কারও লেখায় লাগেনি। ল্যাম্ব অন্যান্য জাতের রচনা লিখলেও, ব্যক্তিগত প্রবন্ধই ছিল তাঁর আত্মপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম, সুতরাং তাকে কেন্দ্র করেই তাঁর সৃষ্টির আবেগ সর্বাধিক স্ফুরিত হয়েছিল। ঠিক ল্যাম্বের ধারার অনুবর্তী লেখক পরে আর বিশেষ কেউ জন্মাননি, তবে তির্যক ভঙ্গীর বক্রোক্তিজীবিত লেখায় চেস্টারটন, বেলক, লীও প্রমুখরা বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দেন।

বাংলা ভাষায় আত্মভাবী রচনার সূত্রপাত বঙ্কিমচন্দ্র থেকে। বঙ্কিমের 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'লোকরহস্য', 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' প্রভৃতি এই শ্রেণীর রচনার অন্তর্গত। 'কমলাকান্তের দপ্তরের' অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলি বাঙালী জাতীয়তার চেতনার উদ্বোধন এবং বাঙালী 'বাবু' সমাজের পরানুকরণস্পৃহা, ইঙ্গবঙ্গীয় রীতির দাম্ভিকতা, আলস্যবিলাস প্রভৃতি শতাবিধ ত্রুটিবিচ্যুতির সমালোচনার উদ্দেশ্যে লিখিত হলেও, যে ভাষায় ও ভঙ্গিতে সেগুলি লিখিত হয়েছিল তাতে হাল্কা সুরের আমেজ লেগেছিল। হাল্কা সুর এবং আত্মভাবী সুর। কমলাকান্ত অহিফেনসেবী দরিদ্র ব্রাহ্মণ, অহিফেনের অনুপান দুগ্ধের যোগানের জন্য তাঁকে প্রসন্ন গোয়ালিনীর দেবদ্বিজে ভক্তি আর দাক্ষিণ্যের উপরে নির্ভর করতে হয়। কমলাকান্তের সহকারীটির নাম ভীষ্মদেব খোসনবিশ। এই তিনের অনুষঙ্গে নানা কৌতুককর পরিবেশ এবং নানা রহস্যালাপের উপলক্ষ সৃষ্টি করে রচনাগুলিতে যে সব কথালাপ পরিবেশিত হয়েছে তা একান্তভাবে লেখকের ব্যক্তিত্বের সুরভিতে সুরভিত। অনেকে বলেন 'কমলাকান্তের দপ্তর' ডি-কুইন্সির '*The Confessions of an Opium-eater*' গ্রন্থের ছায়ায় লিখিত। এ কথা সত্য হতেও পারে, নাও হতে পারে। সত্য হলেও কিছু আসে-যায় না। কেননা, বঙ্কিম বিদেশী ভঙ্গী যা-ই এবং যতটুকুই গ্রহণ করে থাকুন না কেন, তাকে যুগপৎ স্বকীয় প্রতিভার দ্যুতিতে ভাস্বর এবং বাঙালীত্বের জারকরসে জারিত করে এমনভাবে পরিবেশন করেছিলেন যে তার গোত্রলক্ষণ বদলে গিয়েছিল, তা সম্পূর্ণ তাঁর নিজের সৃষ্টি হয়ে উঠেছিল।

বঙ্কিমের সমসাময়িক কালে আরও দু'জন এই ধারার রচনার অনুশীলন করেছিলেন। তাঁরা হলেন—কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগরের 'প্রভাত চিন্তা', 'নিশীথ চিন্তা', 'নিভৃত চিন্তা'

প্রভৃতি গ্রন্থ এবং চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'উদ্‌ভ্রান্তের প্রেম' ইংরেজী 'পার্সোনাল' বা 'ফ্যামিলিয়ার এসে'-র বঙ্গীয় সংস্করণ বলা যেতে পারে। কিন্তু এই বইগুলির রচনাদর্শ পরবর্তী কালে বিশেষ দাগ রেখে যেতে পারেনি। তার কারণ দুইয়ের রচনাই ভাবাবেগের আতিশয্যমণ্ডিত। অবশ্য কালীপ্রসন্নের বেলায় ভাবাতিরেক ঘনঘটাময় ধ্বনি-গম্ভীর সংস্কৃত শব্দের আধিক্যে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হলেও চন্দ্রশেখরের ক্ষেত্রে সে রকম কোন নিয়ন্ত্রক-শক্তি ছিল না। উদ্‌ভ্রান্তের প্রেম বাস্তবিকই উদ্‌ভ্রান্ত—পত্নী-বিয়োগের মর্মান্তিক কিন্তু নিতান্ত ব্যক্তিগত ট্রাজিডিকে নিজের মধ্যে ধরে না রেখে তিনি প্রকাশ্যে এমনভাবে বিলাপমুখর হয়ে উঠেছেন যে ওই শোকাকুল ঘটনার বেদনার গাঢ়তাকে ছাপিয়ে তার ভাবালুতার উচ্ছ্বাসটাই যেন পাঠকের মনের তটে এসে বেশী ঘা দেয়।

উনিশ শতকে আত্মভাবী রচনায় আর তেমন কোন উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় না। তারপরেই বিশ শতকের প্রারম্ভভাগে এসে উপনীত হই, যে কালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের অন্তর্গত নিবন্ধগুলি রচনা করেছিলেন। 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এ "বাজে কথা" বলে একটি নিবন্ধ আছে। সেইটিকে ওই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যের সংকেতবাহী মনে করতে পারা যায়। নিবন্ধটির আরম্ভ এইরূপ :

"অন্য খরচের চেয়ে বাজে খরচেই মানুষকে যথার্থ চেনা যায়। কারণ, মানুষ তখন ব্যয় করে নিজের খেয়ালে।"

"যেমন বাজে খরচ তেমনি বাজে কথা। বাজে কথাতেই মানুষ আপনাকে ধরা দেয়।"

সুতরাং 'বাজে কথা' বলে বাজে কথাকে উড়িয়ে দেবার যো নেই। রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থের ভূমিকাতেও অনুরূপ ভাবের কথা বলেছেন। যেমন,

> "এই গ্রন্থের পরিচয় আছে 'বাজে কথা' প্রবন্ধে। অর্থাৎ ইহার যদি কোনো মূল্য থাকে তাহা বিষয়বস্তুগৌরবে নয়, রচনারসসম্ভোগে।"

'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এর সব প্রবন্ধই অবশ্য সমান হাল্কা চালের নয়। নববর্ষা, বসন্তযাপন, কেকাধ্বনি, পাগল, সোনার কাঠি, ছবির অঙ্গ, শরৎ প্রভৃতি প্রবন্ধ ভাবুকতাধর্মী, চিন্তাদীপ্ত, কতকাংশে বা বর্ণনাত্মক -অন্যপক্ষে, বাজে কথা, পরনিন্দা, পনেরো আনা, নানাকথা, ছোটোনাগপুর, পথেপ্রান্তে, লাইব্রেরী প্রভৃতি নিবন্ধের মধ্যে আছে অপ্রয়োজনের কিন্তু সৌন্দর্যময় কথার আশ্রয়ে লঘুপক্ষ ভাবনার স্বচ্ছন্দ বিহার। এই প্রবন্ধগুলিতেই বিশেষভাবে আত্মভাবী

রচনার সুর লেগেছে। পরিতাপের বিষয়, কবিগুরু পরে আর এই জাতীয় নিবন্ধ বেশী লেখেননি। সাহিত্যের এই শাখাটিকে ইচ্ছা করলেই তিনি তাঁর প্রতিভার জাদুদণ্ডস্পর্শে পত্রপুষ্পের শোভায় মুঞ্জরিত করতে পারতেন কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক, এই শাখাটি তাঁর তেমন মনোযোগ লাভ করতে পারেনি। তাঁর সহস্রধারে উচ্ছ্বসিত পত্রসাহিত্যের বিশাল বিস্তারের মধ্যে অবশ্য মাঝে মাঝেই আত্মভাবী চিন্তার শীকরকণা ঝিলিক দিয়ে গেছে (যেমন 'ছিন্নপত্র', 'জাপানযাত্রী', 'যাত্রী', 'ভানুসিংহের পত্রাবলী', 'পথ ও পথের প্রান্তে' প্রভৃতি পত্রগ্রন্থের নানা স্বগতোক্তি-মূলক অংশ), কিন্তু আলাদা করে আর তিনি এ-জাতীয় নিবন্ধে লেখনীক্ষেপ করেননি।

আত্মভাবী রচনার ফসল সবচেয়ে বেশী ফলেছে, যে কথা আগেই বলেছি, আধুনিক কালে—রবীন্দ্রনাথের পরে যে যুগের শুরু হয়েছে সেই সময়ে। প্রমথ চৌধুরীর বীরবলী রচনায় এর সূত্রপাত, তার পর একে একে চারুচন্দ্র রায় (চন্দননগর), প্রমথনাথ বিশী, অন্নদাশঙ্কর রায়, পরিমল গোস্বামী, বুদ্ধদেব বসু, জ্যোতির্ময় রায়, পরিমল রায়, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, যাযাবর, অজিত দত্ত, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (ইন্দ্রজিৎ), সৈয়দ মুজতবা আলী, 'রঞ্জন', 'সুনন্দ' প্রমুখ লেখকগণ এই ধারার রচনায় বিশেষ কুশলতার পরিচয় দেন। আচার্য প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধে, ছোট গল্পে, 'সবুজ পত্র'-এর সম্পাদকীয় মন্তব্যাদিতে নামতঃ না হলেও কার্যতঃ অনেক জায়গায় আত্মভাবী রচনাদর্শ ছড়িয়ে আছে। বীরবলী 'উইট্' (রসরসিকতা), 'পান্' (শব্দসাদৃশ্যগত অলঙ্কার), 'ব্যাণ্টার' (শ্লেষ) ইত্যাদি আজও বাঙালী লেখককুলের অনুশীলনের বিষয় হয়ে আছে। অধুনাবিস্মৃত চারুচন্দ্র রায় (শিল্পী চারু রায় নন) এক সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের ধরনে একখানি আত্মভাবী রচনাসংগ্রহ প্রচার করেছিলেন, সে গ্রন্থ আজ আর পাওয়া যায় না। প্রমথনাথ বিশী একজন শক্তিশালী সব্যসাচী লেখক—নানামুখে তাঁর লেখন-প্রতিভার বিস্তার লক্ষ্য করা যায়। যদিও সংজ্ঞার্থে আত্মভাবী রচনা তিনি কমই লিখেছেন, তবে তাঁর সংবাদপত্রে নিয়মিত-প্রকাশিত 'কমলাকান্তের আসর' নামধেয় রচনাগুলিতে প্রায়ই এই রচনার ছাঁচ দেখতে পাওয়া যায়। 'কমলকান্তের আসর' নামকরণের মধ্যেই রচনাগুলির প্রেরণার উৎস আবিষ্কার করা যায়। প্রমথনাথ সুরসিক, ব্যঙ্গপ্রবণ, প্যারাডক্সের ধরনে বাক্য-ব্যবহারে ওস্তাদ। কমলাকান্তীয় অনেক গুণ তাঁর লেখায় বর্তিয়েছে কিন্তু পূর্বসূরীর গভীর ভাবোদ্দীপনা, আবেগাকুলতা উত্তরসূরীর রচনাবৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত নয়, সে কথা

স্বীকার করতেই হবে। তাছাড়া, সর্বপ্রকার প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রতি তিনি অহেতুক খড়্গহস্ত ; এরও কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।

অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমথ চৌধুরীর শিষ্যস্থানীয় লেখক। তাঁর 'বিনুর বই' আত্মকথার ছলে আত্মভাবী রচনায় একটি সুন্দর নিদর্শন। অন্নদাশঙ্করের রচনার চাল আত্মভাবী প্রবন্ধ-নিবন্ধের বিশেষ উপযুক্ত। তাঁর কলমে আছে শ্লেষ-ব্যঙ্গের ধার, বিদ্রূপপ্রবণতা, কৌতুকহাস্যপ্রিয়তা, যদিও রামধনু-বর্ণালীর আড়ালে লুকানো মেঘভারের মতো হাসির আড়ালে চোখের জলটিও অলক্ষ্য নয়। ভারত-বিভাগের বেদনা তাঁর অন্তরে একটি গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে' তাঁকে নিরন্তর যন্ত্রণাদিগ্ধ করে রেখেছে। প্রবন্ধনিবন্ধ যা-ই তিনি লিখুন না কেন এবং তাতে যতই কৌতুক আর আমোদের উপাদান থাকুক না কেন, একটু হাসতে গেলেই তাঁর লেখা ফুড়ে ব্যথার কাঁটাটি বেরিয়ে পড়ে। হাসি আর বিষাদের এই এককালীন সমাহার আত্মভাবী রচনার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অন্নদাশঙ্কর নামতঃ আত্মভাবী রচনা বেশী না লিখলেও, তাঁর কলম যে এই ধরনের রচনার বিশেষ উপযোগী তাতে সন্দেহ করা চলে না। তাঁর 'পথে প্রবাসে', 'ফেরা', 'জাপানে' প্রভৃতি ভ্রমণগ্রন্থেও আত্মভাবী রচনার নমুনা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে।

পরিমল গোস্বামী আর একজন সুরসিক লেখক, যাঁর ভিতর উইট্, পান্, এপিগ্রাম্‌প্রভৃতি অলংকারের সার্থক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। বীরবলের একটি রচনাবৈশিষ্ট্য তিনি সবিশেষ আয়ত্ত করেছেন, সেটি হল লেখায় মিছরির ছুরির ঝিলিক ফোটানো। নিতান্ত অনুত্তেজিত ভঙ্গীতে নরম ভাষায় অতিশয় শক্ত কথা শোনানোর শিল্পে বর্তমান সাহিত্যে তাঁর জুড়ি লেখক বোধ হয় আর কেউ নেই। বিপক্ষের পাল থেকে হাওয়া চুরি করে এনে তিনি সেই হাওয়া বিপক্ষের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করেন, অর্থাৎ বিপক্ষের যুক্তিতেই বিপক্ষকে ঘায়েল করেন। তাঁর বিদ্রূপ বাইরে নিরীহ, কিন্তু ভিতরে কেটে গিয়ে বসে। এ কথার প্রমাণের জন্য বেশী দূরে যেতে হবে না, কোন একটি দৈনিকের পৃষ্ঠায় তাঁর 'এককলমী' ছদ্মনামের আড়ালে লিখিত এককালীন ফীচার্-নিবন্ধগুলিই তার প্রমাণ। পরিমল গোস্বামী একজন বিদগ্ধ, বুদ্ধিপ্রধান, মার্জিত ভাষাশিল্পী। তাঁর রচনার আবেদন রসগ্রাহী পাঠকের কাছে যতটা, সাধারণশ্রেণীর পাঠকের কাছে ততটা নয়। সেইটেই সম্ভবতঃ কারণ, যার জন্য তিনি প্রকৃত শক্তিধর হয়েও তাঁর জীবদ্দশা-কালে তথাকথিত জনপ্রিয় লেখকের কোঠায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি। জনরুচির কারবারী দৈনিক সংবাদপত্রে লিখলেও, তিনি আসলে 'এলিট্'দের লেখক।

আত্মভাবী প্রবন্ধের রচয়িতাদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু নিঃসন্দেহে প্রথম

শ্রেণীর শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। এই লেখকের মেজাজটি ইংরেজী পার্সোনাল বা ফ্যামিলিয়ার এসে-র ধরনের লেখা লেখবার সবিশেষ উপযুক্ত। পরে কাব্যে কথাসাহিত্যে নাটকে রচনার ক্ষেত্রবদল করলেও লেখকজীবনের গোড়াতেই (১৯৩২) "ক্লাইভ স্ট্রিটে চাঁদ", "বাথরুম", "পুরানা পল্টন" প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখে তিনি এই ধারার রচনার সূত্রপাত করেছিলেন। তাঁর 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' নামক নিবন্ধগ্রন্থে এগুলি সংকলিত আছে। পরেও তিনি 'সমুদ্রতীর', 'আমি চঞ্চল হে', 'সব পেয়েছির দেশে', 'দেশান্তর' প্রভৃতি ভ্রমণগ্রন্থে এবং 'উত্তরতিরিশ' নামক রচনাসংগ্রহে এজাতীয় রচনায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পারদর্শিতার প্রমাণ রেখেছেন। বুদ্ধদেব বসু অহংভাব-প্রধান, কিন্তু কবিতাসযুক্ত লেখক। অহংভাবের প্রকাশ ঘটেছে উন্নাসিকতায়, আত্মকেন্দ্রিকতায়; কবি-স্বভাবের অভিব্যক্তি পাই ভাবনা, অনুভব, আবেগ ইত্যাদির স্বচ্ছ বর্ণনায়। পূর্বোক্ত লেখকদের কারও কারও যাতে বিশেষ স্ফূর্তি, সেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপপ্রবণতা তাঁর কলমে আসে না, যা আসে তার নাম আত্মগৌরবচেতনা এবং সাধারণ মানুষের প্রতি সীমাহীন অবজ্ঞা। তবু এই আত্মপ্রীতিও মানিয়ে যায়, কখনও কখনও আস্বাদ্যও হয়ে ওঠে, তাঁর অপূর্ব লিপিকুশলতাগুণে এবং কাব্যসুষমার জন্য। বুদ্ধদেব বসুর রচনারীতি ছড়ানো, ফেনানো, বাহুল্যায়িত, কলমুখর; কিন্তু আশ্চর্য প্রাঞ্জল, উজ্জ্বল। লেখকের গদ্যের ছাঁচ ইংরেজীর ছাঁচে গড়া, তা হলেও অস্বাভাবিক ঠেকে না এইজন্য যে, আধুনিক বাংলা গদ্য মূলতঃ ইংরেজী ভঙ্গীকে অনুসরণ করেই বিকাশলাভ করেছে। এতে দোষের কিছু নেই, যদি ভঙ্গীটুকুকে আপন শক্তির প্রসাদে স্বীয়কৃত করা যায়। বুদ্ধদেব বসুর স্টাইলে আছে এই স্বীকরণের শক্তি, তাই তিনি একজন সার্থক গদ্যশিল্পী।

অকালে লোকান্তরিত জ্যোতির্ময় রায় ('উদয়ের পথে' খ্যাত) ও পরিমল রায় একদা আত্মভাবী নিবন্ধ রচনায় যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন, কালধর্মবশতই ইদানীং কিছুটা বিস্মৃত হয়েছেন।

'যাযাবর'-এর বহুলপ্রচারিত 'দৃষ্টিপাত' বইয়ে এবং 'ঝিলম নদীর তীরে' ভ্রমণকাহিনীতে আত্মভাবী রচনার আমেজ আছে—বিচক্ষণ পাঠক একটু মনোযোগী হলেই তাঁর এই রচনাবৈশিষ্ট্যটি আবিষ্কার করতে পারবেন। অধ্যাপক বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও কবি অজিত দত্ত ('মন পবনের নাও') একদা ব্যক্তিগত নিবন্ধরচনার ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, পরে আর তাঁদের এই-জাতীয় রচনা বেশী চোখে পড়েনি।

হাল্কা চালের নিবন্ধ রচনায় অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে ইন্দ্রজিতের

কুশলতাও সবিশেষ। তাঁর মানস-গঠনে কাব্যভাব অনুপস্থিত, তবে সেই ক্ষতি তিনি পুষিয়ে নিয়েছেন পরিহাসরসরসিকতার স্বাভাবিক ক্ষমতায় এবং প্যারাডক্সধর্মী বাক্যগঠনকুশলতায়। তাঁর 'ইন্দ্রজিতের খাতা', 'ইন্দ্রজিতের আসর' বইগুলি তাঁর রচনাশক্তির নিঃসংশয় সাক্ষ্য বহন করে। সৈয়দ মুজতবা আলী আরেক জন শক্তিশালী লেখক, যাঁর 'পঞ্চতন্ত্র' সিরিজের লেখাগুলিতে এবং 'দেশেবিদেশে' নামক ভ্রমণের বইয়ে তাঁর এই-জাতীয় শক্তির পরিচয় আমরা পেয়েছি। সৈয়দ মুজতবা আলী দেশ-বিদেশে অনেক ঘুরেছেন, সেই বিস্তৃত অভিজ্ঞতার ফসলে তাঁর রচনার ডালি পূর্ণ। পাঠকের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ তথা আত্মীয়তা স্থাপনের ভঙ্গীতে লেখা তাঁর স্টাইলে জীবনপ্রীতি, জীবনের সুখসেব্য বস্তুসমূহের প্রতি আসক্তি প্রভৃতি নানা সৎ-লক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু তিনি বড় বেশী ভাষণমুখর ('গ্যাকলাস্') এবং শিষ্ট সমাজে সচরাচর অপ্রচলিত গ্রাম্য কথার বহুল প্রয়োগ দ্বারা বাংলা ভাষার মার্জিত রূপটির ক্ষতিসাধনকারী। শব্দব্যবহারে প্রায়ই তাঁর মধ্যে যে উচ্ছৃঙ্খল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তা নবীন লেখকদের সামনে সংযমের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে না। রসিকতার খাতিরে হলেও ভাষার উপর এ রকম জুলুম করার অধিকার কারও নেই।

'রঞ্জন' নামের অন্তরালবর্তী সাংবাদিক নিরঞ্জন মজুমদার এবং 'সুনন্দ' ছদ্মনামের আড়ালে আত্মগোপনকারী বাংলার এক খ্যাতিমান্ কথাসাহিত্যিক কয়েক বছর আগে একটি সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠা অবলম্বন করে নিয়মিতভাবে লঘুলক্ষসঞ্চারী ব্যক্তিভাবান্বিত হাল্কা ছাঁদের রচনা লিখতেন। রঞ্জনের রচনার চাল কিছু গম্ভীর, অন্যপক্ষে সুনন্দর রচনাভঙ্গী তুলনায় কতকটা চটুলতার ধার-ঘেঁষা। তবে দুইয়েরই লেখা বেশ উপভোগ্য, সে কথা অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করতে হয়। রঞ্জন যদি তাঁর দর্শন-ঘেঁষা 'মনোলোগ'-এর অভ্যাস কমাতে পারতেন, আর সুনন্দ পারতেন রচনাকে তুচ্ছ সাময়িক প্রসঙ্গাদির ক্ষণস্থায়িত্বের ঊর্ধ্বে উঠাতে, তা হলে তাঁদের রচনা যে আরও বেশী আস্বাদ্য হয়ে উঠত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

মোট কথা, আত্মভাবী রচনার প্রাচুর্য সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এই খাতে আরও অনেক নতুন নতুন লেখক লিখছেন, তাঁদের সকলের নাম করা সম্ভব নয়। যে কতিপয়ের উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের রচনার স্বরূপপরিচয় থেকেই আশা করি বুঝতে পারা যাবে, আত্মভাবী রচনা চলমান বাংলা সাহিত্যের একটি সজীব শাখা এবং সমৃদ্ধ শাখা। অনেকের মধ্যে এই জাতীয় রচনাকে হেলাফেলা করবার একটা মনোভাব, তার গুরুত্বকে কমিয়ে দেখানোর একটা চেষ্টা দেখা যায়। সেটা ঠিক নয়। সাহিত্য বৈচিত্র্য-সাধনার একটি সার্থক ক্ষেত্র। তাকে যত বিভিন্ন দিক্ থেকে ঐশ্বর্যান্বিত করে তোলা যায়, ততই জাতির কল্যাণ।

সাহিত্যে স্বেচ্ছাচার

বাংলা সাহিত্যে 'কল্লোল' যুগে একবার শ্লীল-অশ্লীলের সমস্যা দেখা দিয়েছিল। কল্লোল পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে সব নতুন লেখক সাহিত্য-চর্চায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সম্ভবত: তারুণ্যের উন্মাদনায় আর অভিনবত্বের নেশায় এবং খুব সম্ভব সমসাময়িক বিদেশী সাহিত্যের আদর্শের ছাঁচে তাঁদের একটা মোটা অংশ অশ্লীলতার চর্চায় মেতেছিলেন। কিন্তু গত পঞ্চাশ বছরের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা জানেন কল্লোলাশ্রয়ী তরুণ লেখকদের সেই অশ্লীলতার অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। দীর্ঘদিনের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে এবং মহৎ লেখকদের সাধনার বলে প্রতি সাহিত্যের অন্তরেই যে সুস্থ বুদ্ধির সংস্কার নিহিত থাকে, সেই সংস্কার সময়-কালে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে অশ্লীলতাপ্রয়াসী ওই সব নতুনের নেশায় প্রমত্ত তরুণ লেখকদের চেষ্টা প্রতিহত করেছিল। এ ক্ষেত্রে 'প্রবাসী' বা 'শনিবারের চিঠি'র বা সমভাবাপন্ন অন্যান্য পত্র-পত্রিকার বিরোধ আন্দোলন নিমিত্ত মাত্র. আসলে ওই-সকল পত্রিকার মধ্য দিয়ে বাংলার সম্মিলিত শুভ মানসিকতারই অভিব্যক্তি ঘটেছিল এবং ওই অভিব্যক্তিমুখে উদ্গত প্রবল প্রতিবাদের চাপের কাছে অশ্লীল-লেখকদের নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। তৎকালীন তরুণ লেখকদের মধ্যে অনেকেই পরে তাঁদের ভুল বুঝতে পেরে তাঁদের পূর্বানুসৃত পথ থেকে প্রতিনিবৃত্ত হন, তাঁদের মধ্যে যে শক্তিমত্তা ছিল তাকে আর নিষ্ফল ও ক্ষতিকর আবেগের পথে চালিত না করে যথার্থ সৃজনশীলতার উদ্যমের অভিমুখী করেন।

কল্লোল কালিকলম প্রভৃতি পত্রিকা উঠে যাবার পর চার যুগ গত হয়েছে। আমরা ভেবেছিলাম অশ্লীলতার সমস্যা বুঝি বাংলা ভাষায় অতীতের বস্তুতে পরিণত হয়েছে, বাংলা সাহিত্যের শরীর থেকে বুঝি ওই বিষ একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়েছে। কিন্তু তা তো নয়, আবার নতুন করে অধিকতর প্রবলতার সঙ্গে এই বিষ এখনকার বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে দেখতে পাচ্ছি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বুকের উপর অশ্লীলতার যে নতুন তাণ্ডবের শুরু হয়েছে প্রতিটি সম্ভাবনাপূর্ণ মানুষকেই তা শঙ্কিত করে তুলেছে। দেশের অগণিত ছাত্র-ছাত্রী তরুণ-তরুণী কিশোর-কিশোরীদের জন্য যাঁদের মনে সত্যিকার মমতা আছে, দায়িত্ববোধ আছে, তাঁরা এই অবস্থা অনাসক্ত দর্শকের নিস্পৃহ ভঙ্গীতে লক্ষ্য করতে পারেন না, তাঁদের সক্রিয়ভাবে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে।

সক্রিয় প্রতিবাদ আরও এজন্য দরকার যে, এখনকার লেখকদের মধ্যে জেনে বুঝে যাঁরা লেখায় নগ্নতার চর্চা করছেন তাঁরা অতিশয় সঙ্ঘবদ্ধ, তাঁদের পিছনে ব্যবসায়ী দৈনিক পত্রিকাগুলির সমর্থন আছে, লোভী প্রকাশকেরা নিজ স্বার্থে তাঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন, সর্বোপরি কিছু খ্যাতনামা প্রবীণবয়সী কিন্তু অতিমাত্রায় ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ও ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত বিদেশীভাবাপন্ন লেখক তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি উন্মার্গগামী তরুণদের অনুকূলে প্রয়োগ করবার জন্য লড়াইয়ের ময়দানে এগিয়ে এসেছেন।

বিষয়টি এখন শুধু শ্লীল-অশ্লীলের সমস্যার মধ্যেই নিবদ্ধ নেই, তা সম্মিলিত অশুভের সঙ্গে সম্মিলিত শুভের দ্বন্দ্বে পরিণত হয়েছে। এক কথায়, সাহিত্যের রণভূমিতে এটি সুরাসুরের লড়াই। দেবতারা জেতেন কি দৈত্যেরা জেতে তার উপর বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ গতিপথ অনেকখানি নির্ভর করবে।

কল্লোল-যুগের অশ্লীলতার চর্চাকারী লেখকেরা যতই বিপথগামী হোন তাঁদের সম্পর্কে এই সান্ত্বনার কথা ছিল যে, তাঁরা একটা কৃত্রিম ভাবের উদ্দীপনার বশে সাময়িক বিভ্রান্তির স্রোতে গা ঢেলে দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁদের উদ্যমের পিছনে কোন ব্যবসায়িক লাভালাভের তাড়না ছিল না। তাঁরা তাঁদের অশ্লীল গল্পো-পন্যাসকে মুনাফার পণ্যে পরিণত করেননি। কিন্তু এখনকার যে সব লেখক এই পথে নেমেছেন তাঁদের সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। যুগের বদলের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের কাঠামোও বদল হয়েছে। এখন নগ্ন বিষয়ের বর্ণনাকারী গল্পোপন্যাস গর্গের রচনা পাঠের দিকে পাঠক সম্প্রদায়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের মন অস্বাভাবিক রকম উদগ্র হয়ে উঠেছে। কেউ এ-জাতীয় পাঠস্পৃহাকে আধুনিকতার বা তথাকথিত প্রগতিশীলতার অভিমান চরিতার্থ করবার উপায় বলে মনে করেন, কেউ এর মধ্যে খোঁজেন রিরংসাবৃত্তিকে চাগিয়ে তোলবার উপকরণ, উত্তেজনার বিকৃত আনন্দ। ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন দেহবাদী লেখকেরা পাঠকদের এই দুর্বলতার খবর রাখেন আর এই দুর্বলতাকেই তাঁরা মুনাফার কড়িতে রূপান্তরিত করে প্রচুর টাকা ঘরে তুলছেন।

অর্থাৎ এঁরা জ্ঞানপাপী এবং দ্বিবিধ অপরাধে অপরাধী। প্রথমতঃ, অশ্লীলতার চর্চাটাই একটা শুচিতা-সুনীতি-সুরুচিবিরোধী অভিযান: দীর্ঘদিনের অনুশীলনে পুষ্ট সাহিত্যের শুভ সংস্কারের সঞ্চয়কে ধুলায় লুটিয়ে দেবার চেষ্টা। তার সঙ্গে স্থূল বৈশ্য মনোবৃত্তি যুক্ত হয়ে তাকে আরও অসহনীয় করে তুলেছে। এ রকম চেষ্টায় যাঁরা সায় দেন তাঁরা প্রগতিচর্চার নামে নিকৃষ্ট ধরনের প্রতিক্রিয়া-শীলতারই পোষকতা করেন মাত্র। এই কথাটি এখানে চিহ্নিত হওয়া দরকার

যে, অশ্লীলতার বিরুদ্ধে যাঁরা প্রতিবাদের কণ্ঠ উত্তোলন করেন তাঁরাই যথার্থ প্রগতিশীল ; পক্ষান্তরে যাঁরা উনিশ-শতকের একটা বস্তাপচা পুরনো মতকে আঁকড়ে ধরে আজও নিরাবরণ দেহবাদের সপক্ষে সাফাই গাইছেন তাঁদের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব অতিশয় প্রকট। আজও যাঁরা পুরাণ-মহাভারত-মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি নজীরের যুক্তিতে অশ্লীলতার অনুকূলে সমর্থন খোঁজেন তাঁরা রক্ষণশীল নন তো কে রক্ষণশীল ?

একটা ধরতাই বুলি স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষের প্রচারের দ্বারা মুখে মুখে চালু হয়েছে যে, সাহিত্যের আবহাওয়াকে যাঁরা শোধিত করবার কথা বলেন, অশ্লীলতার কলুষমুক্ত করবার আহ্বান জানান, তাঁরা শুচিবায়ুগ্রস্ত, 'পিউরিটান'—সাহিত্যের এলাকার মধ্যে তাঁরা সমাজশাসনের নীতি আমদানীর দোষে দোষী। কিন্তু এর চেয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট অভিযোগ আর-কিছু হতে পারে না। কেউ অশ্লীলতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করলেই তিনি ক্রূর সমাজপতি বনে যান না বা তাঁর ভিতর যে সহজাত সৌন্দর্যবোধ ও সাহিত্যবুদ্ধি আছে তা পারিজ হয়ে যায় না। বরং তাঁরই মমতা বেশী, তাঁরই সাহিত্যচৈতন্য অনেক বেশী সুস্থ। বিকৃত সাহিত্যের কলুষপ্রভাবে দেশের অগণিত তরুণ-তরুণী আর ফুলের মত নিষ্পাপ শিশুকিশোরের চিত্ত বিষাক্ত হোক এ যিনি চান না তাঁর দায়িত্বজ্ঞান বেশী, না, যে সব সাহিত্যিক এক কৃত্রিম শিল্পস্বাতন্ত্র্যের বুলি মুখে নিয়ে শিল্পীর স্বধর্ম ও স্বাধীনতার অজুহাতে চূড়ান্ত রকমের উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দেন তাঁর দায়িত্বজ্ঞান বেশী ? সাহিত্যবুদ্ধির কথাই যদি ওঠে, সেক্ষেত্রে বলব পরিমিতিবোধ সৌন্দর্যের এক মূল উপাদান। যে সব লেখক বাস্তবচর্চার নাম করে মাত্রাবোধ পদে পদে লঙ্ঘন করেন, প্রতি পাঠকেরই অন্তরে নিহিত ছন্দ ও সুষমার ধারণাকে বিপর্যস্ত করেন, তাঁদের সাহিত্যবুদ্ধি অধিক নির্ভরযোগ্য, না, যাঁরা ওই মাত্রাবোধকেই রচনাদেহে রক্ষিত দেখতে চান তাঁদের সাহিত্যবুদ্ধি অধিক নির্ভরযোগ্য ? শিল্পীর স্বাতন্ত্র্যের কিংবা বিশুদ্ধ সাহিত্যবুদ্ধির দোহাই পেড়ে কোন কথা বললেই তা উচ্চতর জ্ঞানমণ্ডিত কথা হবে এমন অভিমান না থাকাই ভালো।

তাছাড়া, বাস্তবের সত্যটাকেই তো একমাত্র চর্চাযোগ্য বিষয় বলে গণ্য করলে চলবে না, বাস্তবের সৌন্দর্যের কথাও ভাবতে হবে। যেখানে সত্যের সঙ্গে সৌন্দর্যের বিরোধ ঘটে, সেক্ষেত্রে সত্যের রূঢ় অংশ বর্জন করতে হবে বইকি। সাহিত্য মূলত সৌন্দর্যের ক্ষেত্র, সত্যের জন্য রয়েছে বিজ্ঞানের এলাকা। বিজ্ঞান ও সৌন্দর্যকে সমীকৃত করবার প্রবণতা না বিজ্ঞানের মান বাড়ায়, না সাহিত্যের উপকার করে।

কথাটা আপ্তবাক্যের আকারে লিপিবদ্ধ হল, হয়তো তেমন পরিষ্কার হল না।

বক্তব্যের পরিস্ফুটনের জন্য আপ্তবাক্য বা ঢালাও মন্তব্যকে বস্তুমুখী দৃষ্টান্তের স্তরে নামিয়ে আনা যাক।

কোন লেখক যদি বর্তমান সমাজের রূপ সঠিক ভাবে চিত্রায়িত করবার তাগিদে তাঁর গল্পে বা উপন্যাসে 'রকবাজ' ছেলেকে কাহিনীর নায়ক করতে চান তা হলে তার বিরুদ্ধে সাহিত্যগতভাবে কিছুই বলার থাকতে পারে না। নীতি-গত আপত্তিও এ ক্ষেত্রে টেকবার নয়, কেন না জীবনে বিষয়বস্তু অগণন এবং তার যে কোনটিকে কাহিনীর উপজীব্য রূপে বেছে নেবার স্বাধীনতা লেখকের আছে। কিন্তু যেহেতু রকবাজ ছেলের চরিত্র চিত্রিত হতে যাচ্ছে সেই কারণেই তার ব্যবহৃত সকল মুখের কথা এবং কৃত সকল আচরণকেই হুবহু লেখায় প্রকাশ করতে হবে এটা সাহিত্যবুদ্ধির কথা নয়, এটা অসাহিত্যো-কোচিত মনোভাবের উদাহরণ। এর পিছনে ব্যবসায়িক লোভও থাকতে পারে আবার অজ্ঞানতাও থাকতে পারে—সাহিত্যিক মাত্রাবোধের অভাবজনিত অজ্ঞানতা। কিন্তু যা-ই থাকুক, তা সাহিত্যবোধ থেকে ভিন্নতর কোন বস্তু। ইন্দ্রিয়াসক্ত নায়কের ইন্দ্রিয়পরায়ণতা দেখাতে হলে তার তাবৎ লাম্পট্যের বৃত্তান্ত খুঁটিনাটি প্রক্রিয়ার বর্ণনসহ আনুপূর্বিক উপস্থিত করতে হবে, সৎসাহিত্যের এটা রীতি নয়। মহৎ লেখকেরা এ-জাতীয় চরিত্র বা এ-জাতীয় চরিত্রোচিত ঘটনার চিত্রণে কখনও মাত্রাসাম্য হারান না। তাঁরা লম্পটের চরিত্র আঁকেন ঠিকই কিন্তু লাম্পট্যের প্রতিটি প্রক্রিয়া ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে মুখরোচক ভাষায় বোল-কাহন বর্ণনা করতে যান না। তাঁদের সহজাত সৌন্দর্যবুদ্ধি এবংবিধ বর্ণনার অতিবিস্তারে তাঁদের বাধা দেয়। তাঁদের মাত্রাজ্ঞান তাঁদের প্রহরীর কাজ করে। যা ঘটেছে তার ইঙ্গিত দিয়েই তাঁরা সন্তুষ্ট থাকেন, সকলের চোখের সামনে হাটের মাঝখানে তাঁরা নোংরা উপুড় করে ঢেলে দেবার কথা চিন্তাও করতে পারেন না। কামক্রিয়ার পুঙ্খানুপুঙ্খ দীর্ঘায়িত বর্ণনা পর্নোগ্রাফীর কোঠায় পড়ে, তা সাহিত্যের বিষয় নয়। ব্যঞ্জনা সাহিত্যের এক প্রধান উপকরণ; পর্নোগ্রাফীতেই শুধু আতিশয্য-দুষ্ট বর্ণনার 'মর্বিড' প্রবণতা লক্ষিত হতে দেখা যায়। কেউ যদি বাস্তব সত্যের দোহাই পেড়ে পর্নোগ্রাফীকেই সাহিত্যসৃষ্টি বলে চালাতে চান সে ক্ষেত্রে আমরা নাচার।

আজকের দিনের এই 'রকবাজ' সাহিত্যের সঙ্গে কেউ যখন রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে, চতুরঙ্গ বা যোগাযোগ উপন্যাসের তুলনা করবার প্রয়াস পান তখন হাসব কি কাঁদব বুঝতে পারিনে। রবীন্দ্রনাথ হলেন অতুলনীয় সৃষ্টিশক্তির অধিকারী এক কালোত্তীর্ণ শিল্পী, তাঁর রচনার ধারার সঙ্গে সাহিত্যের বোধ-

রুচিবিবর্জিত সংযমবন্ধনহীন এই সব বালখিল্য লেখকদের রচনার তুলনায় কবি-গুরুর অমর প্রতিভার অপমান করা হয়। ঘরে-বাইরে কিংবা চতুরঙ্গ উপন্যাসে জৈব কামনা বাসনার ছবি আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার বর্ণালি শ্রেষ্ঠ শিল্পিসুলভ ব্যঞ্জনাধর্মিতার প্রলেপে অক্ষুণ্ণ, এখনকার কটকটে রঙের কুৎসিত জেল্লা তাতে নেই, থাকা সম্ভবও নয়। সন্দীপের প্রতি পরস্ত্রী বিমলার মোহ নির্জ্জন স্তরে সুপ্ত ও প্রায়-অনুচ্চারিত। শচীশের প্রতি দামিনীর জৈব আকর্ষণ প্রবল বোঝা যায় কিন্তু কোথাও রবীন্দ্রনাথ চতুরঙ্গ উপন্যাসে অতিবিস্তারের সহায়তায় এই প্রবলতার বার্তা ঘোষণা করেননি। উৎকৃষ্ট পর্যায়ের কবি ও কথাসাহিত্যিকের কাছ থেকে যা প্রত্যাশিত, নিগূঢ় ইঙ্গিত ও সংকেতের সাহায্যে তিনি তাঁর কাজ সেরেছেন। রাত্রির অন্ধকারে দামিনী যেখানে শচীশের পা জড়িয়ে ধরেছে এবং চোখের জল আর রাশ-রাশ কালো চুলের বন্যায় শচীশের পা অভিষিক্ত করে দিয়েছে, সেই অংশটি স্মরণ করা যাক। কী অনন্যসাধারণ শিল্পকুশলতা, ব্যঞ্জনা-শিল্পের কী অনবদ্য প্রকাশ! শচীশের ডায়ারির ভাষায় "তার পর কিসে আমার পা জড়াইয়া ধরিল। প্রথমে ভাবিলাম, কোনো একটা বুনো জন্তু। কিন্তু তাদের গায়ে তো রোঁওয়া আছে এর রোঁওয়া নাই। আমার সমস্ত শরীর যেন কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। মনে হইল একটা সাপের মতো জন্তু, তাহাকে চিনি না। তার কী রকম মুণ্ড, কী রকম গা, কী রকম লেজ কিছুই জানা নাই—তার গ্রাস করিবার প্রণালীটা ভাবিয়া পাইলাম না। সে এমন নরম বলিয়াই এমন বীভৎস, সেই ক্ষুধার পুঞ্জ!" একেই বলে শিল্পীর সংযম। যা বলা হয়েছে তা ইঙ্গিতের সাহায্যে বলা হয়েছে অথচ কোন কথাই অব্যক্ত থাকেনি। আজকালকার কোন অশ্লীলতাপ্রয়াসী শিল্পী হলে ঘটনাটাকে কচলিয়ে ছাড়তেন এবং ওই অতিকথনের দ্বারা সমস্ত ব্যাপারটাকেই ঘিনঘিনে করে তুলতেন। জৈব কামনা-বাসনার সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে যা ঘটে তার আভাস দেওয়াই যথেষ্ট, তাকে চট-কানোটা মহৎ শিল্পীর রীতি নয়। এ ক্ষেত্রে তথ্যটাই বড় কথা, কী কী অবস্থার সমবায়ে কোন্ কোন্ প্রক্রিয়ায় সেই তথ্য সংঘটিত হয়েছে সেটা সত্যি-কার সাহিত্যপাঠকের কাছে আদৌ জরুরী সংবাদ নয়। পর্নোগ্রাফী ও সাহিত্যের এখানেই তফাৎ।

অশ্লীলতার সপক্ষীয়রা সংস্কৃত কাব্যের দেহমিলনের বর্ণনার নজীর উপস্থাপিত করেন কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, সংস্কৃত কাব্যের সম্ভোগচিত্রগুলি শ্রেষ্ঠ ধ্বনির যবনিকায় আবৃত, শ্রবণসুখকর সুললিত রুচিসম্মত শব্দের বর্ণরেখায় অঙ্কিত। খিস্তি-খেউড়ের ভাষার সঙ্গে দূরতম কল্পনায়ও তার সাযুজ্য স্থাপন করা যায় না।

কালিদাস, অমরু, ভর্তৃহরি—যাঁদের এঁরা আত্মপক্ষসমর্থনে উদ্ধৃত করেন—তাঁরা ভোগের কবি নিশ্চয়ই কিন্তু তাঁদের সম্ভোগবর্ণনা সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের কঠোর রীতি এবং আত্ম-আরোপিত সংযমের ধারণা অনুযায়ী কঠিন ধ্বনির শাসনে সুরক্ষিত। শব্দ ব্যবহারে নগ্নতার কিংবা প্রগলভতার প্রশ্রয় তাঁরা কখনও দেননি। সংস্কৃত কবিদের শব্দসংস্কারই আলাদা। তা যদি হয় তো তাঁদের উদাহরণ রক আর খিস্তি-খেউড়ের ভাষাশ্রয়ী এখনকার বিবরমুখী সাহিত্যের সমর্থনে প্রযুক্ত হয় কোন্ যুক্তিতে ও কোন্ ভিত্তিতে?

দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাহিত্যের কোন কোন বর্ষীয়ান্ লেখক অশ্লীল লেখকদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। তাঁদের বিচারের স্বাধীনতায় বাধা দিতে চাই না, কিন্তু সবিনয়ে তাঁদের এ কথা বলতে চাই যে, সাহিত্যের প্রতি লেখক হিসাবে তাঁদের কল্পিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মানুষ হিসাবে সমাজের প্রতি তাঁদের যে বৃহত্তর দায়িত্ব আছে সে দায়িত্ব তাঁরা সম্পূর্ণই বিস্মৃত হয়েছেন। দেশের অগণিত সাধারণ শিক্ষিত মানুষ ছাত্রছাত্রী আর কিশোর-কিশোরীদের মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা তাঁদের মগজে আদৌ প্রবেশ করছে না; শিল্প ও সাহিত্যের অধিকার রক্ষার সংকীর্ণ, প্রায়শঃ বিপথাবলম্বী চিন্তা, তাঁদের সমস্ত চিত্ত অধিকার করে রয়েছে। তাঁরা লেখক হতে পারেন কিন্তু সুনাগরিক নন। আর খতিয়ে দেখলে, সুনাগরিকতা সুলেখকের গণ্ডীর বহির্ভূত বিষয় নয়। শিল্পীর স্বাধীনতা রক্ষা করবার নামে উন্মার্গগামিতাকে প্রশ্রয় আর উচ্ছৃঙ্খলতাকে সমর্থন করবার চেষ্টা করলে দেশবাসী তাঁদের ক্ষমা করবে না।

শ্লীলতা-অশ্লীলতার বিতর্কে যাঁরা অশ্লীলতার পক্ষ সমর্থন করে বক্তব্য বিস্তার করেন তাঁরা একটা বহুবাপচা পুরনো মতের প্রতিধ্বনি করেন মাত্র। সাহিত্যের সীমানা কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত থাকা উচিত, সাহিত্যের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচারের ক্ষেত্রে শ্লীলতা-অশ্লীলতার নিরূপণ একটা প্রাসঙ্গিক বিষয় কিনা, সুন্দর-অসুন্দরের ধারণার সঙ্গে শ্লীল-অশ্লীলের ধারণাকে সমীকৃত করা যায় কি না—এ সব প্রশ্ন আজকের নয়, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই ইউরোপীয় সাহিত্যে এইগুলি নিয়ে যথেষ্ট তোলপাড় আর গোরগোল হয়ে গেছে। ফরাসী সাহিত্যের প্রকৃতিবাদী (ন্যাচারালিস্ট) কথাকারগণ জীবনের স্বাভাবিক অর্থাৎ অবিকৃত রূপের বিশদ বর্ণনাকে শুধু যে তাঁদের গল্পোপন্যাসের উপজীব্য করেছেন তাই নয়, তাঁরা এটাকে একটা তত্ত্ব

রূপেও প্রচার করবার চেষ্টা করেছেন। ফ্লবেয়ার, মোপাসাঁ, জোলা প্রমুখ লেখকদের লেখায় আমরা এই তত্ত্বের প্রতিফলন দেখতে পাই। তাঁদের এই মতবাদের ঢেউ ইংলণ্ডেও গিয়েও পৌঁছেছিল। তারই স্রোতোমুখে বিশ শতকের প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ইংরেজী সাহিত্যে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল ডি. এইচ. লরেন্স প্রমুখ শক্তিমান লেখকদের সচেতন দেহবাদ। আবার ফরাসী ও ইংরেজী সাহিত্যের এই জাতীয় প্রভাবের প্রতিক্রিয়ায় আমেরিকার সাহিত্যে প্রকট দেহবাদী রচনার ধারার উদ্ভব। থিয়োডোর ড্রেইজার, হেনরি মিলার, নভোকভ প্রমুখকে বোধ হয় এই ধারার প্রতিনিধি স্থানীয় লেখক রূপে নির্দেশ করা যায়। মার্কিন সাহিত্যের দেখাদেখি সারা পশ্চিম ইউরোপের সাহিত্যেই এখন উৎকট দেহাশ্রিত রচনার আধিক্য। ইতালীর মোরাভিয়া, ফ্রান্সের ফ্রাসোয়াঁ সাগঁ কিংবা ইংলণ্ডের কিংসলি এমিস প্রমুখ লেখকেরা কিছু আকস্মিক সংঘটন নয়, একটা পূর্বাপর সম্বন্ধযুক্ত বিগত ঐতিহ্যেরই তাঁরা একালীন বহিঃ-প্রকাশ মাত্র। এই ঐতিহ্য প্রকৃতিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, দেহাশ্রয়ী, এবং কম বা বেশী পরিমাণে ব্যবসায়িবুদ্ধি নির্ভর।

সুতরাং আমাদের সাহিত্যের যেসব একালীন লেখক মনে করছেন অশ্লীলতার পোষকতা করে তাঁরা একটা নতুন কিছু করছেন বা বাংলা সাহিত্যকে প্রগতির খাতে বইয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরা আত্মপ্রবঞ্চনা করছেন মাত্র। তাঁদের এ ব্যাপারে প্রগতিশীলতার অভিমান না থাকাই ভালো, কারণ তাঁরা যেটা করছেন তা প্রগতিও নয়, নতুনত্বও নয়, একটা উচ্ছিষ্ট বাসী মতেরই আসলে তাঁরা জাবর কাটছেন। এ জাতীয় আধুনিকতার অভিমান নিতান্ত পলকা, তার পায়ের তলায় কোন মাটি নেই, সুতরাং সামান্য একটু টোকাতেই তাসের ঘরের মতো ওই সযত্নরচিত সৌধ ধ্বসে পড়তে বাধ্য।

যদি কেউ বলেন, তত্ত্ব বা মতটি পুরাতন, তাতে কী এসে যায়? যদি প্রকৃতিবাদ আর দেহবাদের পক্ষে জোরালো যুক্তি থাকে এবং সে যুক্তি অকাট্য হয়, তা হলে ওই দুই আদর্শ যে মতের মধ্যে প্রতিফলিত তা পুরনো বলেই তাকে অগ্রাহ্য করবার কোন মানে হয় না। তাছাড়া উনিশ শতকীয় সাহিত্যেই তো তথাকথিত অশ্লীলতার শুরু নয়, এর বহু আগে থেকেই আমরা সাহিত্যের চিত্রণের মধ্যে দেহবাদী প্রভাব দেখতে পাই। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে শৃঙ্গার রস সাহিত্যের পরিবেশনযোগ্য বিবিধরসের অন্যতম রস রূপে পরিগণিত হয়েছে, মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্যে নায়িকার বয়ঃসন্ধিকালীন রূপ কিংবা নায়ক-নায়িকার অভিসার বর্ণনায় যথেষ্ট বাড়াবাড়ি করা হলেও তা

দোষাবহ বলে গণ্য হয়নি। রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে সম্ভোগচিত্র আছে, কিন্তু তাতে ওই দুই কাব্য বাংলার কাব্যামোদী পাঠকের কাছে অপাংক্তেয় হয়ে যায়নি। অন্য দিকে ইউরোপের ক্লাসিকী সাহিত্যেও এ জাতীয় বর্ণনায় কিছু অসদ্ভাব নেই। এমন কি যে শেকস্‌পীয়র সারা পৃথিবীর গর্ব, তিনিও তাঁর লেখক জীবনের আদি পর্বে 'ভেনাস অ্যাণ্ড অ্যাডোনিস' ও 'দি রেপ অব্ লুক্রেশিয়া' নামক দুটি আদিরসাত্মক কাব্য রচনা করেছিলেন। তাছাড়া তাঁর নাটকগুলিরও এখানে সেখানে আদিরসের কিছু কমতি নেই। সুতরাং এই যদি বিশ্বসাহিত্যের প্রকৃত পরিস্থিতি হয় তা হলে কেনই বা একালের সাহিত্যেও আদি রসের চর্চা সমর্থনীয় হবে না? যেহেতু পুরাতন বলেই কেন তাকে অগ্রাহ্য করব?

এর উত্তরে বলি, সাহিত্যের ধারণায় ইতোমধ্যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়ে গেছে। বিশ্বসাহিত্যের স্রোতস্বিনী বেয়ে গত পঞ্চাশ বছরে কত যে জল গড়িয়ে গেছে সে খেয়াল প্রতিবাদী মতের প্রবক্তারা রাখেননি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যে সব দেশে পচনশীল ধনতন্ত্র ও ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থা এখনও টিকে আছে সেই সব দেশের সাহিত্যেই, যেমন পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহের সাহিত্যে ও মার্কিন দেশের সাহিত্যে, দেহবাদী রচনার বাড়াবাড়ি ও ছড়াছড়ি। পরশোষণপুষ্ট বিলাসী ভোগী সমাজেই শুধু এ-জাতীয় অবক্ষয়-মূলক আত্মমুখী সাহিত্যের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব, পরিশ্রম ও কর্মের চেতনাপূর্ণ সমষ্টিকল্যাণ উদ্দীপিত সমাজতন্ত্রী দেশগুলির সাহিত্যে কিন্তু এ-জাতীয় বস্তুবিমুখ আত্মরতিমূলক ভোগোদ্‌গারপূর্ণ রচনাদর্শকে আদৌ প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। এ ব্যাপারে পশ্চিম ইউরোপ আর পূর্ব ইউরোপের সাহিত্যের ভিতর আসমান-জমিন ফারাক।

আমাদের সাহিত্যের কথা যদি ধরা হয় তা হলে মানতেই হবে যে, মঙ্গলকাব্যের যুগ আর আধুনিক সাহিত্যের যুগের মধ্যে রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গীর সুদুস্তর পার্থক্য। এ কথাটা আমাদের সর্বদাই স্মরণে রাখা দরকার যে, ওই দুই যুগের মধ্যবর্তী সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ নামক দুই অসীম শক্তি ও প্রতিভাধর লেখক বাংলাদেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যাঁরা বাংলা সাহিত্যের রুচির আমূল রূপান্তর সাধন করে গিয়েছেন। তাঁরা সাহিত্যের আব-হাওয়াকে সম্পূর্ণ শোধিত করে দিয়ে গিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র এতটা শক্তিসম্পন্ন লেখক না হলেও তিনিও নিজ ক্ষমতাবৃত্তের মধ্যে থেকে বঙ্কিমচন্দ্র আর রবীন্দ্র-নাথের সুরুচির ধারাকেই অনুসরণ করেছেন। এই তিন দিক্‌পাল সাহিত্যস্রষ্টাই

নিজ নিজ ভাবে নরনারীর জৈব সম্পর্কের বিষয়ে লিখেছেন, কিন্তু কোথাও তাঁদের বর্ণনা আব্রুহীনতায় অশালীনতায় পাঠকের রুচিকে নিম্নগামী করেনি। তাঁরা ইঙ্গিত আর সংকেতের সাহায্যে তাঁদের অভীপ্সিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছেন। স্ত্রী পুরুষের মিলনের ঘটনাকে একটা 'ফ্যাক্ট' হিসাবে মাত্র তাঁরা উপস্থিত করেছেন, যৌন মিলনের সাড়ম্বর বা খুঁটিনাটি বর্ণনা করে তাঁরা তাঁদের কল্পনাশক্তির অপমান করেননি। প্রমাণ বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' 'চতুরঙ্গ' ও 'যোগাযোগ' উপন্যাস, শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' 'গৃহদাহ' ও 'চরিত্রহীন' উপন্যাস। অপিচ এঁদের দেহ বর্ণনা সংস্কৃত তথা বৈষ্ণব কাব্যসুলভ ধ্বনির শাসন দ্বারা সুরক্ষিত: এখনকার অনেক লেখকের শ্রুতিকর্কশ খিস্তি-খেউড়ের ভাষার মধ্যে ধ্বনিসৌষম্যের সম্পদ খুঁজে পাওয়া যায় না। সাহিত্যের মূল উপজীব্য শব্দ, শব্দের আর্ট এখনকার কালের তথাকথিত বাস্তববাদী লেখকদের পাল্লায় পড়ে তার কৌলীন্য হারিয়েছে। ইতর শব্দের ক্রমাগত ঘর্ষণে ও সংঘাতে সাহিত্যের আভিজাত্য আর রইল না।

বাংলা কথাসাহিত্যের উল্লিখিত তিন প্রধানের জলজ্যান্ত দৃষ্টান্তের পর জীবনের অবিকৃত রূপ সাহিত্যে ফুটিয়ে তোলার অজুহাতে তাঁদের শ্রদ্ধেয় আদর্শকে অগ্রাহ্য করে বিপরীত প্রতিক্রিয়ামুখে নগ্নতার চর্চায় নিরঙ্কুশ হয়ে ওঠায় যথেষ্ট বুকের পাটা দরকার। স্বীকার করি আমাদের কিছু কিছু হালের লেখক এই বুকের পাটা দেখিয়েছেন, কিন্তু এই প্রদর্শনীকে দুঃসাহস কোনক্রমেই মনে করা চলে না, বরং তার আষ্টেপৃষ্ঠে হঠকারিতার ছাপ স্পষ্ট। এবং সেই সঙ্গে ঐতিহ্যজ্ঞানের অভাবটাও চোখে না পড়ে পারে না। রবীন্দ্রনাথকে ভিক্টোরীয় সুনীতিবাদ কিংবা কৃত্রিম ব্রাহ্ম শুচিতার আবহে লালিত খুঁতখুঁতে রুচির লেখক বলে বর্ণনা করে মহলবিশেষের কাছ থেকে হাততালি কুড়নো যেতে পারে, কিন্তু এ-জাতীয় সস্তা বাহাদুরিপনা বাংলা সাহিত্যের ট্র্যাডিশন তথা রবীন্দ্রনাথের সর্বাতিশায়ী প্রতিভা সম্পর্কে নিতান্ত দীন চেতনারই প্রমাণ দেয়।

আর যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া যায় যে ক্লাসিক সাহিত্যে বা বিগতকালীন বাংলা সাহিত্যে অশ্লীলতা অনাচরণীয় ছিল না, তাতেই বা কী? পুরাতনের নজীরে অশ্লীলতার উপরে দাগা বুলিয়ে যেতে হবে? পুরাতনের আমরা নিতান্ত বশংবদ দাস নই। এত এত ব্যাপারে আমরা পুরাতনকে অস্বীকার করবার সাহস দেখিয়েছি, আর এই ব্যাপারেই শুধু নিরুপায়ের মতো পুরাতনের অঞ্চলসংলগ্ন হয়ে থেকে নতুন কালের সুস্থ আদর্শের দিকে পিঠ দিয়ে থাকতে হবে এটা কেমন কথা? এ কি একপ্রকার অদৃষ্টবাদ নয়? অসহায়ের মতো পুরাতনের কাছে প্রতি-

বোধহীন আত্মসমর্পণ নয়? যাঁরা কথায় কথায় বলেন কালিদাসের কাব্যেও তো সম্ভোগচিত্র ছিল, বৈষ্ণব বা মঙ্গল কাব্যেও তো দেহবর্ণনা ছিল, সুতরাং আমরাই বা কেন তাকে পাশ কাটিয়ে যাব, তাঁরা এক ধরনে নিয়তিবাদের পোষকতা করেন। ঐতিহাসিক নিয়তিবাদের ছাঁচে এর নাম দেওয়া যেতে পারে 'সাহিত্যিক নিয়তিবাদ'। দুই কারণে এই সাহিত্যিক নিয়তিবাদ বর্জনীয়। প্রথমতঃ, এতে পুরাতন সাহিত্যের কোন কোন বিষয়ের প্রতি স্বার্থবুদ্ধিপ্রসূত পক্ষপাত দেখানো হয়; দ্বিতীয়তঃ, এর দ্বারা স্বীয় স্বাতন্ত্র্যে আস্থার অভাব বোঝায়। অশ্লীলতার সমর্থক লেখকগণ প্রাচীন সাহিত্যের অনেক কিছুই বর্জন করেছেন; কিন্তু সেই বৈশিষ্ট্যটির মায়া ছাড়তে পারছেন না যার প্রতি তাঁদের স্বভাবগত ঝোঁক বর্তমান এবং যাকে আঁকড়ে থাকলে তাঁদের বৈষয়িক লাভের সুবিধা সমূহ। এটা হিসাবী বুদ্ধি ছাড়া আর কিছু নয়। এই হিসাবী বুদ্ধি অধঃপতিত এ কারণে যে, এ একেবারেই পরপ্রত্যয়নের বুদ্ধি, আত্মস্বাতন্ত্র্য বা আত্মনির্ভরতার লেশও এর ভিতর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

উপরের যুক্তিক্রম অনুসরণ করে আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে বলতে চাই যে, যে সকল লেখক অশ্লীলতার সমর্থনে বাগ্‌জাল বিস্তার করেন তাঁরা আদৌ প্রগতির শিবিরের লেখক নন। তাঁরাই আসলে প্রতিক্রিয়াশীল, রক্ষণধর্মী, প্রাচীনপন্থী। পক্ষান্তরে, যে সকল লেখক অশ্লীলতা পরিহার করে সাহিত্যের আবহাওয়াকে নির্মল ও শুচিতামণ্ডিত করবার কথা বলেন, তাঁরাই যথার্থ প্রগতিশীল। যথার্থ আধুনিক মনোভাবযুক্ত। তাঁদের মনোভাব প্রগতিশীল আর আধুনিক এই জন্য যে, তাঁরা সাহিত্যকে পুরাতনের দাসত্ববন্ধন মুক্ত করে তাকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে দিতে চাইছেন। তাঁদের দৃষ্টি সম্মুখে বিসর্পিত, পুরাতন কালের ঘোর দ্বারা আচ্ছন্ন নয়। অতীতের পশ্চাৎটান তাঁদের অগ্রসর চলার পথে পদে পদে বাধার সৃষ্টি করছে না।

সত্যি কথা বলতে কি, এখন যে আকারে পশ্চিম ইউরোপে, মার্কিন মুলুকে ও তারই দৃষ্টান্তে আমাদের সাহিত্যের একাংশে অশ্লীলতার বেসাতি চলছে তাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলাই যথেষ্ট নয়, এ-জাতীয় সাহিত্যের অবক্ষয়ের মূল সমাজ-ব্যবস্থায় আরও অনেক গভীরে নিহিত। আমি আগেই বলেছি যে, বিলাসিতাময় ভোগ-কেন্দ্রিক পরগাছা সমাজেই শুধু অশ্লীল সাহিত্যের চর্চা হতে দেখা যায়। এটা অকারণ নয়। ধনতান্ত্রিক সমাজের বিশেষ গড়নের সঙ্গে অশ্লীল মনোভঙ্গীর নিকট সম্পর্ক। এই দৃষ্টিতে অশ্লীল সাহিত্য হল একটি বিকলাঙ্গ শিশুর মতো। ধন-তন্ত্রের ঔরসে বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থার গর্ভে এই বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম। এবং

বিকলাঙ্গ শিশুকে দেখিয়ে মানুষের দয়াপ্রবৃত্তিতে সুড়সুড়ি দিয়ে একশ্রেণীর ভিক্ষাজীবী যেমন ভিক্ষা আহরণ করে, তেমনি এক শ্রেণীর লেখকও অশ্লীল সাহিত্যরূপ বিকলাঙ্গ শিশুর প্রদর্শনীর সাহায্যে মানুষের জৈব প্রবৃত্তিতে সুড়সুড়ি দিয়ে অনুচিত উপায়ে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করে। অন্যান্য দশটা ব্যবসায়ের মতো এ ব্যবসায়েও বিজ্ঞাপনী প্রচারের মহিমা অপরিসীম। কৌশলী প্রচারকগণ প্রায়শঃ প্রচার সাহায্যে রাতকে দিন আর দিনকে রাত করে তুলেছে; যা আদৌ সাহিত্য নয়, পর্নোগ্রাফীর চেয়েও অপকৃষ্ট বস্তু। তাকে অতুলনীয় সাহিত্যসৃষ্টি আখ্যা দিয়ে পাঠক সমাজকে ধোঁকা দিয়ে চলেছে। সম্প্রতিকালে আমাদের সাহিত্যে এ-জাতীয় অপপ্রচার আমরা বিলক্ষণ প্রত্যক্ষ করেছি, তাইতে আধুনিক সাহিত্য-ব্যবসায়ে প্রচারের যে কী সাংঘাতিক ভূমিকা তা হাড়ে হাড়েই টের পেয়েছি।

আমি আমার আলোচনায় কোন গ্রন্থবিশেষের নাম করব না, ইচ্ছা করেই করব না; কারণ অভিজ্ঞতায় দেখেছি নামোল্লেখের দ্বারা এই জাতীয় কুরুচি-পূর্ণ গ্রন্থের প্রচারের পথটাই অধিকতর সুগম করে তোলা হয় মাত্র। সরলমনা পাঠক এর দ্বারা প্রায়শঃ প্রলুব্ধ ও বিভ্রান্ত হন এবং জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে সাহিত্যের নাম ভাঙিয়ে যারা আসলে পর্নোগ্রাফীর কারবার করে তাদের ফাঁদে পা দেন। পাঠক ধূর্ত প্রকাশকের ষড়যন্ত্রের বলি হন তা আমি চাইতে পারি না। কিন্তু কথা তা নয়, কথা হচ্ছে সাহিত্যের মলাটকে রাংতা মুড়িয়ে অতি সংসারে এই যে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট বস্তুকে সাহিত্য বলে চালাবার চেষ্টা করা হয় তার বিপদ সম্পর্কে সকলের হুঁশিয়ার হওয়া প্রয়োজন। আজকাল অশ্লীলতার সমর্থনকারী পত্র-পত্রিকায় এ-জাতীয় যুক্তিক্রমের প্রয়োগ প্রায়শঃ দেখতে পাই। কি? না, সাহিত্যে শ্লীল-অশ্লীল বিচার্য প্রশ্ন নয়; প্রশ্ন হচ্ছে রচনা বিশেষ সাহিত্য হয়ে উঠেছে কিনা সেইটে যাচাই করে দেখতে হবে। সাহিত্যের অনুষঙ্গে শ্লীল-অশ্লীল বলে কথা নেই, সুন্দর বা অসুন্দর এই মানদণ্ডেই মুখ্যতঃ সাহিত্যের বিচার হওয়া কর্তব্য।

এ কথায় হাসব কি কাঁদব বুঝতে পারিনে। কারা এইসব যুক্তি যোগাচ্ছেন? প্রায়ই নবীন প্রজন্মের লেখকের দল, যাঁদের অনেকেরই বয়স এখনও তিরিশ-বত্রিশের কোঠা ছাড়ায়নি। ভাবুন একবার কাণ্ডখানা! সাহিত্য সাহিত্য পদবাচ্য হয়েছে কিনা, সুন্দরের মানোত্তীর্ণ হয়েছে কিনা এ নিরূপণ করতে অনেক সময় একটা গোটা জীবন কেটে যায়: সাহিত্য বিচারক তাঁর সমগ্র জীবনের শিক্ষা অভিজ্ঞতা উপলব্ধি এ কাজে নিয়োগ করেন তবে যদি এ ব্যাপারে কোন

সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তের কিনারায় পৌঁছুতে পারা যায়। আর এঁরা সাহিত্য ক্ষেত্রে ভূমিষ্ঠ হয়েই সুন্দর-অসুন্দর সাহিত্য-অসাহিত্য ইত্যাকার বড়ো বড়ো কথায় আসর সরগরম করবার চেষ্টা করছেন। যদি এঁদের চেপে ধরা যায় সাহিত্যের সুন্দর বা অসুন্দর বলতে এঁরা কী বোঝেন তা ব্যাখ্যা করে বলতে হবে, তা হলে আমি জোর করে বলতে পারি এঁদের কারও মুখে কোন উত্তর যোগাবে না। সুন্দর-অসুন্দর সাহিত্য-অসাহিত্য ওই কথাগুলি আসলে ধরতাই বুলি হিসাবে বলা, ওঁদের যুক্তির ঝুলিতে কথাগুলি stock-phrase হিসাবে সাজানো আছে, কিন্তু এ সব কথার প্রকৃত তাৎপর্য এঁদের জানা নেই, জানবার কথাও নয়। জীবনব্যাপী সাধনায় যে জ্ঞান আয়ত্ত হয়েও হতে চায় না, তা তরুণ বয়সী লেখক সাহিত্যের প্রাথমিক অভিজ্ঞতার সহায়ে কেমন করে আয়ত্ত করবে? সুতরাং এঁদের এই এইসব গালভরা কথাকে বাগভাষিত ছাড়া আর কী বলা যায়?

শ্লীলতা ও অশ্লীলতা

শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রশ্নটি নিয়ে ইতঃপূর্বে বাংলা সাহিত্যে বহু বাদানুবাদ হয়ে গেছে। অনেক বাক্যের ধূলি ও তর্কের ঝড় এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে কিছুদিন বাদে বাদেই উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। এর শুরু আজ থেকে অনেক বছর আগে, রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা কাব্যসৃষ্টির প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে। তারপর পর্যায়ক্রমে যতীন্দ্রমোহন সিংহের সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা-কল্পে অভিযান, পাবলিক প্রসিকিউটর তারকনাথ সাধুর অতিরিক্ত শুচিতার বাই এবং সেই ব্যক্তিকের প্রভাববশে সাহিত্যশাসনের অত্যুৎসাহ, কল্লোল গোষ্ঠীর কোন কোন লেখকের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার দায়ে লালবাজারের সমনজারী এবং তাঁদের কিছু কিছু বই নিষিদ্ধকরণ, কল্লোল বনাম শনিবারের চিঠির অবিরাম বাক্যদ্বন্দ্ব, বিচিত্রা মাসিকের পৃষ্ঠায় রবীন্দ্র-নাথের 'সাহিত্য ধর্ম' নামক বিখ্যাত বিতর্কিত প্রবন্ধের প্রকাশ এবং সেই প্রবন্ধের বক্তব্যকে কেন্দ্র করে ওই প্রবন্ধের পক্ষে-বিপক্ষে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শরৎচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী প্রমুখ একাধিক রথী-মহারথীর লেখনী ধারণ, অশ্লীলতার বিরুদ্ধে শনিবারের চিঠির সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের নিরবচ্ছিন্ন প্রচার-অভিযান এবং তাঁর সেই কার্যে মোহিতলাল মজুমদার, অশোক চট্টোপাধ্যায়, যোগানন্দ দাস, অমল হোম প্রমুখ বিশিষ্ট সমালোচক ও সাংবাদিকদের সহায়তা দান, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে কবিগুরুর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সভায় বিবদমান দুই পক্ষের প্রতিনিধিদের একত্র জমায়েত এবং শ্লীলতা-অশ্লীলতার মামলার নিষ্পত্তিকরণের চেষ্টা —প্রভৃতি ও ইত্যাকার আরও অনেক ঘটনা ঘটে গেছে যার থেকে বুঝতে পারা যায় শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রসঙ্গটিকে ঘিরে এযাবৎ বাংলা সাহিত্যে জল বড় কম ঘোলা হয়নি।

ঘোলা জল এখনও থিতোবার লক্ষণ নেই, কিছুকাল আগেও সমরেশ বসু নামক একজন নূতন প্রজন্মের কথাকারের রচনাকে কেন্দ্র করে আবার নতুন করে বিতর্কের সূত্রপাত হয় এবং আবার নতুন করে পক্ষে ও বিপক্ষে শিবির সন্নিবেশ হতে দেখা যায়। প্রশ্নটির মীমাংসা-কল্পে একাধিক বিতর্ক সভার অনুষ্ঠান হয় এবং তার কয়েকটিতে এই ক্ষুদ্র লেখককেও অশ্লীলতার বিরুদ্ধে যুক্তিক্রম বিস্তার করে তাঁর বক্তব্য নিবেদন করবার জন্য ডাকা হয়।

ইতঃপূর্বে এই লেখক শনিবারের চিঠির 'প্রসঙ্গ-কথা' বিভাগে দেহবাদ এবং দেহবাদী সাহিত্যের কুফল সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে কিছু প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। সেই প্রবন্ধমালার সূত্র ধরেই তাঁর এ সব আলোচনায় আমন্ত্রণ ও অংশ গ্রহণ।

শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রশ্নটি নিয়ে অতীতে এবং সম্প্রতি এতই যখন আলোচনা-প্রত্যালোচনা বাদ-বিবাদের একশেষ হয়েছে, তখন আবার কেন আরেক দফায় এই বিতর্ককে চাগিয়ে তোলার কী সার্থকতা? তন্ন তন্ন আলোচনায় বিষয়টির হদ্দ হয়ে যাওয়ার পরও তার পুনরুত্থাপনের কী যৌক্তিকতা? এই লেখকের কি বিষয়ের এতই অভাব হয়েছে যে আর কোন বিষয় হাতের কাছে না পেয়ে সেই পুরনো কাসুন্দিই আবার নতুন করে ঘাঁটবার জন্য তিনি কলম শানিয়ে ধরেছেন?

ঠিক তা নয়। অকারণে এই প্রবন্ধ ফাঁদা হয়নি। শ্লীলতা-অশ্লীলতাকে ঘিরে যে-বিতর্ক, ইতোমধ্যে তার পরিপ্রেক্ষিত বদলে গিয়েছে। এতকাল যে-বিতর্ক ছিল নিতান্তই সাহিত্যের সীমায় সীমাবদ্ধ, তা আর নিছক সাহিত্যভুক্ত হয়ে নেই, তার ভিতর সমাজতাত্ত্বিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ভাবনার উপাদানের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। বিষয়টিকে এখন বৃহত্তর পার্সপেক্টিভের আয়তনের মধ্যে ফেলে বিচার করার সময় হয়েছে। সেইজন্যই আর এক দফা বিষয়টির অবতারণা, নয়তো এ নিবন্ধ লিপিবদ্ধ করবার প্রয়োজনই দেখা দিত না।

একটা কথা গোড়াতেই স্পষ্ট করে বলা দরকার। নতুন বিচারে সেইটাই প্রথম কথা। অশ্লীলতার বিরুদ্ধে যাঁরা লেখনী ধারণ করেন কিংবা বিতর্ক-সভায় অথবা আলোচনা চক্র ইত্যাদিতে বক্তব্য রাখেন, তাঁদের সবাইকে প্রাচীনপন্থী, রক্ষণশীল, পিউরিটান মনোভাবাপন্ন ইত্যাদি বিচিত্র আখ্যার লেবেল দিয়ে আখ্যাত করার একটা প্রতিবাদহীন রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গেছে আমাদের সাহিত্য-সংসারে। এবং যেহেতু এই রেওয়াজের প্রতিবাদ হয় না বা কেউ প্রতিবাদ করার প্রয়োজন মনে করেন না, সেই কারণে তারই উল্টো পিঠে এটা স্বতঃসিদ্ধের মত ধরে নেওয়া হয় যে, যেসব লেখক অশ্লীলতার সপক্ষে সোচ্চার, তাঁরা সব প্রগতিশীল কোটির শিল্পী, অগ্রসর ভাবনার ভাবুক, সংস্কারমুক্ত চিন্তাদর্শের ধারক ও বাহক। আমার প্রস্তাব হলো, অভিধাগুলির স্থান-পরিবর্তন হওয়া দরকার। অর্থাৎ, যাঁরা অশ্লীলতার বিরুদ্ধাচারী এবং দেহবাদী সাহিত্যরচনাকে সাহিত্য এবং সমাজ উভয়েরই

পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করেন, তাঁদের প্রগতিশীল আখ্যায় চিহ্নিত করা হোক এবং যাঁরা অশ্লীলতার পক্ষ সমর্থনকারী বলে বর্ণিত, তাঁদের গায়ে প্রতিক্রিয়াশীলতার লেবেল-চিহ্ন এঁটে দেওয়া হোক। বাস্তবতও এই স্থান পরিবর্তন যুক্তিযুক্ত। কেন যুক্তিযুক্ত সে-কথাটা একটু বিশ্লেষণসাপেক্ষ।

একটা জিনিস খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয় যে, যেসব লেখক বলেন যে সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতা বলে কিছু নেই, সাহিত্যের ভাল-মন্দের বিচার হওয়া উচিত বিশুদ্ধ শিল্পোৎকর্ষের মানদণ্ডে, কোন্‌টা শ্লীল কোন্‌টা অশ্লীল এর কোন নির্দিষ্ট ধরাবাঁধা সংজ্ঞা নেই সুতরাং এই নিয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মতভেদ হতে বাধ্য আর সে-কারণে এটা সাধারণ বিতর্কের বিষয়ীভূত হতে পারে না, হওয়া উচিত নয়, লেখক বাস্তবে যা প্রত্যক্ষ করবেন তাকেই অবিকৃতরূপে পরিবেশন করবেন তাঁর সৃষ্টিতে, এ ব্যাপারে আগে থেকে তাঁর হাত-পা বেঁধে দেওয়া চলতে পারে না, ইত্যাদি ইত্যাদি—তাঁরা কিন্তু প্রায় সবাই কলাকৈবল্যবাদে বিশ্বাসী শিল্পী অস্কার ওয়াইল্ডের 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক' নীতির পরিপোষক, পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন দেশের সাহিত্য-ঘরানায় গালভরা বুলি প্রয়োগ করে যাকে শিল্পীর স্বাধীনতা বলা হয়, তার প্রবক্তা। কিন্তু আমার বিনীত বক্তব্য হলো: এসব মত বা শিল্পাদর্শ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সমাজজীবনের একালীন পরিবর্তিত স্থিতিতে একেবারেই বাসী হয়ে গেছে। এ সব বস্তা-পচা পুরনো মতের উদ্গার তুলে পূর্বোক্ত লেখকের দল শুধু যে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁদের কায়েমী-স্বার্থ আর স্থিতাবস্থার ধ্বজাবহনকারী মধ্যবর্তী অবস্থানটাকেই চিহ্নিত করেন তা-ই নয়, সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা একথারও প্রমাণ দেন যে, যুগের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে চলায় তাঁরা অপারগ, তাঁরা এখনও উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের ইংলণ্ড ও ফরাসী দেশের কথাসাহিত্যে যে দুটি শিল্পাদর্শ সব-চেয়ে চালু মুদ্রা ছিল: কলাকৈবল্যবাদ ও প্রকৃতিবাদ (ন্যাচারালিজম্), তারই বৃত্তসীমার মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে মরছেন। অর্থাৎ, এঁরা পুরাতন একটি মতাদর্শকেই আধুনিক মতাদর্শ বলে চালাবার চেষ্টা করছেন এবং তার ছত্রছায়ার তলায় আশ্রয় নিয়ে অসার প্রগতিশীলতার অভিমানে ডগমগ হয়ে উঠছেন।

কিন্তু বলা আবশ্যক, এটা প্রগতিশীলতাও নয়, অগ্রসর ভাবনার পরিচয়বাহী কোন নতুন কথাও নয়। ক্রমাগত ব্যবহারে-ব্যবহারে এই মত একেবারেই

জীর্ণ হয়ে গেছে, তার থেকে পর্যুষিত কদন্নের দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। ইতোমধ্যে সাহিত্য-সংসারের টেমস আর সেইন নদী দিয়ে অনেক অনেক জল গড়িয়ে গেছে। কালে কালে কলাকৈবল্যবাদ আর ন্যাচারালিজমের স্থান দখল করেছে ক্রিটিকাল রিয়ালিজম যার মুখ্য প্রবক্তা হলেন ফরাসী সাহিত্যে ফ্লোবেয়ার, জোলা, মোপাসাঁ প্রমুখ শক্তিশালী কথাসাহিত্যিকগণ, এসেছে রোলাঁর 'মানবতার জন্যই শিল্প' তত্ত্ব, এসেছে ইংলণ্ডের ডি. এইচ. লরেন্সের মুখে তার সম্পূর্ণ বিপরীত শিল্পাদর্শের ঘোষণা: 'আর্ট ফর মাই সেক', অর্থাৎ আমি আমার নিজের জন্যই শিল্প রচনা করি, আর কারও জন্য নয়, ইত্যাদি। এই সব বিভিন্ন মতের বিবর্তন হতে হতে শেষ পর্যন্ত শিল্পমত ম্যাক্সিম গর্কির পরিপোষিত 'সমাজ বাস্তবতা' (সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম)-এর নীতিতে এসে একটি সুষ্ঠু ও সুসঙ্গত পরিণতি লাভ করেছে। সমাজ-বাস্তবতাই শিল্পাদর্শের শেষ কথা এমন বলা আমার অভিপ্রায় নয়; তবে সাহিত্যনীতির বিবর্তন ও পরিবর্তনের পথে এটা যে একটা মস্ত বড় দিক্‌চিহ্ন, সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

পরিতাপের বিষয় হলো, আমাদের কলাকৈবল্যবাদী তত্ত্বের লেখকগণ এ বিবর্তন ও পরিবর্তনের কোন খবরই রাখেন না। রাখলেও তাঁরা জ্ঞানপাপী, তাঁদের শ্রেণীগত ও ব্যক্তিগত স্বার্থের সুবিধার জন্য তাঁরা এই বিবর্তনের স্তর-পরম্পরাগুলির দিকে পিঠ দিয়ে থেকে এখনও কলাকৈবল্যবাদ ও প্রাকৃতবাদ তত্ত্বের অঙ্কন-সংলগ্ন হয়ে আছেন এবং থেকে থেকে ওই সব অধুনা-বাতিল ধরতাই বুলির চর্বিত-চর্বণ করে চলেছেন। যুগ এগিয়ে গেছে, অথচ এঁদের সৃষ্ট সাহিত্য পুরনো যুগেই রয়ে গেছে—এই যে কাল-বারণ দোষ, এই দোষে এঁদের সকলেরই রচনা কম-বেশী দুষ্ট।

পক্ষান্তরে, যে সব লেখক ও সমালোচক সুরুচি, সুনীতি, শোভনতা ও বৃহত্তর সমাজমঙ্গলের মুখ চেয়ে সাহিত্যকে মলিনতামুক্ত রাখবার দাবী জানান এবং বলেন যে, সব বাস্তবই সমান চিত্রণযোগ্য নয়, ভাল-ভাল বাস্তবের গাদা থেকে ঝাড়াই-বাছাই করে কেবলমাত্র সেই সব বাস্তবকেই সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে হবে যেগুলির ভিতর সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার উপকরণ লুক্কায়িত আছে এবং যাদের পরিবেশনায় আমাদের চিত্তের রস, সৌন্দর্য ও সমাজকল্যাণের ক্ষুধা এককালীন পরিতৃপ্ত হয়, সাহিত্য শিল্প আর ফোটোগ্রাফী শিল্প এক নয়, ইত্যাদি ইত্যাদি—তাঁদের অভিমতকে নিতান্ত অরুচিত ও অন্যায়ভাবে রক্ষণশীলতার দায়ে অভিযুক্ত করে এমন একটা

ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করবার চেষ্টা করা হয় যে, এঁরা যেন সব গত যুগের মানুষ, গত যুগের পিউরিটান সমালোচকসুলভ স্কুলমাস্টারী বেত্রদণ্ড উদ্যত করে সাহিত্যশাসন করতে এসেছেন। এঁরা সাহিত্যবাদী নন, এঁরা আসলে নীতিবাদী; চোখে নীতিবাদের চশমা এঁটে এঁরা সাহিত্যকে দেখার চেষ্টা করেন বলে প্রায়শ ভুল দেখেন, সমাজ শাসকের ভূমিকা সাহিত্য-সংসারে মানায় না, ইত্যাদি ও প্রভৃতি।

কিন্তু পূর্বেই বলেছি, এই বর্ণনাগুলি যাঁদের লক্ষ্য করে প্রয়োগ করা হয়, তাঁদের সম্পর্কে সেগুলি আদৌ প্রযোজ্য নয়। বরং উল্টো। সাহিত্যে সুরুচি ও শোভনতার প্রবক্তারা কেউ স্কুলমাস্টারের চাপকান চড়িয়ে সাহিত্যের আঙিনায় আসেননি, এসেছেন সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজকে যথাযথ সুস্থ পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা সামনে স্থির রেখে সাহিত্যকে সুন্দর করে গড়ে তোলার তাগিদে। বিগত কালের যতীন্দ্রমোহন সিংহ, তারকনাথ সাধু প্রমুখ অশ্লীলতা-বিরোধী ব্যক্তিরা যে-মনোভাব নিয়েই সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে ওকালতি করে থাকুন না কেন, তাঁদের মনোভাবের সঙ্গে একালীন সুনীতিবাদীদের মনোভাবের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। একালের যাঁরা সাহিত্যের আবহাওয়াকে নির্মল রাখবার অনুকূলে বক্তব্য রাখেন তাঁদের সকলে না হলেও একটা উল্লেখযোগ্য অংশ সমাজ-বাস্তবতার নীতিতে বিশ্বাসী। তাঁরা মনে করেন মানুষের মঙ্গলের কারণে সাহিত্যের সমাজ-সচেতন হওয়া দরকার এবং সেই হেতু সাহিত্যের বিষয়বস্তু নির্বাচনে নির্বিচার বাস্তবতার রীতি গ্রাহ্য নয়, গল্প-উপন্যাস-কবিতা-নাটক ইত্যাদির উপাদান চয়নে বাস্তবের গ্রহণ-বর্জন-নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা আছে। অর্থাৎ এঁরা নির্বাচনপন্থী; জীবনের ঘটনামাত্রই সাহিত্যের চিত্রিতব্য বিষয় বলে মনে করেন না, জীবনের বাস্তবে আর সাহিত্যের বাস্তবে কোথাও একটা সীমারেখা টানার প্রয়োজনীয়তা এঁরা মানেন। একজোড়া নরনারীর প্রেমাকুলতার পরিণামে জৈব মিলন সংঘটিত হওয়ার তথ্য পরিবেশনার ক্ষেত্রে এঁরা ইঙ্গিত আর ব্যঞ্জনার সাহায্যে তথ্যটির সংকেত দেওয়াই যথেষ্ট মনে করেন, তার জন্য মিলনদৃশ্যের প্রতিটি খুঁটিনাটির বর্ণনাকে আবশ্যিক বিবেচনা করেন না, বরং মনে করেন এ-জাতীয় নিঃশেষকর (exhaustive) বর্ণনায় শিল্পের রসহানি ঘটায়। নরনারীর মিলনের অছিলামাত্রে বেডরুম অথবা অন্য কোন মিলনস্থলের পরিবেশের ও আচরণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পেশ করতে হবে—এটা সাহিত্যেরও নীতি নয়, জীবনেরও নীতি নয়। নরনারীর দেহ-কাণ্ডের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রেখাবিন্যাস ও তাদের তত্ত্ব সকলেরই

জানা আছে, এটা এমন কিছু গুহ্যতত্ত্ব নয় যে তার মুখে সর্বদাই কুলুপ এঁটে রাখতে হবে : ডাক্তাররা স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রয়োজনে ও দেহকে নিরাময় করে তোলবার তাগিদে হামেশাই শারীর সংস্থান-বিদ্যার চর্চা করেন।৹ তাই বলে সাহিত্যে দেহ-বর্ণনায়, বিশেষ নারীদেহ-বর্ণনায়, 'মওকা' পেলেই কোমর বেঁধে ওই দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-সংস্থানের আদ্যোপান্ত বিবরণদানে মেতে উঠতে হবে—এই অত্যুৎসাহী নেবু-চটকানোর রীতি সুরুচিসম্মত তো নয়ই, পাঠকের অন্তর্নিহিত পরিমিতি-বোধকেও ক্ষুণ্ণ করে। তাঁর সহজাত আতিশয্য-বিমুখতার আকাঙ্ক্ষা এতে পীড়িত হয়, পরাহত হয়। সৌন্দর্য-বর্ণনায় সৌন্দর্যকে ঢেকে-ঢেকে বর্ণনাতেই তার মাধুর্য ; হাটের মাঝখানে সৌন্দর্যকে সর্বাংশে অনাবৃত করে দেখালে সৌন্দর্যের আর জাত থাকে না।

পূর্বের অনুচ্ছেদগুলির সূত্র ধরে এইখানে একটা ব্যক্তিগত কথার অবতারণা করছি, পাঠক মার্জনা করবেন। শনিবারের চিঠির পৃষ্ঠায় এই লেখক যখন মাসের পর মাস ধারাবাহিকক্রমে দেহবাদী সাহিত্যের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করছিলেন তখন একটি মহলবিশেষ থেকে এই লেখকের বিরুদ্ধে নানাবিধ কটূক্তির বন্যা বইয়ে দেওয়া হয়। তার মধ্যে একটি কটূক্তি ছিল এই যে, এই লেখক স্কুলমাস্টারী শুচিবাইয়ের মনোভঙ্গী নিয়ে সাহিত্য-সমালোচনায় অবতীর্ণ হয়েছেন, এঁর দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিক্রিয়াশীল। আমি এ কথার সেদিনও সবিনয়ে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিবাদ করেছিলাম, আজও প্রত্যয়িত স্বরে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। বটেই তো! আমরা যাঁরা সাহিত্যের পরিমণ্ডলকে নির্মল রাখার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে প্রতিবাদ প্রতিরোধ আর শাসনবাদন সমালোচনার মধ্য দিয়ে সমাজকে বিপ্লবের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছি তাঁরা হলাম প্রতিক্রিয়াশীল আর যাঁরা স্থিতাবস্থা আর সর্বপ্রকার প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে পুরাতন সমাজ-কাঠামোকে জীইয়ে রাখবার তাগিদে এদেশের সুস্থ ও সুন্দর যৌবনশক্তিকে বিপথে চালিত করবার অভিসন্ধি প্রণোদিত হয়ে গল্প-উপন্যাসে কেবলই নরনারীর রিরংসাবৃত্তিকে অকারণে খুঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করেন এবং সেই সুযোগে বেশ দুপয়সা কামিয়ে নেন, তাঁরা হলেন প্রগতিশীল! কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ। এই না হলে আর বাজারী সাহিত্যের এমন বোল-বোলাও হবে কেমন করে আজকের পশ্চিমবাংলায়। লক্ষ্য করে দেখেছি, 'শিল্পীর স্বাধীনতা', 'শিল্পীর স্বাতন্ত্র্য' কথাগুলি এঁদের মুখেমুখে অনায়াস-মসৃণ আপ্তবাক্যের মত ফেরে। যখনই সাহিত্যের আবহাওয়াকে শোধন করবার কথা হয়, বাংলার যুবসমাজকে অপসংস্কৃতির কুপ্রভাব থেকে রক্ষা করে তাদের স্বচ্ছ ও সুস্থ

করবার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়, অমনি এঁরা শিল্পের স্বাতন্ত্র্য, শিল্পীর স্বাধীনতা ইত্যাদি বিপন্ন হওয়ার ধুয়া তুলে হা হা করে সব তেড়েমেড়ে আসেন বিপক্ষ মতবাদীদের আঘাত করবার জন্য। যেন শিল্প-সাহিত্যে এঁদেরই মৌরসীপাট্টার অধিকার, আর কারও তাতে একচুল অধিকার থাকতে নেই।

পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি নিয়ে পুনরপি বলছি, শিল্পীর স্বাধীনতা কথাটা তার প্রকৃত সমাজ-সম্বন্ধ থেকে বিচ্যুত হলে একটা ধরতাই বুলির বেশী মর্যাদা পেতে পারে না, বৃহত্তর সমাজহিত, সর্বসাধারণের কল্যাণ, গণমানুষের মঙ্গলের পরিপ্রেক্ষিতেই শুধু শিল্পীর স্বাধীনতা কথাটার যা-কিছু মূল্য, নয়তো ওই বহুশ্রুত, বহুব্যবহারজীর্ণ পুরনো কথাটার কানাকড়ির মূল্যও নেই। সমাজের এক বিশেষ শ্রেণীভুক্ত লেখকদের কায়েমী স্বার্থ পূরণের জন্য কথাটার উদ্ভাবনা হয়নি, কথাটা তাঁদের মুখে শোভা পায়ও না। যাঁদের লেখনী সাহিত্যসেবার অজুহাতে আসলে শিল্পপতি-ধনিক-বণিক-ব্যবসাদারদের সেবায় নিয়োজিত এবং সমাজের সুস্থ ধ্যান-ধারণা ভাবনা-কল্পনাকে একটা মতলবী পরিকল্পনার অংশরূপে বিপথে চালিত করবার কাজে সচেতনভাবে প্রযুক্ত, তাঁদের আবার শিল্পের স্বাধীনতা কি? তাঁরা তো সব ভাড়াটে কলমচালিয়ে মাত্র—মালিকের আজ্ঞাবহ কতকগুলি বশংবদ জীব।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যে সব বিশিষ্ট লেখকদের রচনার ভিত্তির উপর বাংলা সাহিত্যের মজবুত ও সুন্দর সৌধটি দাঁড়িয়ে আছে তাঁদের একজনাও দেহবাদী লেখক নন—অশ্লীলতার কারবার কেউ তাঁরা করেননি। কথা-সাহিত্যের বিভাগটিকে যদি আমরা এই উদ্দেশ্যে বিশেষ পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্ররূপে নির্বাচন করি ও পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাবো, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায়, 'বনফুল', প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ এঁদের কারও লেখাতেই কামায়নের চিত্র নেই। সত্য বটে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় কোথাও কোথাও দেহচিত্রণ উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছে, কিন্তু যখন আমরা স্মরণ করি যে এই অপরিসীমশক্তিধর বাস্তববাদী লেখক বর্তমান পচা-গলা-ভাঙনধরা সমাজের বীভৎস নগ্ন রূপটিকে তুলে ধরবার প্রয়োজনেই এ কাজ করেছিলেন এবং এই অভিপ্রায়ের পিছনে তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল এই সমাজকে ভেঙে গুঁড়িয়ে

তার চিন্তাচূর্ণের উপর নতুন সম-সমাজের বুনিয়াদ গড়ে তোলার জন্ত জনসাধারণের উদ্দেশে আহ্বান, তখন আমরা তাঁর দেহবাদকে অন্তদের চিত্রায়িত দেহবাদ থেকে একটু স্বতন্ত্র কোঠায় না ফেলে পারি না। উদ্দেশ্য দিয়েই উদ্দেশ্য-প্রয়াসীর অভিপ্রায়ের বিচার করতে হয়। এই মানদণ্ডে সমরেশ বসু বা তাঁর অনুরূপ অন্যান্য লেখকদের দেহবাদের সঙ্গে মানিক অভিব্যক্ত দেহবাদের আসমান-জমিন পার্থক্য। প্রথমোক্ত কোটির লেখকদের দেহবাদ প্রাকৃতবাদ আশ্রিত; অন্যপক্ষে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেহবাদ সমাজ-বাস্তবতার লক্ষ্যপ্রসূত। দুইয়ের জাতগোত্র একেবারেই আলাদা। আর তাছাড়া, এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও বিবেচ্য। মানিক সাহিত্যের দুটি সুস্পষ্ট পর্ববিভাগ আছে: একটি তাঁর সাহিত্যের মনোবিকলন পর্ব, যা ১৯৩০ কি তার কাছাকাছি সময় থেকে ১৯৪৪ ৪৫ সাল পর্যন্ত প্রায় দেড় দশক কাল ব্যেপে বিস্তৃত; দ্বিতীয়টি তাঁর প্রতিবাদ প্রতিরোধ বিদ্রোহের পর্ব: এই কালের আয়তনসীমা ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৬ (মৃত্যুর বৎসর) এই কিঞ্চিদধিক দশককাল জুড়ে প্রসারিত। দ্বিতীয় পর্বে তাঁর সাহিত্য জটিল-কুটিল গহনচ্ছেদী মননের পথ ছেড়ে ক্রমশই সরল ও বহির্মুখী হয়ে আসছিল, ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতার অভিশাপমুক্ত হয়ে তা ক্রমশঃ জনগণের সঙ্গে একাত্ম হবার অনুভূতিতে মিশে গিয়েছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যা-কিছু দেহবাদ তা তাঁর ওই প্রথম পর্বের রচনায়; দ্বিতীয় পর্বের রচনায় ওই বস্তুর প্রভাব সামান্যই চোখে পড়ে। কাজেই এই মানসিকতার লেখকদের সঙ্গে মানিকের নাম একসঙ্গে উচ্চারণ করা চলে না; করলে তাঁর প্রতিভার অপমাননা করা হয়।

আরও লক্ষণীয় যে, অপেক্ষাকৃত নূতন প্রজন্মের যে সব কথাসাহিত্যিক বাংলার পাঠকসমাজের উপর কমবেশী যথার্থ প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়েছেন, তাঁদের কারও লেখাতেই এ ধরনের দেহবাদের পরিচয় নেই। যথা, বিমল মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, রমাপদ চৌধুরী, মিহির আচার্য, চিত্ত ঘোষাল তপোবিজয় ঘোষ, কৃষ্ণ চক্রবর্তী প্রমুখ এঁদের লেখাই যে ক্রমশ পাঠক-সাধারণের দ্বারা উত্তরোত্তর আদৃত হয়েছে, পক্ষান্তরে অশ্লীলতাবাদী লেখকেরা কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন—তাতে বোঝায় বাংলার পাঠককুল সুস্থ সুন্দর আদর্শ বিশিষ্ট রচনারই পক্ষপাতী।

কিছুকাল আগে দেশব্যাপী শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হলো। সুতরাং এই স্থলে শরৎ-সাহিত্যের প্রতি একটি বিশেষ প্রয়োগঘটিত সম্যক্‌দৃষ্টি

ও প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হতে পারে। শরৎচন্দ্র কোথাও কি তাঁর সাহিত্যে অশ্লীলতাকে কণামাত্র প্রশ্রয় দিয়েছেন? অথচ তাঁর কতই না সুযোগ ছিল? বড় লেখক মাত্রেই দেহজ আকর্ষণের ইঙ্গিতমাত্র দেন, ওই আকর্ষণের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে মাত্রাজ্ঞানের ভারসাম্য হারান না। তাঁরা ঘটনার বা সম্ভাব্য ঘটনার মোটা একটা বিবৃতি মাত্র উপস্থিত করেন, তার অন্ধি-সন্ধি বর্ণনায় লেখনীর শক্তি অযথা ব্যয় বা লেখার সময় অনাবশ্যক নষ্ট করেন না। তাঁরা ঘটিত, ঘটমান বা ঘটিতব্য ক্রিয়ার আভাস দিয়েই ক্ষান্ত; তার সীমা ছাড়ানোটাকে সাহিত্যের সীমা ছাড়ানোর এবং পর্নোগ্রাফীর এলাকায় অনুপ্রবেশের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করেন। এবং যেহেতু শরৎচন্দ্র অসাধারণ বড় লেখক ছিলেন, সেই কারণে তিনিও এই রীতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন। কোন অবস্থাতেই শোভনতা বা শালীনতার গণ্ডী অতিক্রমণে প্রলুব্ধ হননি।

অথচ যাকে বলে জীবনের অন্ধকার দিক, তার পরিচয় তাঁর নিজের জীবনে বড় কম ছিল না। গতানুগতিকরহিত উড়নচণ্ডী জীবন যাপন করতে গিয়ে তিনি আঁজলা আঁজলা ভরে দুহাতে সমাজ-বহির্ভূত মলিন জীবনের ঘোলাজল পান করেছিলেন। আজকের দিনের অনেক লেখকের তুলনায় এই দিকে তাঁর অভিজ্ঞতার পুঁজি এতই সমৃদ্ধ ছিল যে তাই দিয়েই তিনি কয়েকপ্রস্থ রগরগে বই লিখে যেতে পারতেন। কিন্তু তা কি তিনি করেছেন? যেহেতু তিনি ছিলেন সত্যিকারের একজন সাহিত্যশিল্পী এবং সীরিয়াসধর্মী লেখক, সেই কারণে তিনি তাঁর গল্পে-উপন্যাসে সাহিত্যের স্বাধর্মের সীমা কোন অবস্থাতেই লঙ্ঘনকরেন নি, বাস্তব-চর্চার নামে কখনো নোংরা ঘাঁটেননি। শরৎচন্দ্র জীবনের সীমানা আর সাহিত্যের সীমানার পার্থক্য মানতেন—দুইকে একাকার করে ফেলেননি। তিনি জীবনধর্মী সাহিত্যিক ছিলেন, তার মানে এ নয় যে জীবনের তাবৎ অভিজ্ঞতাকেই তিনি সাহিত্যের মালমশলা রূপে ব্যবহার করেছিলেন। সেই সমস্ত মালমশলাকেই তিনি সাহিত্যের সমৃদ্ধির কাজে জীবন থেকে আহরণ করেছিলেন যাতে সমাজ এগিয়ে চলার দিগদর্শন লাভ করতে পারে, মানুষ বেঁচে থাকার ও সংগ্রাম করার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়। জীবনধর্মী সাহিত্য বলতে জীবন ও সাহিত্যের একীকরণ বোঝায় না, বোঝায় সাহিত্যে জীবনের সুনির্বাচিত রূপের প্রতিফলন। সে কারণেই তাঁর সাহিত্য বিধিমতে উৎসর্গীকৃত দেখতে পাই।

ভলতেয়ার ও বার্নার্ড শ

বাংলা সাহিত্যে ভলতেয়ার ও বার্নার্ড শ'-র মেজাজের লেখকের কেন আবির্ভাব হয় না, এ আমাদের অনেক দিনের আক্ষেপ। খুব সম্ভব এ দেশের কর্তাভজা মনোভাব, অতিরিক্ত ঐতিহ্যপ্রীতি ও সাহিত্যে সমাজ-সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর আপেক্ষিক অভাব এইজন্য দায়ী। অথবা এর অন্য কোন কারণ থাকতে পারে, ঠিক বলতে পারব না। তবে কারণ যাই হোক, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, ফরাসী সাহিত্যে ফরাসী বিপ্লবের পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ভলতেয়ার তাঁর অগ্নিবর্ষী রচনাদির দ্বারা যে বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করে গেছেন, অথবা বার্নার্ড শ' বিগত শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে এই শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইংরেজী সাহিত্যে ইংরেজ জাতির ভণ্ডামি কপটতা শাঠ্য ইত্যাদির মুখোশ উন্মোচন করে নাট্য ও সমালোচনার মাধ্যমে যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্রূপের চাবুক চালিয়ে গেছেন, তার সমধর্মী ভূমিকা পালন করবার মত লেখকের একান্তই অভাব বাংলা সাহিত্যে। এ বাংলা সাহিত্যের এবং আমাদের বিশেষ দুর্ভাগ্য। কেন না বাঙালী পাঠক সম্প্রদায়কে তাঁদের অভ্যস্ত জড়ত্বের আড়ষ্টতা থেকে জাগিয়ে তোলবার জন্য এই রকমের ধাত যুক্ত লেখকের খুবই প্রয়োজন ছিল—এমন লেখক, যিনি কোদালকে কোদাল বলতে কোন অবস্থাতেই দ্বিধা করবেন না এবং স্বীয় প্রতিষ্ঠা আর জনপ্রিয়তাকে বিপন্ন করেও সত্যকে অবিচল নিষ্ঠায় আঁকড়ে ধরে থাকবেন।

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই জানেন ভলতেয়ার আর রুশো এই দুই চিন্তানায়ক বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রচারের মধ্য দিয়ে ফরাসী বিপ্লবের জমি প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁরা দু'জন উপযুক্ত ভাবের বাতাবরণ প্রস্তুত করে দিয়ে না গেলে প্রথমে মন্তেস্কু ও লাফায়েত এবং পরে দাঁতঁ, মারাত, রোবসপীয়র প্রমুখের পক্ষে ফরাসী বিপ্লব ঘটানো সম্ভব হতো না। ভলতেয়ার আর রুশো তাঁদের অনলবর্ষী লেখনীর সাহায্যে ফরাসী জনমানসের ভিতর বিদ্রোহের মনোভাব সঞ্চারিত করে গিয়েছিলেন, তবেই পরবর্তী সময়ে ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হওয়া সম্ভব হয়েছিল।

অথচ ভলতেয়ার আর রুশোর চিন্তাধারায় ছিল আকাশ-পাতাল পার্থক্য। ভলতেয়ার রাজতন্ত্র, যাজকতন্ত্র আর অভিজাততন্ত্র এই তিন তন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর দীর্ঘ আয়ুর প্রসাদ পুষ্ট জীবনে বিরামহীন সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন;

আর রুশো চেয়েছিলেন সমস্ত কৃত্রিম রাষ্ট্রিক আর সামাজিক বন্ধন-পীড়ন থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃতির কোলে ফিরে যেতে। একজন রাষ্ট্রব্যবস্থার যুগোপযোগী সংস্কারের পক্ষপাতী; অন্যজন আদিমতার প্রত্যাবর্তনের প্রচারক। দুইয়ের আদর্শে আদৌ কোন মিল ছিল না। অথচ কী আশ্চর্য, দুইয়েরই ভাবধারা ফরাসী বিপ্লবকে কার্যান্বিত ও ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করেছিল। দুই বিপরীত প্রান্ত থেকে অগ্রসর হয়ে এঁরা ফরাসী বিপ্লবকে এক সংযোগবিন্দুতে এনে মিলিয়েছিলেন। এইখানেই এঁদের যুগ্ম-ভূমিকার সার্থকতা।

রুশো তাঁর 'সোশ্যাল কনট্রাক্ট' গ্রন্থ লিখে এক কপি ভলতেয়ারের কাছে অভিমতের জন্য পাঠিয়েছিলেন। উত্তরে ভলতেয়ার রুশোকে লিখেছিলেন: "আমি আপনার বইয়ের একটি বর্ণও সমর্থন করি না তবে আপনি যা সত্য বলে বিশ্বাস করেন তা প্রচার করবার আপনার অধিকার আমি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সমর্থন করে যাব।" এই কথাগুলির মধ্যেই ভলতেয়ারের চিন্তাধারার চাবিকাঠির সন্ধান পাওয়া যায়। সেটা ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের কিছু পরেকার কাল। ইংলণ্ডে তখন শিল্পবিপ্লব সাধিত হয়ে গেছে এবং তার ঢেউ ফরাসী দেশেও এসে পৌঁচেছে। শিল্পবিপ্লবের আলোড়নের ফলে একদিকে বিশপ-পাদরীর দল আর উচ্চকোটির নানা হোমরা চোমরা বনেদী মানুষ আর অন্যদিকে নিপীড়িত-শোষিত কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর মাঝে বরাবর এক নূতন সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়েছে—বুর্জোয়া সম্প্রদায়, মধ্যবিত্ত সমাজ। ওই নবোদ্ভূত মধ্যবিত্তের কণ্ঠের বাণী হলো—ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতার, চলাচলের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও জীবিকার স্বাধীনতার অধিকারে অবিচল অবস্থার ঘোষণাকে একটি কথায় সংহত করে বললে কথাটা দাঁড়ায়: ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। রুশোকে লেখা চিঠিতে ভলতেয়ার এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উপরেই জোর দিয়েছিলেন। আর তাঁর জীবনের দর্শনও ছিল তা-ই। তিনি ছিলেন মূলত যুক্তিবাদী, এবং কিছু পরিমাণে অজ্ঞেয়বাদীও তাঁকে বলা যায়। পর্তুগালের রাজধানী লিসবন শহর প্রচণ্ড ভূমিকম্পে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলে তিনি ঈশ্বরের কারুণিকত্বে স্পষ্টই সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। বস্তুত, যুক্তিবাদ আর অজ্ঞেয়বাদ এ দুটি মনের ধর্ম কমবেশী ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যেরই লক্ষণ স্বরূপ। দিদেরো, হলবাক, ড আলেমার্ট প্রমুখ এনসাইক্লোপীডিস্ট লেখকদের সহযোগিতায় ভলতেয়ার যে-বিশাল অভিধান প্রণয়নের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারও মূলে ছিল এই যুক্তিবাদ আর অজ্ঞেয়বাদ। প্রকৃত প্রস্তাবে ভলতেয়ার তাঁর সময়ের ফরাসী সমাজে যুক্তিবাদের পক্ষে আর সর্বপ্রকার কায়েমী তন্ত্র ও স্থিতাবস্থার বিপক্ষে অক্লান্ত লেখনী চালনা

করে যে-মহান্ ভূমিকা পালন করে গেছেন তার উপযোগিতা দু'শো বছর পরে আজকের দিনেও পুরাপুরি ফুরয়নি। এখনও কোন কোন দেশে রাজতন্ত্র জাঁকিয়ে আছে, অভিজাত শ্রেণী মোটেই নির্জিত হয়নি বরং নিছক বিত্তকৌলীন্য ও তৎপ্রসূত নানাবিধ সুবিধাদিকে এখনও সামাজিক সাফল্যের মঞ্চে আরোহণের একটি নির্ভরযোগ্য ছাড়পত্র জ্ঞান করা হয় এবং তাকে সেইভাবে ব্যবহারও করা হয়। যাজকতন্ত্র নানান রঙের ও ভেকের আলখাল্লার আচ্ছাদনে সজ্জিত হয়ে এখনও বহাল তবিয়তে টিঁকে আছে সর্বত্র। কখনও তার প্রতিনিধিকে বলা হয় পুরুতঠাকুর কখনও সাধুবাবা কখনও গুরুজী কখনও মাতাজী কখনও মোহান্ত-মহারাজ, কখনও আর কিছু। পশ্চিমী দেশগুলির অঙ্গনে এরই রকমফের দেখতে পাওয়া যাবে হরেক প্রকারের পাদরি প্রিলেট মঙ্ক অ্যাবট ইত্যাদির ছড়াছড়িতে। কাজেই দু'শো বছরে সমাজের এমন কী উন্নতি হয়েছে? ফরাসী বিপ্লব শুধু রক্তের বন্যাই বইয়ে দিতে পেরেছিল কিন্তু রক্তস্রোতে রাজতন্ত্র অভিজাততন্ত্র আর যাজকতন্ত্রের অবশেষ ভাসিয়ে নিতে পারেনি। এর পরও আরও দু' দুটো সর্বাত্মক বিপ্লব হয়েছে—এই শতকের দ্বিতীয় দশকে রুশ বিপ্লব এবং মধ্যভাগে লালচীনের জাগরণ। কিন্তু তাতে কি পৃথিবীর বুক থেকে এই পূর্বোক্ত ত্রিবিধ কলঙ্কচিহ্ন মুছে ফেলা সম্ভব হয়েছে? মোটেই নয়। লাভের মধ্যে, মানুষের জীবনে পূর্বে যেটুকু ব্যক্তি স্বাধীনতা আর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ছিল তা-ও নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম হয়েছে। তিনটি রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের নীট ফল হচ্ছে এই।

কাজেই লিখি, ভলতেয়ারের প্রয়োজন আজও ফুরয়নি। বিশেষ করে আমাদের সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে, যে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এখনও মধ্যযুগীয় আচার-বিশ্বাস-সংস্কারের আধিপত্য, জাতিভেদ আর বর্ণভেদের দাপট, সাম্প্রদায়িকতার বাহিরে অপ্রকট কিন্তু ভিতরে অপ্রতিহত প্রভাব; ভলতেয়ারের মেজাজ ও মানসিকতার একজন লেখকের অবশ্যই ষোল-আনা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু কোন্ সেই লেখক, যিনি এই অভাব পূরণ করবেন। এই উপন্যাস ও রম্য রচনাপ্লাবিত সাহিত্যে লোকে শুধু সাহিত্য পাঠের একটি প্রক্রিয়ার সঙ্গেই সবিশেষ পরিচিত— গল্প গেলা। জাতীয় জীবনে সাহিত্যের আর যে কোন ভূমিকা থাকতে পারে সেই বোধটাই ক্ষীণ। সাহিত্য বলতে যে শুধু হাল্কা গল্পোপন্যাসের সাহায্যে অসার চিত্ত বিনোদনই বোঝায় না, বোঝায় আরও কিছু, বোঝায় চিন্তার সক্রিয় অনুশীলন, তার সংস্কারটাই প্রায় এখনও পর্যন্ত ভাল করে গড়ে উঠতে পারলো না বাংলা সাহিত্যে। এদেশে ভলতেয়ারের আবির্ভাব

হবে কেমন করে? তাঁকে স্বাগত জানাবার মত মন-মেজাজ কই বাঙালী পাঠককুলের?

অপরপক্ষে, বার্নাড শ' তো এই কালেরই লেখক, সাতাশ বছর আগেও তিনি জীবিত ছিলেন এবং চুরানব্বই বছর বয়সের মাথায়, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, চিন্তাচর্চায় ও সমালোচনায় সক্রিয় ছিলেন। তিনি একাদিক্রমে প্রায় সত্তর বছর ইংরেজ জাতিকে আপাদমস্তক সমালোচনায় জর্জরিত করে গেছেন অথচ মজা এই যে, ইংরেজরাই এই জাতিতে আইরিশ লেখকটিকে সর্বদা মাথায় করে রেখেছিল। এবং তাঁকে ইংরেজী সাহিত্যের একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিল। কারণ আর কিছুই নয়, শ'-এর লেখার কৌতুককর ভঙ্গী। তাঁর সমালোচনা নির্মম হলেও সে সমালোচনাকে তিনি পরিবেশন করতেন কুইনিনের তেতো বটিকার উপর চিনির প্রলেপ মাখিয়ে। মিছরির ছুরির ধারের মত তাঁর বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ সমালোচিত ব্যক্তি, প্রথা বা সংস্থার উপর কেটে গিয়ে বসত কিন্তু সমালোচিতরা সেই কর্তনের যন্ত্রণা টের পেত না। তাঁর সমালোচনা আরও লক্ষ্যভেদী হয়ে উঠত নিজেকেও তিনি ব্যঙ্গের পাত্র করে তুলতে পারতেন ব'লে। প্রকৃতপক্ষে সেই বিদ্রূপই হলো শ্রেষ্ঠ বিদ্রূপ, যে-বিদ্রূপ নিজেকেও ছেড়ে কথা কয় না, আপনাকে হাস্যাস্পদ করে তুলে রসসৃষ্টি করতে পশ্চাৎপদ হয় না। বার্নার্ড শ'-র ভিতর এই গুণটি বিলক্ষণ মাত্রায় ছিল। ১৯২৫ সালে যখন তাঁকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল, তিনি তার উপর এই মন্তব্য করেন যে, ১৯২৫ সালে তাঁর কোন বই প্রকাশিত হয়নি, সম্ভবত নোবেল প্রাইজের কর্তারা সেই কারণে স্বস্তি বোধ করেছেন এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা বশত তাঁকে এই উপঢৌকনটি দিয়েছেন। একেই বলে একই সঙ্গে নিজেকে এবং অন্যদের যুগপৎ একহাত নেওয়া। পাঠকদের চোখে তিনি যে একজন অস্বস্তিকর লেখক এই স্বীকৃতিটি তাঁর এই মন্তব্যের ভিতর প্রচ্ছন্ন আছে।

কিন্তু কই, বার্নার্ড শ' আমাদের সমকালজীবী লেখক হলেও বাংলা ভাষায় আমরা কেউ তো তাঁর আদর্শ গ্রহণ করলুম না। তাঁর লিখনভঙ্গী আয়ত্ত করা সহজ না হলেও, অন্তত তাঁর আকাশস্পর্শী খ্যাতিপ্রতিপত্তিগণের দৃষ্টান্তও তো আমাদের কাউকে অনুপ্রাণিত করলো না। বাঙালী শিক্ষিত শ্রেণীর ভণ্ডামী কাপট্য আর মেকি মূল্যবোধগুলিকে উপহাস করবার অবসরে বার্নার্ড শ'-র সাহিত্যের উদাহরণ থেকে ভুলেও তো আমরা কখনও কখনও প্রেরণার উপকরণ আহরণ করতে পারতুম? কিন্তু কোথায় সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে তার নজীর? আচার্য প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'সনেট পঞ্চাশৎ'-এর একটি সনেটে

শ'-র প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে বলেছেন যে, তিনি যদি বার্নার্ড শ'-র চাবুক হাতে পেতেন তো বাঙালী সমাজকে একহাত দেখিয়ে দিতেন। কিন্তু 'সবুজ পত্র' এর প্রাজ্ঞ সম্পাদক মনে মনে জানতেন যে, শ'-এর চাবুকের উত্তরাধিকার লাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ তাঁর শ্রেণীস্বার্থ চেতনাই এই ক্ষেত্রে বাদ সাধত। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভের পূর্বে শ' তাঁর জীবনের প্রথম তিরিশ বছর ছিলেন এক ভাগ্যসন্ধানী ভবঘুরে বাউণ্ডুলে নিঃসম্বল যুবক। কপর্দকহীন অবস্থায় তিনি ডাবলিন থেকে লণ্ডন এসেছিলেন সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে তাঁর অদৃষ্টকে পরখ করতে। ডাবলিনের এক বিত্তহীন বনেদী বংশে তাঁর জন্ম হয়েছিল কিন্তু দীর্ঘকাল দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে স্বশ্রেণীর প্রতি মমত্বের চেতনা তাঁর ভিতর লোপ পেয়ে গিয়েছিল। তার উপর খৃষ্টধর্মের প্রচলিত আচার অনুষ্ঠানে তাঁর কোন আস্থা ছিল না, বলতে গেলে ছোটবেলা থেকেই তিনি তথাকথিত ধর্মানুষ্ঠানের সার্থকতায় সন্দেহপ্রবণ। একালের পরিভাষা অনুসারে তিনি হয়তো শ্রেণীচ্যুত (ডিক্লাশড) হননি, তবে এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা আর অবস্থান্তরের বৈরূপ্য তাঁর মন থেকে বনেদিয়ানার সকল সংস্কার মুছে দিয়েছিল আর তারই প্রভাবে তিনি লাঞ্ছিত আর নিপীড়িত শ্রেণীর পক্ষভুক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

প্রমথ চৌধুরী ওরফে বীরবলের কি সাহিত্য জীবনের এই ব্যাকগ্রাউণ্ড ছিল? তিনি ছিলেন জন্ম-অভিজাত বুর্জোয়া সমাজের একজন কুলতিলক। সংগ্রামের বঞ্চনায় হতাশায় কণ্টকাকীর্ণ পথ বেয়ে তাঁকে ধাপে ধাপে উন্নতির অভিমুখে অগ্রসর হতে হয়নি, উপায়ান্তরহীন হয়ে অগত্যা করতে হয়নি ব্যর্থতাগুলিকেই সাফল্যের সোপানে রূপান্তরিত। তাহলে কেমন করে তিনি শ'-এর চাবুক হাতে পাবার আশা করতে পারেন? এ কথা অবশ্য সত্যি যে, বীরবলের বিদ্রূপ খুবই ক্ষুরধার ছিল এবং তাঁর চিন্তাধারাও ছিল যথেষ্ট পরিমাণে উদার। 'রায়তের কথা' বই লিখে তিনিই প্রথম বাংলায় কৃষকদের দুর্দশার প্রতি সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এ ক্ষেত্রে তাঁর পুরোগামী বটে তবে বঙ্কিমের সহানুভূতি রায়ত আর জমিদারদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়ে অনেকটাই অফলপ্রসূ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর সপক্ষে বলবার কথা এই যে, নিজে জমিদার শ্রেণীভুক্ত হয়েও তিনি জমিদারী ব্যবস্থায় প্রজাশোষণের নিরুকণ চিত্রটি তুলে ধরেছিলেন সকলের সামনে সার্থকভাবে। তবু স্বশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনাচরণের ধারা তিনি অতিক্রম করতে পারেননি। তাঁর শ্রেণীচেতনা ও দিনচর্যার ধরন শ'-র বেপরোয়া মানসিকতা আহরণের আদৌ

অনুকূল ছিল না। সত্য বটে তাঁর লেখাতেও শ'য়েরই মত মিছরির ছুরির ধার ছিল কিন্তু সে মিছরির স্বাদ ছিল অন্য রকমের। সমাজবিদ্রূপের পথে না গিয়ে তাঁর ব্যঙ্গ মূলত হয়ে উঠেছিল শব্দালঙ্কার তথা বক্রোক্তিপ্রধান এবং যমক আর অনুপ্রাস বহুল। অর্থাৎ সমালোচনার আবেগ সমাজের খাতে চালিত না হয়ে হয়েছে সাহিত্যের খাতে—স্যাটায়ারের বদলে বীরবলের কলমে উইট-এর ঝলকানিই বেশী লক্ষ্য করা যায়।

তাহলে আর বাকী রইলেন কে? রাজশেখর বসু? বনবিহারী মুখোপাধ্যায়? প্রমথনাথ বিশী? পরিমল গোস্বামী? শিবরাম চক্রবর্তী? কিন্তু এঁদের কাউকেই শ'য়ের গোত্রের লেখক মনে করা যায় না। কেন করা যায় না একটু বিচার-বিশ্লেষণেই সে কথা ধরা পড়বে।

রাজশেখর বসু ওরফে পরশুরাম ব্যঙ্গগল্পে সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং তাঁর কালে ব্যঙ্গ গল্পের দ্বারা অপরিসীম জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রথাবদ্ধ সমাজের লোক, কঠিন-শৃঙ্খলার অনুগামী একজন বৈয়াকরণিক মেজাজের লেখক। শান্ত তাঁর জীবনযাত্রার ছন্দ, অনুবর্জিত তাঁর বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের ধরনধারণ। তিনি প্রচলিত সমাজের নানা ত্রুটী-বিচ্যুতি, অসঙ্গতি ইত্যাদি লক্ষ্য করে মধুর কৌতুক করেছেন কিন্তু কখনও এ সমাজের কাঠামো ভেঙে তার জায়গায় নতুন সমাজ গড়ার মন্ত্রণা দেননি। এই সমাজের সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়ে তার অবসরে সমাজের নানা অসামঞ্জস্য নিয়ে যতটা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা যায় তার অদ্বিতীয় শিল্পী হলেন পরশুরাম।

অন্যদিকে বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের লেখনী ছিল শানিত বিদ্রূপে খরসান। জ্বালাধরা তাঁর ব্যঙ্গ, মমত্বের প্রশ্রয় এতটুকুও নেই কোথাও তাঁর লেখায়। একজন চিকিৎসকরূপে সরকারী হাসপাতালের উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত থাকা কালে বর্তমান সমাজের নানা বিসদৃশ দিক তিনি লক্ষ্য করেছিলেন এবং তার সেই বিষামৃতময় অভিজ্ঞতাগুলিকেই অত্যন্ত ঝাঁঝালো ভঙ্গীতে রূপ দিয়েছিলেন তার অনবদ্য ব্যঙ্গগল্পগুলিতে। গল্পের ছবিগুলিও তার স্বহস্তঅঙ্কিত ছিল। অধুনা এই শক্তিমান লেখক কমবেশী বিস্মৃত হলেও একদা 'প্রবাসী' 'বিচিত্রা' প্রভৃতি মাসিকের পৃষ্ঠায় তাঁর রচনা নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে তাঁকে পাঠকসমাজের আকর্ষণের বস্তু করে তুলেছিল। কিন্তু তিনিও সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি, চলতি সমাজকে ভাঙবার কথা বলেননি। বনবিহারীর রস-কস-বর্জিত জ্বালাময়ী বিদ্রূপকে তাঁর ন্যায়সঙ্গত পরিণতিতে টেনে নিয়ে যেতে হলে গতানুগতিক সমাজের সঙ্গে রফা করার কোন কথাই উঠতে পারে না। কিন্তু

তেমন আপসহীনতার ডাক তাঁর কলম থেকে কখনও আসেনি। মনে হয় তাঁর নিজেরই সত্তার ভিতর কোথায় যেন একটা বৈপরীত্য লুকিয়ে ছিল। নয়তো জীবনের শেষভাগে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে তিনি কোন এক ধর্মগুরুর শরণ নিয়ে আশ্রমজীবন বরণ করতেন না। তাঁর আশ্রমপন্থী হওয়াটা তাঁর প্রবল সমালোচক সত্তার সঙ্গে খাপ খায় না। এ দেশে বিদ্রোহী আত্মার সবচেয়ে বড় পরাজয় যদি কিছু থেকে থাকে তো তা হলো ধর্মের তিলকছাপ অঙ্গে ধারণ করা। বনবিহারী মুখোপাধ্যায় বেচ্ছায় এই পরিণাম বরণ করে আপন হাতেই তাঁর সমালোচক জীবনের সমাধি ঘটিয়েছিলেন।

প্রমথনাথ বিশী একজন যথার্থ শক্তিশালী সুরসিক লেখক। তিনি একদা 'প্র. না. বি.' এই ছদ্মনাম ধারণ করে 'জি. বি এস.'-এর সঙ্গে আত্মীয়তা ঘোষণা করেছিলেন এবং প্রকাশ্যেই আপনাকে শ'-এর সমধর্মী লেখক বলে প্রচার করে আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মনে হয় এই আত্মপ্রসাদের ভিত্তিটা ছিল কিছু পলকা। কোথায় জর্জ বার্নার্ড শ', আর কোথায় প্রমথনাথ বিশী? তাঁদের মেজাজমর্জিতে মেরুর ব্যবধান বললেও অত্যুক্তি হয় না। একথা অনস্বীকার্য যে, প্রমথনাথ একজন ব্যঙ্গবিদ্রূপের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী এবং তাঁর রচনার উপভোগ্যতাও উচ্চস্তরের। পরিহাসরসরসিকতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে জি. বি এস. আর প্র. না. বি কমবেশী সমভূমিতে দাঁড়িয়ে আছেন কবুল না করে পারা যায় না, কিন্তু যেখানে জি. বি. এস.-এর সঙ্গে প্র. না বি-র অসেতুসম্ভব ব্যবধান, তা হলো তাঁদের দু'জনার রাজনৈতিক বিশ্বাসের দুস্তর তারতম্যের ক্ষেত্রটি: রাষ্ট্রিক চিন্তায় প্রমথনাথ যাকে বলে বামপন্থী আদর্শ তার উপর খড়্গহস্ত, আর শ'-এর গোটা জীবন ব্যয়িত হয়েছিল বামপন্থী চিন্তাদর্শের পোষকতায় ও প্রচারে। তিনি ইংলণ্ডে ফেবিয়ান সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থসম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সিডনি ওয়েব, বিয়েট্রিস ওয়েব, এইচ জি. ওয়েলস্, হ্যারল্ড ল্যাস্কি প্রমুখদের কর্মের সহযোগী। তিনি তাঁর দেশে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার একজন অক্লান্ত প্রচারক এবং মার্কসবাদের আদি অনুশীলকদের অন্যতম। তিনি মার্কসের অর্থনৈতিক তত্ত্ব, বিশেষত 'ভ্যালু-থিয়োরি', যদিও গ্রহণ করেননি। 'অ্যান ইনটেলিজেন্ট ওম্যানস্ গাইড টু সোস্যালিজম' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য), তাহলেও মার্ক্সীয় দর্শনের মূলসূত্রগুলির সঙ্গে তাঁর কোন বিরোধ ছিল না এবং তিনি তাঁদের প্রিয় মত ফেবিয়ানিজমের মধ্যে তার অনেক ক'টিকেই গ্রথিত করেছিলেন। রক্তাক্ত বিপ্লবের আদর্শে বিশ্বাসী না হলেও তিনি সমাজ পরিবর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন আর ক্রমিক হারে আইন

প্রণয়নকে এই পরিবর্তনের উপায় স্বরূপ মনে করতেন। ডেমোক্রাটিক ফেডারেশনের হাইণ্ডম্যানের প্রবর্তনায় সেই যে যৌবনে তাঁর মার্ক্সীয় বিশ্বাসে দীক্ষা হয়েছিল, জীবনে আর তার থেকে তিনি বিচ্যুত হননি। ইংলণ্ডে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের শ' একজন বড় প্রবক্তা এবং শ্রমিকদের একজন অকৃত্রিম বন্ধু। চল্লিশোর্ধে তিনি শ্রমিকদের আন্দোলনের নেতৃত্ব করা অপেক্ষা তাদের শিক্ষিত করে তোলার দিকে বেশী ঝুঁকেছিলেন আর নাটককে সেই শিক্ষার একটি প্রধান বাহন করে তুলেছিলেন। তাঁর নাটকের অনেকগুলিরই মূলে আছে সমাজতন্ত্রের বাণী। প্রসঙ্গত রুশ বিপ্লবের আদর্শেরও তিনি একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। যদিও রুশ বিপ্লবের পরবর্তী সোভিয়েট সমাজ-ব্যবস্থার কিছু-কিছু কার্যকলাপ তিনি সমর্থন করতে পারেননি।

এর জীবনীর ছকের সঙ্গে এনা ব-র জীবনের ছক মেলাতে গেলে পদে পদে বৈষম্যের সম্মুখীন হতে হবে। মিল সামান্যই কিন্তু পার্থক্য অতি উৎকট। শেষোক্ত জন কিছুদিন আগেও সংবাদপত্রের কলকাতীয় আসরে বামপন্থীদের নিন্দে খেউড় না করে জলগ্রহণ করতেন না। আর তাঁর বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ সংক্রান্ত পড়াশোনা বা অধিকার নিয়ে যত কম বলা যায় ততই ভাল। এই এঁর এ মানস-বৈশিষ্ট্য নিয়ে শ' তো দূরের কথা, কোন সাধারণ প্রগতিশীল ইউরোপীয় লেখকের সঙ্গেও একাট্টা হওয়া যায় না।

পরিমল গোস্বামী একজন স্বভাবরঙ্গকুশলী সুরসিক লেখক ছিলেন। তাঁর লেখার একটা বড় গুণ এই যে, তাঁর ব্যঙ্গের ভিতর বৈদগ্ধ্যের বেশ একটা পালিশ রয়েছে আর সে-ব্যঙ্গ অতিশয় সূক্ষ্ম। বীরবলী ব্যঙ্গের মতই তাঁর বিদ্রূপ আপাত-মোলায়েম কিন্তু অন্তরে মর্মান্তিক। জাদুকরের তলোয়ারের কোপে মানুষ দু'ভাগে কাটা পড়লেও যেমন কখনও কখনও দেহটা আস্ত বলেই মনে হয়, দুই অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় না, পরিমল গোস্বামীর ব্যঙ্গের ধারও অনেকটা সেই রকমের। যাকে কেটে ফেলা হয় সে টের পায় না যে তাকে কেটে ফেলা হয়েছে, সে তখনও গোটা মানুষেরই মত ব্যবহার করার চেষ্টা করে। কিন্তু এই বিদ্রূপের অসুবিধা এই যে, অনেক সময় তার অভীপ্সিত অর্থ যথার্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না, প্রায়ই উদ্দিষ্টের মাথার উপর দিয়ে চলে যায়, অর্থাৎ মাঠে মারা যায়।

শ'-এর লেখার মেজাজের সঙ্গে গোস্বামীর লেখার মেজাজের সামান্যই মিল, অমিল বহু। অমিলের একটা প্রধান হেতু এই যে, 'এককলমী'-র (ইনি সংবাদপত্রে এই ছদ্মনামেই সচরাচর লিখতেন) ব্যঙ্গগুলি মুখ্যত সাহিত্যকেন্দ্রিক এবং প্রায়ই কমবেশী অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের আলোচনায় নিবদ্ধ। বিজ্ঞান এবং

ব্যাকরণ—এঁর দুটি প্রিয় বিষয় কিন্তু সেখানেও দেখা যায় এই দুই বিষয়ের তুচ্ছ খুঁটিনাটিতেই তাঁর উৎসাহ বেশী। সর্বোপরি সমাজসমস্যা নিয়ে তাঁকে বড় একটা মাথা ঘামাতে দেখা যায় না: তাঁর সামাজিক চেতনা দুর্বল। রাষ্ট্রিক সমস্যাদি নিয়েও আলোচনার ধাত মামুলি। কাজেই শ'-এর সঙ্গে পাল্লা লড়বেন তিনি কোন্ সাধারণ ভূমির উপর দাঁড়িয়ে? সমাজতাত্ত্বিক মতাদর্শের অনুশীলনের প্রাথমিক প্রস্তুতিও যে তাঁর নেই। এবং খতিয়ে দেখতে গেলে, শ'-এর বন্ধু চেস্টারটনের সঙ্গে তাঁর লেখার ধরনের কতকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায় কিন্তু শ'-এর সঙ্গে একটুও নয়। সমাজতন্ত্রের অনুষঙ্গ বিহনে শ'-এর সঙ্গে সাদৃশ্যের কথা ভাবা যায় না।

অবশিষ্ট রইলেন শিবরাম চক্রবর্তী। এককালীন 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী' গ্রন্থের প্রণেতা এই শক্তিশালী লেখকটির যথার্থই শ'সুলভ রঙ্গকুশলতা ছিল কিন্তু যিনি হতে পারতেন একজন দুর্ধর্ষ সমালোচক, বাংলা দেশের জলবায়ুর দোষে তিনি হয়ে পড়েছেন একজন পেশাদার রঙ্গব্যবসায়ী আর 'পান' সর্বস্ব তুচ্ছ শব্দের খেলার খেলোয়াড় মাত্র। বাজারী কাগজগুলির ফরমায়েস খাটতে গিয়ে তিনি এখন যে-ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তাকে পরিশুদ্ধ ভাষায় বলা যায় বিদূষকের ভূমিকা, অপরিশুদ্ধ ভাষায় ভাঁড়ের। কে কী ভাবে তাঁর রঙ্গরসিকতাকে গ্রহণ করবেন সেটা যাঁর যাঁর রুচির উপর নির্ভর করে।

ছোটগল্পের জগৎ

বিশ্বসাহিত্যে ছোটগল্পের জগৎ বহুবিস্তৃত। আধুনিক সাহিত্যের পরিভাষায় আমরা যাকে আজকাল 'ছোটগল্প' নামে অভিহিত করে থাকি তার রচনার বিপুল বৈচিত্র্য—কি পরিমাণে কি প্রকারে। অথচ এই ছোটগল্প নামীয় সাহিত্যসৃষ্টির বিশেষ শাখাটির বয়স উর্ধ্বপক্ষে একশো সোয়াশো বছরের বেশী হবে না। এত অত্যল্পকাল মধ্যে এমন একটি নতুন সাহিত্যশাখার এতাদৃশ বিশাল বিস্তার শিল্পরূপ হিসাবে ওই শাখাটির অমেয় সম্ভাব্যতা, অজস্র প্রাণশক্তি, সূক্ষ্ম সৌন্দর্যমুখীনতার প্রতিই অসংশয় অঙ্গুলি নির্দেশ করে। খুব সম্ভব আমেরিকান সাহিত্যেই আধুনিক ছোটগল্প যাকে বলা হয় তার উৎপত্তি। ওয়াশিংটন আরভিঙ্, ন্যাথানিয়েল হথর্ন, এডগার অ্যালান পো, অলিভার ওয়েণ্ডেল হোমস, ফেনিমোর কুপার প্রমুখরা হলেন এর আদিরূপের স্রষ্টা। তাঁরা যে সময়ে ছোটগল্প রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তখন ছোটগল্পের প্রাথমিক যুগ, আজকের ছোটগল্পের যা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য—ব্যঞ্জনাধর্মিতা (suggestiveness), তির্যক কথন, বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুদর্শন, গীতিময়তা, লেখকের বিশেষ মুড বা মেজাজের প্রক্ষেপণ, গল্পের সমাপ্তি অংশে শীর্ষরসের সঞ্চার (climax)—এ সবের তেমন সদ্ভাব ছিল না তদানীন্তন গল্পে; একমাত্র এডগার এ্যালান পো'র রচনা বাদ দিলে আর সকলেরই রচনা ছিল কমবেশী উপাখ্যান (tale) জাতীয়, বৃত্তান্ত জাতীয়, উপন্যাসেরই অঙ্কুরিত সংক্ষেপ-রূপ ছিল তদানীন্তন ছোটগল্প। অর্থাৎ এমন আখ্যান, যার ভিতর আরও একটু মেদ-মজ্জা যোগ করলেই তা উপন্যাস হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের সাহিত্যে একথার উদাহরণ বঙ্কিমচন্দ্রের 'যুগলাঙ্গুরীয়' ও 'রাধারাণী'। দুটি রচনাই ছোটগল্পের প্রকৃতি বহন করছে অথচ ঠিক ছোটগল্প নয়। এগুলিকে 'বড়গল্প' কিংবা 'উপন্যাসিকা' নামে আখ্যাত করা যেতে পারে। পরেও এই পর্যায়ে আরও গল্প লেখা হয়েছে বাংলা সাহিত্যে—বড়গল্প বা নভেলেট। যথা, রবীন্দ্রনাথের 'হালদার গোষ্ঠী', 'রাসমণির ছেলে', 'মেঘ ও রৌদ্র'; শরৎচন্দ্রের 'ছবি', 'মেজদিদি', 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে', 'পথনির্দেশ'; তারাশঙ্করের 'ইমারত', 'মাটি', 'শিলাসন', 'রসকলি'। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে 'রসকলি' গল্পটিকেই পরে তারাশঙ্কর 'রাইকমল' উপন্যাসে রূপান্তরিত করেছিলেন।

একে একে সব দেশের সাহিত্যেই ছোটগল্পের পরিপুষ্টি ও পরিবর্তন হতে

বিশ্বসাহিত্যের পাশে আমাদের দীনা মাতৃভাষা বাংলার গল্পের ঐশ্বর্যসম্ভারও বড় কম নয়। বস্তুতঃ, বাংলা ভাষার গল্পের দিকটা তার অন্যান্য সাহিত্যবিভাগের তুলনায় দৃষ্টিগ্রাহ্যরূপেই অধিকতর সমৃদ্ধ। গত একশো বছর কি তার চেয়েও কম সময়ের মধ্যে বাংলায় কত যে সেরা সেরা গল্পলেখকের আবির্ভাব হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। উৎকৃষ্ট গল্পলেখকদের সে এক সারিবদ্ধ মিছিল। রবীন্দ্রনাথ, জলধর সেন, যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথগুপ্ত, সরোজনাথ ঘোষ, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার, প্রমথ চৌধুরী, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায়, বনফুল, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সৌরীন্দ্রমোহন, মণিলাল, মণীন্দ্রলাল বসু, সুধীরকুমার চৌধুরী, রবীন মৈত্র, জগদীশ গুপ্ত, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার, প্রবোধকুমার সান্যাল, বুদ্ধদেব বসু, অন্নদাশঙ্কর, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, সতীনাথ ভাদুড়ী, নবেন্দু ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সমরেশ বসু এবং নবীন ও নবীনতর প্রজন্মের আরও অনেক প্রতিশ্রুতিবান লেখক। নামের শেষ নেই।

এঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ গল্পলেখক এবং আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তার পরেই নাম করতে হয় শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার, তারাশঙ্কর, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্যকুমার ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের রস গীতিকবিতার, তবে সংসারজ্ঞানের উপকরণও সেগুলিতে বড় কম নয়। কবিতা ও ছোটগল্প মেজাজের দিক দিয়ে সমধর্মী তবে প্রধান পার্থক্য এই যে, কবিতায় শিল্পীর অনুভবের পবিত্রতম ও বিশুদ্ধতম রূপটি বিধৃত, অন্যপক্ষে ছোটগল্পে বাস্তবচেতনার ছাপ স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছে কবিতারও স্বাদ মেলে আবার সংসারচেতনারও উপাদান-উপকরণ মেলে বিলক্ষণ। রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে তুলনাহীন নির্মল হাস্যরসের ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে তাঁর জুড়ি কেউ নেই। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি প্রসিদ্ধ গল্প হলো—'দেনা-পাওনা', 'দুরাশা', 'ক্ষুধিত পাষাণ.' 'একরাত্রি', 'মধ্যবর্তিনী', 'মহামায়া', 'জীবিত ও মৃত', 'পোস্টমাস্টার', 'কাবুলিওয়ালা', 'সমাপ্তি' ও 'শাস্তি'। 'স্ত্রীর পত্র', ল্যাবেরটরি', 'রবিবার' এগুলিও উচ্চাঙ্গের গল্প তবে এগুলির রসের জগৎ আলাদা—এগুলিতে একালীন সমাজবাস্তবসম্মত সোনিসিজ্‌মের আমেজ লেগেছে।

ছোটগল্পের 'সাহেনশা বাদশা' নামে কথিত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে অনেকে মোপাসাঁর সঙ্গে তুলনা করেন। কিন্তু এই প্রতিতুলনাটা ভুল। মোপাসাঁর সঙ্গে প্রভাতকুমারের মিল গল্পের শেষে চমক সৃষ্টির কৃতিত্বে, কিন্তু

ফরাসী সমাজের যুদ্ধ, অবক্ষয়, বিশৃঙ্খলা ও ভোগক্লান্তিজনিত জ্বালা-যন্ত্রণা, যা মোপাসাঁর গল্পকে লক্ষণীয় ভেদাত্মক বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করেছে, তার অনুভব বাংলার গতানুগতিক উত্থানপতনরহিত একঘেয়ে সমাজব্যবস্থার প্রভাতকুমার কোথায় পাবেন যে তাকে তাঁর গল্পে রূপ দেবেন? প্রভাতকুমারের গল্প লঘু কৌতুকরসের গল্প, বাংলার উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সমাজের নিরীহ মূল্যবোধ দ্বারা কষিত এ গল্পের শিল্পোৎকর্ষ স্বীকৃত, কিন্তু তার ভিতর সমাজবাস্তবতার তীক্ষ্ণতা একেবারেই অনুপস্থিত। মোপাসাঁ, জোলা প্রমুখের 'ক্রিটিকাল রিয়ালিজম্'-এর জগৎ থেকে প্রভাতকুমারের জগৎ অনেক দূরে অবস্থিত।

শরৎচন্দ্র নামতঃ ছোটগল্প খুব বেশী লেখেননি তবে যে কটি লিখেছেন তার এক একটি হীরের টুকরো বিশেষ। 'মহেশ' গল্পের কোন তুলনা হয় না। এটি বিশ্বসাহিত্যের যে কোন শ্রেষ্ঠ গল্পের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। অন্যান্য সেরা গল্পের মধ্যে আছে 'অভাগীর স্বর্গ', 'একাদশী বৈরাগী', 'বিলাসী', 'রামের সুমতি' ও 'বিন্দুর ছেলে'।

প্রমথ চৌধুরী উজ্জ্বল বুদ্ধিবাদ ও বৈদগ্ধ্যের প্রতিনিধিস্থানীয় একজন উৎকৃষ্ট গল্পলেখক। তাঁর 'চার ইয়ারী কথা', 'নীললোহিতের আদিপ্রেম' প্রভৃতি গ্রন্থের গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের ভাবালুতায় জবজবে সাঁৎসেতে আঙিনায় ফরাসী গল্পের উজ্জ্বল রৌদ্রের ধারা ও প্রফুল্লতা বয়ে নিয়ে এসেছে। এই ধারায় পরে কলম চালিয়েছেন এমন লেখকের সংখ্যা হাতে গোনা যায়। এঁদের ভিতর অন্নদাশঙ্কর রায়ের নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

তারাশঙ্কর একজন উৎকৃষ্ট ছোটগল্পকার। প্রকৃত প্রস্তাবে, খতিয়ে দেখতে গেলে তাঁর উপন্যাস অপেক্ষাও তাঁর ছোটগল্পের শিল্প উচ্চতর কলাসিদ্ধির পরিচায়ক। রুদ্ররস, আদিম বন্যতার অনুভব, নিষ্কুণ্ঠ প্রেম, অপসৃয়মান সামন্ত-তন্ত্রের প্রতি মমতার দীর্ঘশ্বাস, নীচের তলার মানুষের বিচিত্র জীবিকার চিত্র প্রভৃতি নানান ছবির মালায় তারাশঙ্করের গল্পের সংসার সজ্জিত। রকমারি চরিত্রের সেখানে জটলা। কয়েকটি প্রসিদ্ধ গল্পের নাম নীচে দিলাম—'বেদেনী', 'জলসা ঘর', 'তারিণী মাঝি', 'না', 'আরোগ্য', 'প্রতিমা', 'তিনশূন্য', 'শিলাসন', 'ময়দানব', 'ইমারত', 'অগ্রদানী' প্রভৃতি।

বনফুল একজন আঙ্গিকসিদ্ধ ছোটগল্পকার। গল্পের শৈলীতে তিনি পরিমিত কথনের পক্ষপাতী। তাঁর গল্পের সংক্ষিপ্ততম বিন্যাস অনেকের মন কাড়ে কিন্তু বাক্‌শিল্পের এই ব্যয়স্বল্পতা স্বতঃই উচ্চ প্রশংসার হেতু নাও হতে পারে। তাছাড়া দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্নে বনফুল সুস্থ মানবতার অনুগামী নন।

সীনিসিজম্-এ তাঁর লেখা ভরতি। মানব-অবিশ্বাস তাঁর গল্পের মর্মমূলে অনুস্যূত। সুতরাং আঙ্গিকের প্রাধান্য সত্ত্বেও তাঁর লেখা কোন অস্তিবাচক বক্তব্য বহন করে না, বরং মানবতাবিরোধী তাঁর রচনার সুর।

কল্লোল পর্বের গল্পকারদের মধ্যে শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র ও অচিন্ত্যকুমার নিঃসন্দেহে সবচেয়ে প্রতিনিধিস্থানীয় লেখক। শৈলজানন্দের 'অতি ঘরন্তী না পায় ঘর' ও 'নারীমেধ', প্রেমেন্দ্রের 'পোনাঘাট পেরিয়ে', 'হয়ত', 'সাগর-সঙ্গমে', 'কেলেনীপোতা আবিষ্কার', 'জর', 'স্টোভ', 'আয়না' এবং অচিন্ত্য-কুমারের 'গভনবিবি', 'হরেন্দ্র', 'রুদ্রের আবির্ভাব', 'দুইবার রাজা' প্রভৃতি গল্প উচ্চ শিল্পসিদ্ধির পরিচায়ক। বুদ্ধদেব বসু ছোটগল্পে এঁদের সমস্তরের লেখক না হলেও তাঁরও কয়েকটি ভাল ছোটগল্প আছে। যেমন 'তুলসীগন্ধ', 'রাধারাণীর নিজের বাড়ী', 'মেজাজ' প্রভৃতি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পজীবনের দুটি সুস্পষ্ট স্তরবিভাগ। সাহিত্য রচনার প্রথম পর্বে তিনি ফ্রয়েডীয় চিন্তাদর্শনের অনুগামী, দ্বিতীয় পর্বে মার্কসীয় বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের অনুসারী। তাঁর দ্বিতীয় পর্বের গল্পগুলি সমধিক রসোত্তীর্ণ। প্রথম পর্বের গল্পে অনাবশ্যকভাবে নিজ্ঞান মনের জটিলতা ও কুটিলতা প্রবেশ করে সেগুলিকে জীবন-অবিশ্বাস ও মবিডিটির কিনারায় নিয়ে ফেলেছে। এ সব গল্প পড়লে মানুষের হীনতা ও নীচতা দর্শনে মনে হাঁফ ধরে যায়, জীবনের প্রতি আশা হারিয়ে ফেলতে হয়। 'প্রাগৈতিহাসিক', 'টিকটিকি' ও 'সরীসৃপ' এই শ্রেণীর গল্প। এগুলিতে লেখকের প্রতিভার চিহ্ন থাকলেও ফ্রয়েডের অপদর্শনের প্রভাবে সেসব যথার্থ লক্ষ্যবেধী হতে পারেনি। কিন্তু চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই মানিকের সাহিত্যের আর এক রূপ। সুস্থ, সুন্দর ও বলিষ্ঠ—জনগণের কল্যাণচিন্তায় মহিমান্বিত। ব্যক্তিকেন্দ্রিক নির্জ্ঞান মনের নীরন্ধ্র কালো অন্ধকার থেকে বাইরের সমষ্টিগত জীবনের রৌদ্রালোকে ভেসে উঠবার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি জনমুখী সংগ্রামী রাজনীতির রাজবর্ত্ম অনুসরণ করে। এই সুযোগের পুরাপুরি সদ্ব্যবহার তিনি করেছিলেন তাঁর কথাসাহিত্য রচনায়—উপন্যাস ও ছোটগল্প উভয়ত্র। ছোটগল্পে এই পর্বেরই বিস্ময়কর রচনা 'ফেরিওলা', 'দুঃশাসনীয়', 'মাসিপিসি,' 'শিল্পী', 'হারানের নাতজামাই', 'পেটব্যথা', 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী', 'ছিনিয়ে খায় না কেন' ইত্যাদি। এ সব রচনার প্রত্যেকটিরই আবেদন স্পষ্ট, সরল, বহির্মুখ; পূর্ববর্তীযুগের রচনাগুলির মত জটিল-কুটিল-বক্র নয় তাদের প্রতি-ভঙ্গিমা। আত্মকেন্দ্রিকতার স্তর থেকে সর্বসাধারণের জীবনের স্তরে প্রবেশ

করলে শিল্পেরও যে গোত্রান্তর হয়ে যায় মানিকের উত্তরপর্বের রচনা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

সাধারণ ধারার পাশে পাশে বাংলা ছোটগল্পের জগতে একটি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, অদ্ভুত রস ('ফ্যানটাসী ও 'গ্রোটেস্ক'), ও কৌতুকরসের ধারাও বর্তমান। 'কঙ্কাবতী' ও 'ডমরু চরিত'-এর লেখক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এই ধারার প্রবর্তক। পরে এই ধারার যাঁরা অনুবর্তন করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, পরিমল গোস্বামী ও শিবরাম চক্রবর্তী। নতুনতরদের মধ্যে হিমানীশ গোস্বামীর লেখায় এই ধারার রচনায় শিল্প-সার্থকতার সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জুনিয়ার গোস্বামীর হাসির গল্পের বৈপরীত্যের রস সিনিয়ার গোস্বামীর রচনার মতই উপভোগ্য

সমাজ বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বাংলা ছোটগল্প

প্রায় বছর বিশেক আগে ছোটগল্পের উপরে একটি প্রবন্ধে আমি লিখেছিলাম বাংলা ছোটগল্প সেই সময়ে বিকাশ ও বৃদ্ধির যে স্তরে এসে উপস্থিত হয়েছে তারপর আর তার অধিকতর বিকাশ ও বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নেই। উপমা প্রয়োগ করে লিখেছিলাম, বাংলা ছোটগল্পের সবগুলি পাপড়িই মেলা হয়ে গেছে, এবার বাংলা ছোটগল্পরূপ পূর্ণ বিকশিত পুষ্পটির ঝরে পড়বার পালা। তার সুগন্ধ বিতরণের অধ্যায়েরও শেষ।

পূর্বোক্ত প্রবন্ধে আমার বলবার কথা ছিল এই যে, রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, রাজশেখর বসু, তারাশঙ্কর, বনফুল, মনোজ বসু, বিভূতিভূষণ, জগদীশ গুপ্ত, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার, অন্নদাশঙ্কর, বুদ্ধদেব বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের সুবোধ ঘোষ, সতীনাথ ভাদুড়ী, বিমল মিত্র, নবেন্দু ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ লেখকগণ বাংলা ছোটগল্পকে শিল্পসিদ্ধির যে উত্তুঙ্গ উচ্চগ্রামে উন্নীত করেছেন তারপর আর বাংলা ছোটগল্পের অধিক উচ্চে আরোহণের ক্ষমতা নেই। এখন ছোটগল্পের চর্চা মানেই পুনরাবৃত্তির চর্চা, পূর্বার্জিত সাফল্যের অভ্যস্ত রেখাচিহ্নগুলির উপর দাগা বুলানোর চর্চা। উল্লেখিত কথাকারেরা এবং তাঁদের ধারানুসারী আরও একাধিক লেখক কি বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যে, কি রচনাশৈলীর ঔজ্জ্বল্যে, শিল্পকৃতিত্বের তুঙ্গবিন্দু স্পর্শ করে ফেলেছেন, ওই ধারায় আর ঊর্ধ্বগমনের অবসর নেই। বাংলা ছোটগল্পের শাখা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধ শাখা এবং অক্লেশে বিশ্ব সাহিত্যের সেরা গল্পসৃষ্টির ধারার সঙ্গে তুলনীয়। এই কীর্তি এমনি এমনি অর্জিত হয়নি, বাংলার বিশিষ্ট গল্পকারেরা তাঁদের সৃজনী প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দানের দ্বারা সাহিত্যের এই বিভাগটিকে বিশেষ ভাবে পুষ্ট করে তুলেছেন বলেই জগৎসভায় আজ বাংলা ছোটগল্পের এত সমাদর। বিষয়বস্তুর মৌলিকতা, গল্পকথন রীতির চাতুর্য ও শিল্পকৌশল, ভাষার সম্পদ—যে দিক থেকেই বিচার করা যাক না কেন, বাংলা ছোটগল্পের এক অতি সমৃদ্ধ ঐতিহ্য দাঁড়িয়ে গেছে, তার আর ঊর্ধ্বায়ণের সম্ভাবনা নেই। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, শৈলজানন্দ-প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্যকুমার এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবোধ ঘোষের এমন কিছু কিছু ছোটগল্প আছে যা বিশ্ব সাহিত্যের যে কোন ভাষার যে কোন সর্বোৎকৃষ্ট ছোটগল্পের পাশে

অবাধে স্থান পাওয়ার যোগ্য, এমন কি স্বাজাত্যাভিমানের ঝুঁকি নিয়েও বলা যায়, এগুলির কোন কোনটি রসের আবেদনের দিক দিয়ে তাদেরও ছাড়িয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের 'জীবিত ও মৃত', শরৎচন্দ্রের 'মহেশ', তারাশঙ্করের 'অগ্রদানী', বিভূতিভূষণের 'পুঁইমাচা', শৈলজানন্দের 'অতি ঘরন্তী না পায় ঘর', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সাগর সঙ্গমে', অচিন্ত্যকুমারের 'যতনবিবি', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ফেরিওলা', সুবোধ ঘোষের 'গোত্রান্তর', গল্প রচনার ক্ষেত্রে অনন্ত সাহিত্য সৃষ্টি। এঁরা এবং এদের গোত্রের আর যে সব লেখক আছেন তাঁরা বাংলা ছোটগল্পের উৎকর্ষের চূড়ান্ত করে ছেড়েছেন—কি বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যে, কি আঙ্গিকের বিন্যাস-পারিপাট্যে। তারপর আর তাঁদের ধারায় ছোটগল্পকে সমধিক পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করার রাস্তা তাঁরা আর খোলা রাখেননি। এখন এই পথে পরিক্রমা করার অর্থই হলো পুনরাবৃত্তির রাস্তায় পা দেওয়া, খোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-খোড়ের রাজত্ব কায়েম করা। সেই অর্থেই আমি ছোটগল্পের পূর্ণ বিকাশের তত্ত্বটি খাড়া করেছিলাম। ফুলের সকল পাপড়িদল মেলা হয়ে যাবার পর ফুলের ক্রমশঃ বিশীর্ণ হওয়া ও পরিণামে ঝরে পড়া ছাড়া আর কোন্ গত্যন্তর থাকে?

তবে কি উল্লেখিত লেখকবর্গের পরবর্তী কালে যে সব কথাকারের আবির্ভাব হয়েছে তাঁরা আর ছোটগল্পের চর্চা করবেন না? তাঁদের ভিতর আবার বিশেষভাবেই যাঁদের ছোটগল্প রচনার দিকে ঝোঁক, তাঁরা সব কলম গুটিয়ে বসে থাকবেন? এ কি সম্ভব, না, উচিত? যেহেতু বাংলা ছোটগল্প তার বিবর্তন ও অগ্রগতির এক পর্যায়ে শিল্পমহিমার শীর্ষবিন্দু ছুঁয়ে যেতে পেরেছে, সেই কারণেই বিবর্তনের পরবর্তী পর্যায়গুলিতে তার আর অনুশীলন হতে পারবে না—এ কেমন যুক্তি? উঠতি প্রজন্মের ছোটগল্প লেখকেরা তাহলে কোথায় যাবেন? ছোটগল্প না লিখে তাঁদের প্রকাশের ক্ষেত্র রূপে সাহিত্যের অন্য কোন মাধ্যম গ্রহণ করা উচিত—এই কি আমার বক্তব্য? আর এইটেই যদি আমার বক্তব্য হয়, এমন বক্তব্যে কে কর্ণপাত করবেন? লেখককে ফরমায়েশ দিয়ে, ফতোয়া জারী করে, যেমন কিছু লেখানো যায় না, যাওয়া উচিত নয়, তেমনি তাঁর কলমকে নিষেধের তর্জনী উঁচিয়ে বিষয় বিশেষের চর্চা থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টাটাও জুলুম বলে গণ্য হওয়া উচিত। স্বাধীন মনন ও কল্পনার অবাধ স্ফূর্তির নীতিতে বিশ্বাসী কোন সম্যক্‌দর্শী ব্যক্তিই এ জাতীয় জবরদস্তি অনুমোদন করতে পারেন না।

তবে? তবে কেন ছোটগল্পের বেলায় এমনতর নিষেধের কথা ওঠে?

এইখানেই বক্তব্য বিস্তারের তথা আত্মপক্ষ সমর্থনের অবকাশ রয়েছে। সেই চেষ্টাই এখন করবো।

ছোটগল্পের সেরা জাদুকর রূপে যেসব দিকপাল লেখকের নাম আমি করেছি, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে দুই-চারটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বাদ দিলে তাঁদের সকলেই ভাববাদী ঘরানার লেখক। তাঁদের কমবেশী প্রায় সবায়েরই জগৎ হয় অভিজাত, নয় উচ্চবিত্ত, নয় মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। তাঁরা যে মূল্যবোধকে তাঁদের গল্পোপন্যাসে পরিচর্যা করেছেন তা, ঝোঁকের তারতম্য অনুযায়ী, একান্তভাবে গতপৃথবীর মূল্যবোধ। এই মূল্যবোধ স্থিতাবস্থার আশ্রয়ে লালিত, প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে সম্বন্ধযুক্ত। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে পাই কল্পনার উত্তুঙ্গ পক্ষবিস্তার ও অপূর্ব কাব্যস্বাদ; প্রভাতকুমারের ছোটগল্পে পাই মোপাসাঁ-সুলভ আঙ্গিকের অপরূপ কলাকৌশল ও সাসপেন্স-এর চাতুর্য; শরৎচন্দ্রের গল্পে পাই গ্রামজীবনের সাধারণ নরনারীর দিনযাত্রায় গার্হস্থ্য রসের মধুর লীলা; প্রমথ চৌধুরী ও রাজশেখর বসুর গল্পে পাই ক্ষুরধার বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য ও জীবনপ্রীতি নিষিক্ত কৌতুকবোধ, তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণের গল্পে আছে গ্রামের পুরনো পরিচিত রূপের মধ্যেই অ-দেখা ও অ-ভাবনীয় শিল্পের চমক; প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্য মনোজ-সুবোধ প্রমুখের গল্পসৃষ্টির মধ্যে পাওয়া যায় বাস্তবতার আবরণে আসলে রোমান্সের কুহক; কিন্তু এঁদের সৃজনী প্রতিভা ও শিল্পমহিমার শতমুখে প্রশংসা করার কালেও এ কথা মুহূর্তের জন্য ভোলা উচিত নয় যে এঁদের রচনার ধারার সঙ্গে আজকের যুগের সমাজ-বাস্তবতার ধারার বিশেষ যোগ নেই। যে যুগের ছবি তাঁরা তাঁদের গল্পে চিত্রিত করেছেন সে যুগ কবেই বাসী হয়ে গেছে, এখনকার পরিবেশে সে-ছবির আর প্রয়োগযোগ্যতা নেই। আলোচ্য লেখকদের ভাবের জগৎকে পিছনে ফেলে বর্তমান কাল অনেক দূর এগিয়ে গেছে—কি মানসিকতায়, কি জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে। এখনকার মানুষের বাঁচার রীতি এবং চিন্তা-চেতনার ধরন-ধারন এতই আলাদা যে মনে হয় এখনকার যুগ আর রবীন্দ্র-প্রভাতকুমার-প্রমথ চৌধুরী সেবিত যুগের ভিতর যেন এক বিরাট ব্যবধান হাঁ করে রয়েছে, যা অসেতুসম্ভব বললেও চলে। কখনও কখনও এমন বিভ্রমেরও সৃষ্টি হয় যেন তাঁদের জগৎ কোন্ সুদূর কালের আকাশে অবস্থিত, যেখান থেকে ক্ষীণতম রশ্মির আভাস মাত্র আমরা এই কালে বসে পাচ্ছি, তার বেশী কিছু নয়।

যদি বলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর কালের আবহে বাস করে তাঁর কালের ধর্ম পালন করে গেছেন, তাঁর লেখনীতে এ যুগের চিন্তা-চেতনার প্রকাশ সম্ভবও

ছিল না, সেটা প্রত্যাশা করাও উচিত হতো না—সেক্ষেত্রে ওই রকম বক্তব্যের সঙ্গে আমাদের বিরোধের কোন অবসর আছে বলে মনে করি না। আমরাও তো এই কথাই বলি। যিনি যে যুগে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁকে সে যুগের ধর্ম অবশ্যই পালন করতে হবে, এ বিষয়ে নালিশ জানানোর কোন হেতু থাকতে পারে না। বরং তাঁকে তাঁর যুগের দাবী পরিপূরণের অবাধ সুযোগ দিয়ে আমাদের উচিত আমাদের কালে দৃষ্টি ফেরানো—আমাদের কালের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভাব-অভিযোগ, দৈন্য-পীড়ন শোষণ বঞ্চনা ইত্যাদিকে আমাদের মত করে প্রকাশ করবার জন্য লেখনীর শক্তিকে নিয়োজিত করা। বাংলা সাহিত্য ভাববাদের পরিমণ্ডল অতিক্রম করে আজ সুস্পষ্টভাবেই বাস্তবতার বাতাবরণের ভিতর প্রবেশ করেছে। যুগাতিক্রান্ত মূল্যবোধগুলিকে আজ আর আঁকড়ে ধরে থাকার কোন সার্থকতা নেই। অভিজাত তথা বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পক্ষপুটাশ্রিত মূল্যবোধগুলি এখনকার সমাজ কাঠামোয় নিতান্তই মূল্যহীন হয়ে পড়েছে অর্থাৎ তাদের যুগোচিত উপযোগিতা হারিয়ে ফেলেছে। এ যুগ হলো খেটে-খাওয়া মেহনতী মানুষের সংগ্রামের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগ, এই কালে বিগত-হয়ে-যাওয়া মূল্যবোধ এবং ওই মূল্যবোধের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন শিল্পাদর্শকে অবলম্বন করে থাকার অর্থ এই কালের বিশেষ প্রেক্ষিতটিকে ভুলে থাকা, তার দাবী অপূরণ রাখা। সেটা প্রায় যুগের সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতারই সামিল।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমি আমার প্রবন্ধের সূচনায় বাংলা ছোটগল্প তার শিল্পোৎকর্ষের তুঙ্গবিন্দু স্পর্শ করেছে বলে মত প্রকাশ করেছিলাম এবং ওই উৎকর্ষের পথে আর অধিক পরিশীলনের অবকাশ নেই বলে সাবধানবাণী উচ্চারণ করতে চেয়েছিলাম। বুদ্ধিমান পাঠকের নিশ্চয়ই বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, ভাববাদী মূল্যবোধ কষিত ছোটগল্পের সম্পর্কেই আমার ওই সতর্কবাণী, নতুন কালের ছোটগল্প লেখকেরা ওই ধারা থেকে প্রতিনিবৃত্ত হয়ে নতুন চিন্তা-চেতনার জগতে প্রবেশ করুন এই অভিপ্রায়টাই ছিল সেই সতর্কবাণীর নিহিতার্থ। সোজা কথায় বললে দাঁড়ায় এই যে, ভাববাদ থেকে বস্তুবাদে, ব্যক্তিবাদ থেকে সমাজবাদে, ব্যষ্টিচেতনা থেকে সমষ্টিচেতনায় উত্তরণে আছে সেই অনুপ্রবেশের সংকেত।

পূর্বসূরীরা উত্তরণের পথ কতকটা সুগমও করে দিয়ে গেছেন। ভাববাদী ধারায় আমি কয়েকজন ব্যতিক্রমী লেখকের উল্লেখ করেছি। তাঁরা বাংলা

কথাসাহিত্যে বাস্তবতার নান্দী গেয়ে গেছেন, কেউ কেউ তাকে অভিষেকও করে গেছেন। এঁরা হলেন শরৎচন্দ্র (শর্তাধীনে), জগদীশ গুপ্ত, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র ও অচিন্ত্যকুমার (অংশতঃ) এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের প্রদর্শিত রাস্তা ধরেই এখন পূর্ণবেগে পথ পরিক্রমা করতে হবে, এ ছাড়া আর নতুন প্রজন্মের লেখকদের সামনে দ্বিতীয় রাস্তা নেই। শরৎচন্দ্রের প্রসঙ্গে 'শর্তাধীন' কথাটা ব্যবহার করলুম এজন্য যে, শরৎচন্দ্রের সব গল্পে সুতীক্ষ্ণ সমাজ বাস্তবতার ছবি ফুটে ওঠেনি যেমনটা ফুটে উঠেছে তাঁর 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ', 'বিলাসী', 'একাদশী বৈরাগী' প্রভৃতি গল্পে। অন্যান্য গল্পে এক ধরনের বাস্তবতা নিশ্চয়ই আছে, তবে তা বড্ড বেশী পারিবারিক রসে নিষিক্ত এবং তা কমবেশী প্রতিবাদ প্রতিরোধহীন স্থিতাবস্থার দ্যোতক। এই পর্যায়ের রচনার মধ্যে পড়ে বিশেষভাবে 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে', 'মামলার ফল' প্রভৃতি ছোট গল্প এবং 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'নিষ্কৃতি', 'মেজদিদি', 'বড়দিদি', 'বিরাজ বৌ', 'অরক্ষণীয়া' প্রভৃতি বড়গল্প কিংবা উপন্যাসিকা এগুলিতে সমালোচনার ভাগ কম, গ্রাম সমাজের মধ্য স্তরের জীবনযাত্রার যথাযথ রূপের প্রকাশ বেশী। সমালোচনা নেই এমন নয়, তবে তা অত্যন্ত মৃদু সমালোচনা, প্রচ্ছন্ন সমালোচনা, মহেশ বা অভাগীর স্বর্গ গল্পের মত তীক্ষ্ণ-তীব্র-সোচ্চার সমাজ-সমালোচনায় এ রচনাগুলি মণ্ডিত নয়। আজকের যুগের সমাজ চেতনা কিংবা বাস্তবতার একটি প্রধান লক্ষণই হলো সমালোচনা, তাকে বাদ দিয়ে কোন আধুনিক ছোটগল্প হতে পারে না। সমালোচনা প্রকট আকারেই থাকুক আর প্রচ্ছন্ন আকারেই থাকুক, তা অবশ্যই আধুনিক ছোটগল্পের অবয়ব মধ্যে থাকা চাই; এই মানদণ্ডে শরৎচন্দ্রের সব গল্প একালীন সমাজ-বাস্তবতার সর্ত পূরণ করে না, বলাই বাহুল্য।

পক্ষান্তরে প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্যকুমারের বাস্তবকে 'আংশিক' বলা হয়েছে এই কারণে যে, তাঁদের রচনার ধারায় পূর্বাপর সামঞ্জস্য নেই, তাঁদের রচনার গতি এবড়ো-খেবড়ো। কোথাও তাতে আছে বাস্তবতার চড়াই, কোথাও রোমান্টিকতার উৎরাই। প্রেমেন্দ্রের 'শুধু কেরাণী', 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', 'সাগরসঙ্গমে', 'পোনাঘাট পেরিয়ে' প্রভৃতি গল্পগুলিকে যদি বলা যায় বাস্তবতার পরিস্ফূচক, তেমনি সেগুলির পিঠে তাঁর 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার', 'হয়তো', 'স্টোভ', 'জর' প্রভৃতি গল্পকে বলতেই হবে হয় সেগুলির কোন কোনটির পঞ্জরে আছে রোমান্সের মায়া, নয় কোন কোনটিতে আছে অসুস্থ মনোবিকলনের অন্ধকার বিষন্নতা। শেষোক্ত কথার প্রমাণ রূপে তাঁর হয়ত, জর ও স্টোভ গল্পত্রয়ের উল্লেখ করা যায়। এই তিনটি রচনা গল্প হিসাবে অসাধারণ কিন্তু

তিনটিরই ব্যঞ্জনা অতিশয় মবিড, কূট-মনস্তত্ত্বের বিমর্ষতায় ভারাক্রান্ত। অন্যধারে, অচিন্ত্যকুমারের 'যতনবিবি' কিংবা 'কাঠ-খড়-কেরাসিন' গল্পসংগ্রহদ্বয়ের গল্পগুলি কিংবা 'হরেন' নামক পাখাওয়ালার গল্প বাস্তবতার নিরিখে যে পরিমাণ রসোত্তীর্ণ তাঁর অন্য পর্যায়ের বা অন্য অধ্যায়ের লেখা গল্পগুলিকে ঠিক সেই কোঠায় ফেলা চলে না। যতনবিবি আর কাঠ-খড়-কেরাসিনের গল্পগুলি সবই দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধকালীন দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় লেখা, সেইজন্যই বোধহয় সেগুলির বাস্তবতা অপ্রতিরোধ্য, পাঠকের মনে কেটে কেটে গিয়ে বসে।

কূট মনস্তত্ত্বের কারিকুরি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাতেও গোড়ার দিকে বিলক্ষণ মাত্রায় প্রকট ছিল। খুব সম্ভব ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের আদর্শ এবং অব্যবহিত পূর্বসূরী কল্লোলীয় লেখকদের দৃষ্টান্ত এই ক্ষেত্রে তাঁকে প্রভাবিত করেছিল; কিন্তু পরে ওই প্রভাব, সৌভাগ্যক্রমে, ম্লান হয়ে যায়। মানিকের চিন্তা-চেতনা নির্জ্ঞান মনের অন্ধকার থেকে ক্রমেই বহির্জগতের রৌদ্রালোকে ভেসে ওঠে। আত্যন্তিক অন্তর্নিবেশের অস্বাভাবিক অভ্যাস সুস্থ বহির্মুখীনতায় ক্রমশ রূপ পায় আর এই রূপান্তরের অধ্যায়েই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা পাই অতিশয় বাস্তবসচেতন প্রতিবাদী আর প্রতিরোধী এক উৎকৃষ্ট শিল্পী রূপে। শিল্পী সত্তা আর সংগ্রামী সত্তা এই পর্বে এসে তাঁতে একাকার হয়ে যায়। মানিকের এই পর্বেরই রচনা 'পেটব্যথা', 'হারানের নাতজামাই', 'ছোট বকুল-পুরের যাত্রী' প্রভৃতি অবিস্মরণীয় ছোটগল্প।

বলা যেতে পারে এই পর্ব থেকে শুধু যে মানিকেরই রূপান্তর সূচিত হলো তাই নয়, গোটা বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যও নতুন পথে বাঁক নিল। বাংলা ছোট-গল্প সাহিত্যে সমাজবাস্তবতার জয়যাত্রা শুরু হলো। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, বিদ্রোহ, এমনকি বিপ্লবের পদপাত যেন বাংলা কথাসাহিত্য সংসারের আঙিনায় উত্তরোত্তর বেশী মাত্রায় শুনতে পাওয়া যেতে থাকল। সমাজের নির্যাতিত-শোষিত শ্রেণীর মানুষের দুঃখ-বেদনা, শোষণ-অবদমন, অত্যাচার-অবিচার ক্রমেই ছোটগল্প লেখকদের মনোযোগ প্রবলতর ও ব্যাপকতর ভাবে দখল করে নিতে লাগল। মধ্যবিত্ত মূল্যবোধসমূহের আশ্রয়ে গতানুগতিক পৃথিবীর ধ্যান-ধারণাকে অবলম্বন করে তার পরও যে গল্পোপন্যাস লেখা হতে না থাকল এমন নয়—রেওয়াজটা আপাতদৃষ্টিতে পূর্বের মতই জোরদার রয়ে গেল—কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কোথায় যেন তার যৌক্তিকতার জোর কমে গেল, দেশের নয়া সামাজিক অবস্থা-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভাববাদী রচনাসমূহের সুর কতকপরিমাণে ফাঁকা শোনাতে লাগল। ছোটগল্পে বুর্জোয়া কিংবা পাতি বুর্জোয়া চিত্র-চরিত্রের

রূপায়ণ যুগাতিক্রান্ত অর্থাৎ কমবেশী অবাস্তব বলে মনে হতে লাগল। সমাজের সাধারণ সব মানুষ যেখানে জেগে উঠেছে, তার আত্মপ্রতিষ্ঠার অধিকারের দাবীর ঘোষণা আকাশে-বাতাসে কান পাতলেই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, সেস্থলে মধ্যবিত্ত মূল্যাশ্রয়ী রচনাদর্শের কীই বা সম্ভাবনা, কীই বা ভবিষ্যৎ? সেইজন্যই তো বলতে চেয়েছিলাম বাংলা ছোটগল্পের (ভাববাদী ছোটগল্পের) সব কয়টি পাপড়িদল উন্মীলিত হয়ে গেছে, এবার তার ঝরে পড়বার পালা, তার ঝরে-পড়া অবশেষের বিলয়ভূমির উপর ছোটগল্পের নয়া অঙ্কুর উদ্‌গত হবার সময় হলো। সমাজের প্রচলিত অবস্থা-ব্যবস্থার আওতার মধ্যে থেকে, স্থিত স্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গীকে ঘিরে, যত রকমের বিষয়বস্তু উদ্ভাবিত হওয়া সম্ভব, ভাববাদী গল্পে তার কদ্দ করে ছাড়া হয়েছে, এবার বিষয়বস্তুর মোড় ফেরানোর পালা। নতুন ভাবের উপযোগী নতুন গল্প চাই।

নয়া প্রজন্মের একশ্রেণীর গল্পলেখক কিন্তু ভাববাদী গল্পের এই অস্তিমাবস্থার তত্ত্বটা বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁরা ভাববাদী গল্পাদর্শের প্রভাব হ্রাসের ফলে বাংলা ছোটগল্পের সংসারে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে সেই শূন্যতার সত্যটি ধরে ফেলেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তাঁদের অনেকেরই প্রয়োজনীয় সমাজসচেতন দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না, অথবা তাঁদের কারও কারও মনোভাব সেই আদর্শের রীতিমত প্রতিকূল ছিল, সেই কারণে তাঁরা ওই শূন্যতার পরিপূরণ করতে রীতিমত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। কোথায় তাঁরা যুগোপযোগী সমাজ বাস্তবতার আদর্শের আনুগত্যের সাহায্যে বাংলা ছোটগল্পে নতুন ধারার সূচনা করবেন, তা নয়, তাঁরা শূন্যতার ভরাট করতে গেলেন কিনা উদ্ভট আঙ্গিকের নয়া-নয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে! এঁদের ভিতর একদল আদাজল খেয়ে লাগলেন 'চেতনা-প্রবাহ' নামীয় সম্পূর্ণ বিজাতীয় রীতিতে গল্প সাজাবার কৃত্রিম চেষ্টায়; কেউ কেউ 'রাগী ছোকরার' ধরনে গল্পশিল্পকে পুরোপুরি মাত্রায় 'রাগাশ্রিত' করে তুলতে চাইলেন; কেউ 'অ্যাবসার্ড' রীতির কায়দায় গল্পকে এক কিম্ভূত ধাঁধার ছকে পরিণত করতে শুধু বাকী রাখলেন; কেউ বিশুদ্ধ উত্তমপুরুষের প্রকরণ আশ্রয় করে গল্পকে বানিয়ে তুললেন অহংসর্বস্ব হেঁয়ালি, খেয়াল-চর্চার এক যদৃচ্ছ বিচরণ-ক্ষেত্র। পরিষ্কার বোঝা উচিত এঁদের এই সব চেষ্টা পরিবর্তনের চেষ্টা হলেও সুস্থ পরিবর্তন প্রয়াস নয়, বরং এঁদের এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে উন্মার্গগামী পরীক্ষা-নিরীক্ষা বললেই তাদের যথাযথ পরিচয় দেওয়া হয়। এগুলির দ্বারা অপসংস্কৃতির আন্দোলনকেই জোরালো করা হয় বলে আমার ধারণা। আর বস্তুতঃ কার্যক্ষেত্রেও দেখা গেছে এঁদের সব কয়টি গল্প

আন্দোলনের সম্মিলিত প্রভাবের ফলে অপসংস্কৃতির শিবিরটাই জোরদার হয়েছে, কায়েমী স্বার্থের ধ্বজাধারীরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার পক্ষে নয়া বল পেয়েছে। বাংলা সাহিত্যের অগ্রসর চিন্তা-ভাবনার মাপকাঠিতে এসব যে প্রতিক্রিয়াশীলতার হাতকেই মজবুত করার আয়োজন মাত্র, সে বিষয়ে আদৌ সন্দেহের অবকাশ থাকা উচিত নয়।

এঁরাই পরিবর্তনমুখী একমাত্র নয়া কথাকার গোষ্ঠী নন; সুখের বিষয় এঁদের বিপরীতে আরেক দল নয়া প্রজন্মের ছোটগল্প লেখক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়েছে যাঁরা সুস্থ সমাজসচেতন দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী, শৈলজানন্দ-মানিক-প্রদর্শিত সমাজ বাস্তবতার পথরেখা অনুসরণ করে চলবার নীতিতে দৃঢ় রূপে বিশ্বাসী, একালীন বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের আদর্শের অনুগামী, সর্বোপরি গল্পকথন রীতিতেও ক্ষমতার ভেদ অনুযায়ী কমবেশী শিল্পসিদ্ধ। এঁদের মধ্যে আছেন রামশঙ্কর চৌধুরী, মিহির আচার্য, চিত্ত ঘোষাল, মনি মুখোপাধ্যায়, তপোবিজয় ঘোষ, কৃষ্ণ চক্রবর্তী, শুভঙ্কর চক্রবর্তী, দেবদত্ত রায়, সাধন চট্টোপাধ্যায়, সমীর বিশ্বাস ও সমীর রক্ষিত, কালিদাস রক্ষিত, অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, বারিদবরণ চক্রবর্তী, অমল চক্রবর্তী, গোপীনাথ দে, মৃণাল চৌধুরী, রামরমণ ভট্টাচার্য, অমিয় চৌধুরী, অশোক সেনগুপ্ত, হীরালাল চক্রবর্তী, নন্দ চৌধুরী, অলক সান্যাল, ছবি বসু, উজ্জ্বল চক্রবর্তী, রাসবিহারী দত্ত, অনির্বাণ দত্ত প্রমুখ। আরও হয়ত এই ধারার লেখক এখানে সেখানে ছড়িয়ে রয়েছেন। হয়ত কেন নিশ্চয়ই রয়েছেন, তবে আমার এই বয়সে যখন স্বাভাবিক স্বাস্থ্যগত কারণেই পাঠক্রিয়া শ্লথ হয়ে পড়েছে সেক্ষেত্রে সকলের পরিচয় রাখা বা পাওয়া বুঝি বোধগম্য কারণেই সম্ভব নয়। আশা করি এইটি বুঝে অনুক্তরা আমার অনুল্লেখকে ক্ষমার চক্ষে দেখবেন।

সম্প্রতিকালের পরিসরের মধ্যে এঁদের প্রায় সকলেরই একাধিক লেখা পড়বার সুযোগ আমার হয়েছে। তা থেকে বলতে পারি, এঁরা সমাজসম্পৃক্ত বাস্তববাদী ধারার গল্প রচনার আন্দোলনটিকে আন্তরিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রযত্ন করে চলেছেন নিজ নিজ সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে। বাংলা ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে এঁরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহ্যের সজ্ঞান উত্তরসাধক। এইটিই হওয়া চাই, কেননা আজকের যুগের পক্ষে এইটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক ও সঙ্গত। এঁদের এই উত্তরসাধনার ধারায়, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, নেতিবাদী ও ইতিবাদী প্রক্রিয়া দুই-ই মিশে আছে। নেতিবাদী প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের অভ্যাস বর্জন, যৌনতার পরিহার, অন্তর্নিবেশমূলক

আত্মকেন্দ্রিকতার অভিশাপ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রয়াস; ইতিবাদী প্রক্রিয়া বলতে বোঝায় সমাজ চৈতন্যের ঐতিহ্যের সচেতন অনুসরণ, বাস্তবতার আদর্শের সাঙ্গীকরণ, বহির্মুখচেতনার অভিমুখে সমধিক ঝোঁক, প্রতিবাদ প্রতিরোধ বিদ্রোহের আকৃতির দ্বারা বক্তব্যকে সমৃদ্ধ করে তোলার প্রয়াস, রচনার শিল্পগত মানকে পূর্বের তুলনায় আরও উন্নত করে তোলা যায় কিনা তার জন্য ভাষা ও প্রকাশশৈলীর নিত্য নতুন পরীক্ষণ, ইত্যাদি।

সকলেই যে সমান ভাবে এই সব বিবিধ পরীক্ষায় উৎরাচ্ছেন তা বলতে পারা যায় না। কারও কারও মধ্যে নেতিবাদী লক্ষণগুলির এটা অথবা অন্যটা এখনও বেশ প্রকট; তবে প্রত্যেকেরই লেখায় ভাববাদী ধারা থেকে বস্তুবাদী ধারায় উত্তরণের একটা আন্তরিক প্রযত্ন যে রয়েছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ করা চলে না। এঁদের সকলেরই দৃষ্টিভঙ্গী, শিল্পকৃতিত্বের যিনি যে স্তরে বিদ্যমান রয়েছেন তার হিসাব বাদ দিয়ে, মোটামুটি বলিষ্ঠ, বক্তব্য যুগোচিত ও প্রণিধেয়, বিষয়বস্তু সমাজভাবনাদীপ্ত। প্রচলিত বিষয়বস্তু নিয়ে গল্প লেখার গতানুগতিক অভ্যাস সকলেই প্রায় ত্যাগ করেছেন বলা যেতে পারে। একজোড়া তরুণ তরুণীর 'দেখামাত্র প্রেম উপজিল' ধরনের মধ্যবিত্তসুলভ হাস্যকর প্রেমকাহিনী বিবৃতির অশ্রদ্ধেয় রেওয়াজ প্রায় প্রত্যেকেরই দ্বারা পরিত্যক্ত। জীবনসংগ্রামবিমুখ তথা অব্যাহতিবাদের পরিপোষক স্বাপ্নিক মনের আশ্রয় অবাস্তব রোমান্সের কুহক আর কাউকেই আকর্ষণ করে না বলা চলে। গার্হস্থ্য প্রেম কিংবা তুচ্ছাতি-তুচ্ছ পারিবারিক ঘর সংসারের কাহিনীও আর এঁদের লেখনীর উপজীব্য নয়। সুতরাং পূর্বধারা থেকে ছেদ অতি স্পষ্ট, সংশয়ের কোনই অবকাশ নেই এ ব্যাপারে।

তবে এঁদের রচনার আঙ্গিক ও ভাষা সম্পর্কে দুটি একটি কথা বলা বোধ করি প্রয়োজন। বিষয়বস্তু যতই নূতন আর মৌলিক হোক আঙ্গিক ও ভাষা প্রকরণের ক্ষেত্রে কিন্তু ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হলে চলে না। সাহিত্য শিল্পের অনুষঙ্গে এ কথা প্রায় আপ্তবাক্যের ন্যায় স্বীকার্য যে, ভাববস্তুতে অভিনবত্বের ও মৌলিকতার অনুশীলন সর্বথা-কাম্য; পক্ষান্তরে ভাষা প্রকরণে পুরাতনের সঙ্গে ধারাবাহিকতার ক্রম থাকা চাই। অর্থাৎ কনটেন্ট হবে আধুনিক, প্রগতিশীল; ফর্ম হবে ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগযুক্ত। সাহিত্য শিল্পের সার্থকতার চাবিকাঠিই রয়েছে এই সমন্বয়ের মধ্যে। কথা শিল্পের ক্ষেত্রে এ কথা আরও বেশী করে প্রযোজ্য।

কিন্তু দু-চারটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত বাদ দিলে এই বাঞ্ছিত সমন্বয় বিশেষ

কারও লেখায় চোখে পড়ছে না। অধিকাংশ লেখকই বাস্তবতার ঝোঁক বশতঃ কাহিনীকে জীবনের কাছাকাছি আনবার চেষ্টায় সংলাপের উপর অতিমাত্রায় গুরুত্ব দিচ্ছেন, কিন্তু ন্যারেশনের দিকে অর্থাৎ গল্পের বিবৃতিমূলক অংশের দিকে তার সিকির সিকি মনোযোগও দিচ্ছেন না। গল্পগুলি প্রায় ক্ষেত্রেই সংলাপ-সর্বস্ব (তাও অনেক স্থলে আঞ্চলিক উপভাষার সংলাপ) হয়ে পড়ছে, ন্যারেশন মোটেই দানা বেঁধে উঠতে পারছে না। আর ডেসক্রিপশান (বর্ণনা) তো প্রায় বিদায় নিতে বসেছে। এ কখনই বাংলা ছোটগল্পের ঐতিহ্য ছিল না। বাংলার প্রত্যেক প্রথম শ্রেণীর গল্পলেখক সংলাপের শিল্পে যেমন কুশলী ছিলেন, তেমনি বিবৃতি আর বর্ণনার ক্ষেত্রেও সমান সুদক্ষ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের সুবোধ ঘোষ, বিমল মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ সকলের রচনারীতি সম্বন্ধেই এই মন্তব্য করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ ভাষাব্যবহারে, শব্দ যোজনায় আরও বেশী পারিপাট্যবোধ, ধ্বনি-চেতনা, সংযম প্রত্যাশিত। চাই আরও অধিক প্রাঞ্জলতা ও প্রসাদ গুণ। বাক্যবন্ধের গ্রন্থনায় ও শব্দের বিন্যাসে ছিমছাম হতে পারাটা যেন অনেকেরই কাছে কোন ধর্তব্যের বিষয় নয়। বিন্যাসের পরিচ্ছন্নতা একটি বড় গুণ। এ বিষয়ে সবচেয়ে প্রখর চেতনার পরিচয় পাওয়া গেছে চিত্ত ঘোষাল, তপোবিজয় ঘোষ, মনি মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকদের মধ্যে, তারপর তারতম্যের ক্রম অনুযায়ী একে একে অন্যদের নাম করা যায়। গ্রামীণ চাষী জীবনের পরিবেশ চিত্রণে রামশঙ্কর চৌধুরী, শুভঙ্কর চক্রবর্তী, অশোককুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ আশ্চর্য মাটির স্বাদ বয়ে নিয়ে এসেছেন তাঁদের লেখায়, তবে তাঁদের রচনারীতিও কম-বেশী সংলাপ প্রধান, বিবৃতি বা বর্ণনাংশ নেই বললেই চলে। সমালোচনা ও প্রতিবাদাত্মক মনোভাবের দিক থেকে যে কজন লেখক বিশেষ মনোযোগ দাবী করতে পারেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মিহির আচার্য, কৃষ্ণ চক্রবর্তী ও তপোবিজয় ঘোষ। অমিয় চৌধুরী একজন নিপুণ গল্পকথক (স্টোরি-টেলার)। তবে ভাষার শিল্পে তাঁর আরও মনোযোগী হওয়া দরকার। দেবদত্ত রায় একজন নিষ্ঠাবান গল্পলেখক তবে তাঁকেও পরিবেশনার দিক দিয়ে আরও পরিচ্ছন্ন হতে হবে। হীরালাল চক্রবর্তী রাজধানীর শহরতলীতে বসবাসকারী খেটে খাওয়া দেহাতী মানুষদের জীবন নিয়ে কয়েকটি সুন্দর গল্প লিখেছেন। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গল্পের বিষয়বস্তু রকমারি, চরিত্র সৃষ্টিতে বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তবে তাঁর পরিবেশনা আরও ছিমছাম, আরও আঁটোসাঁটো হওয়া

দরকার। কালিদাস রক্ষিত ও অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়ের গল্পের শিল্প মোলায়েম ও সুর মৃদু, লেখায় কোথাও কোথাও গতদিনের মধ্যবিত্ত মানসিকতার প্রভাব অলক্ষ্য নয়; তবে এই জাতীয় ছোটখাটো ত্রুটি বাদ দিলে এঁদের তুলনায় লেখা খুবই স্বাদু। বারিদবরণ চক্রবর্তীর গল্পে স্যাটেরিক্যাল কোয়ালিটির পরিচয় স্পষ্ট। তরুণতরদের মধ্যে অমল চক্রবর্তী ও অলক সান্যালের লেখায় সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি বর্তমান।

শিল্পকলার পারস্পরিক সম্বন্ধ

সাহিত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত, অভিনয় প্রভৃতি সুকুমার কলা-সংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে আপাত দৃষ্টিতে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, তাদের পরস্পরের ভিতর একটা মূলগত ঐক্য আছে। একই আত্মপ্রকাশের তাড়না থেকেই তাদের প্রত্যেকটির উদ্ভব, যদিও বাইরে তাদের রূপ আলাদা আলাদা। সাহিত্য অক্ষর এবং অক্ষরের সমষ্টি শব্দের শিল্প; চিত্রকলা রঙ ও রেখার শিল্প; সঙ্গীত স্বর ও সুরের শিল্প; অভিনয় অঙ্গভঙ্গি ও বাক্যের দ্বারা ভাবপ্রকাশের শিল্প; নৃত্য দেহছন্দের শিল্প, ইত্যাদি। এই রকম আরও সব সুকুমার শিল্পের বিভাগ আছে যেগুলির এক-একটিকে অবলম্বন করে মানবীয় মনের অন্তর্নিহিত দুর্নিবার আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষা এক এক ঢঙে বা ভঙ্গিমায় প্রকাশমান হয়ে থাকে। কিন্তু মূলে আছে একই বুনিয়াদী প্রেরণা—আপনাকে আপনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে অনেকের মধ্যে তাকে ছড়িয়ে দেবার তাগিদ।

এক কথায় এটি হলো ব্যক্তিত্বের বিকাশচেষ্টার একেবারে গোড়াকার কথা। যখনই আমরা আমাদের নিজের ভিতরকার কোন তাগিদকে—তা শব্দগতই হোক স্বরগতই হোক আর রেখাগতই হোক আর ভঙ্গিমাগতই হোক—অন্য দশজনার মধ্যে সম্প্রসারিত করতে চাই, ওই প্রক্রিয়ায় আমাদের ব্যক্তিত্ব তৃপ্ত হয়, সার্থকতার গৌরব অনুভব করে। সার্থকতাবোধের তারতম্য নির্ভর করে এই জাতীয় চেষ্টার ফলে ব্যক্তিত্ব কতখানি প্রসারিত বা বিকশিত হলো তার উপর।

সুতরাং যে কোন শিল্পকলার মূলগত তাগিদ হলো আত্মপ্রকাশের তাগিদ। এই আত্মপ্রকাশের তাগিদ কখনো শব্দকে আশ্রয় করে লীলায়িত হয়, কখনো সুরকে, কখনো রঙ ও রেখাকে, কখনো দেহভঙ্গিমাকে। আর এই সব শিল্প-কলার বিভাগের মধ্যে মূলগত ঐক্যসূত্র বিধৃত আছে বলেই বাইরে তাদের প্রকারে যতই ভিন্নতা তথা প্রকৃতিগত বৈসাদৃশ্য লক্ষ্যগোচর হোক না কেন, রসিকসুজন জানেন যে তাদের প্রত্যেকেরই বুনিয়াদ এক—একই ভিত্তিগত কাঠামোর অবলম্বনে তাদের অবয়ব গঠিত। একটি কবিতা আর একটি (ধরা যাক) গান দৃশ্যত: যতই পৃথক বলে মনে হোক না কেন, তাদের দুয়েরই মূলে আছে নিজেকে বহুর মধ্যে ছড়িয়ে দেবার প্রেরণা। কিংবা একটি চিত্রকর্মের সঙ্গে (ধরা যাক) একটি নৃত্যছন্দের ভঙ্গিমার আপাতদৃষ্টিতে যতই ভিন্নতা

পরিলক্ষিত হোক না কেন তাদের দুয়ের মূলেও আছে একই আত্মসম্প্রসারণের প্রেরণা, আপনাকে আপনাতে আবদ্ধ না রেখে অনেকের মধ্যে তাকে অনুভব করবার মৌলিক ইচ্ছা। কাজেই বাইরের রূপভেদটা আপাত-প্রতীয়মান পার্থক্যমাত্র, ভিতরের বস্তু এক। এই ভিতরের বস্তুটাকে মূলগত শৈল্পিক প্রেরণা বলতে পারি।

উপরের কথাগুলি যে নেহাত কথার কথা নয়, সেগুলি যে অবলীলায়িত আপ্তবাক্যের আকারে উচ্চারিত হয়নি, সেটা দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, নাট্য ও অভিনয়শিল্পীদের জীবনের দিকে একনজর তাকালেই বুঝতে পারা যাবে। এঁদের জীবনধারা একটু পর্যালোচনা করলেই এই মৌলিক তথ্যটি পাওয়া যাবে যে, আসলে তাঁরা তাঁদের অন্তর্লোকে যে বস্তুটির দ্বারা অধিকৃত, আবিষ্ট, আচ্ছন্ন ছিলেন তার নাম শৈল্পিক প্রেরণা অর্থাৎ আত্মপ্রকাশের দুর্নিবার, দুরন্ত, অপ্রতিরোধ্য বাসনা। এই বাসনা ব্যক্তিভেদে কখনও কথার রঙ ধরেছে, কখনও সুরের, কখনও রেখার, কখনও অঙ্গচ্ছন্দের; আবার ব্যক্তি-ভেদেরও প্রয়োজন হয়নি, একই ব্যক্তিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 'মুড' বা মেজাজ-মর্জির বশবর্তিতায় এই মৌলিক শিল্প প্রেরণা বিভিন্ন রূপান্তর খুঁজেছে।

বড় ছোট অনেক দৃষ্টান্ত দিয়েই কথাটার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করবার চেষ্টা করা যায়। বড় দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে পাই লেনার্দো দা ভিঞ্চি, মিকেলেঞ্জেলো, গোটে, রবীন্দ্রনাথ, রোলাঁ, সোয়াইৎসজার প্রমুখের উদাহরণ; আর মাঝারি বা ছোট উদাহরণের নমুনা দেশ-বিদেশের শিল্প সাহিত্যের ইতিহাসে ভূরি ভূরি ছড়িয়ে আছে। সকলেই জানেন যে দা ভিঞ্চি এক বহুমুখী প্রতিভাধর ব্যক্তি ছিলেন। মধ্যযুগের ইতালিতে রেনেসাঁসের আলোক-প্রভায় দশদিক আলোকিত করে তোলার ক্ষেত্রে যে মুষ্টিমেয় সংখ্যক মানুষ অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে তিনি একজন। তিনি ছিলেন গণিতবিদ, বিজ্ঞানী, আবিষ্কারক, সমরকুশল নায়ক, কবি, সর্বোপরি একজন প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী। তাঁর 'মোনালিসা' ছবিটি আজো পৃথিবীর বিস্ময় হয়ে আছে চিত্রাঙ্কিতা এক নারীর রহস্যময় হাসির জন্য। অদ্ভুত হেঁয়ালিভরা সেই হাসির আবেদন। দা ভিঞ্চিরই প্রায় সমসাময়িক কালের শিল্পী মিকেলেঞ্জেলো ছিলেন মূলতঃ ভাস্কর, কিন্তু চিত্রশিল্পেও তাঁর দক্ষতা বড় কম ছিল না। রোমের ভাটিকান প্রাসাদের সিস্টাইন চ্যাপেলের গায়ে তিনি যেসব প্রাচীর চিত্র এঁকে রেখে গেছেন তা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। অন্যদিকে তিনি ছিলেন একজন সংবেদনশীল কবি। যে

হাতে হাতুড়ি-বাটালি ধরে ভাস্কর্যের মূর্তি গড়েছেন, রঙ তুলিকাপাতে ছবি এঁকেছেন, সেই হাতেই আবার কাব্যরচনার জন্য কলম ধরেছেন। একই আত্মপ্রকাশের তাগিদ তাঁর এই বিভিন্নমুখী শিল্প তৎপরতার মূলে সক্রিয় থেকে তাঁকে কখনও এ কাজ কখনও ও কাজ কখনও তৃতীয় কোন কাজের অভিমুখে চালনা করেছে। তাঁর শিল্পী-ব্যক্তিত্ব নানা মুখে ছড়াতে চেয়ে তাঁর অদম্য প্রাণশক্তিরই পরিচয় বারে বারে অভিব্যক্ত করেছে।

জার্মান কবি গ্যেটে বহুমুখী প্রতিভার আর একটি বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত। তিনি কবি, চিত্রশিল্পী, বিজ্ঞানসাধক, ভূতত্ত্ববিদ, নাট্যপ্রযোজক, সঙ্গীতবেত্তা, আরও কত কী। গ্যেটের চৌকস প্রতিভার রহস্য ভেদ করা কঠিন হতো যদি না সেই প্রতিভার মূলে একই প্রাণশক্তির লীলা থেকে বিচ্ছুরিত আত্মপ্রকাশের দুর্নিবার আকৃতি আমরা লক্ষ্য করতুম। নারীর প্রেমের প্রতি তাঁর দুর্বার আকাঙ্ক্ষার মূলেও আছে তাঁর ওই অদম্য প্রাণশক্তির চঞ্চলতা।

গ্যেটের উত্তর সাধনার ধারা বেয়ে একালে আমরা বহুমুখী প্রতিভার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ পাচ্ছি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জীবনের মধ্যে। কবি যদিও নম্র স্বীকারোক্তি করেছেন এই বলে যে তাঁর কবিতা "গেলেও বিচিত্রপথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী", তাহলেও তাঁর প্রতিভা বলতে গেলে প্রায় সর্বত্রগামিতার লক্ষ্যে পৌঁছেছিল। তিনি কী ছিলেন বলার চেয়ে তিনি কী ছিলেন না বলা কঠিন, তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, নাট্যকার, অভিনেতা, কথাসাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী, প্রবন্ধকার, সমালোচক, ব্যাকরণবিদ, ছান্দসিক, দার্শনিক, ধর্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু, হাস্যরসিক, নৃত্যপরিকল্পক, কৃষিপণ্ডিত, ইত্যাদি। এই যে এত বিভিন্ন মুখে তাঁর প্রতিভার উৎসার ও আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতা, তার মূলে একটাই রহস্য কাজ করছে: একটি প্রবল সৃষ্টির স্রোত ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেঙে নানাখান হওয়ার গতিশীলতা। যে হাতে কবি কাব্য রচনা করেছেন সেই হাতেই আবার ছবি এঁকেছেন রঙ তুলিকার অপূর্ব বর্ণালীসম্পাতে। ছবি আঁকতে আঁকতে আবার বৃদ্ধ বয়সে বেরিয়েছেন শান্তিনিকেতনের নাট্যদল নিয়ে উত্তর ভারতের বিভিন্ন শহরে নাটক ও গীত পরিবেশনের উদ্দেশ্যে। নাট্য ও গীতিনাট্য তাঁর প্রতিভায় একাঙ্গী হয়ে গেছে। ছবি আঁকতে গিয়ে কবিতা লিখেছেন, কবিতা লিখতে গিয়ে ছবি এঁকেছেন। তুলি কলম হয়েছে, কলম তুলি হয়েছে। লহমায় লহমায় সৃষ্টিশীল ভূমিকার রূপান্তর একই ব্যক্তিতে সৃষ্টির বিচিত্র পথগামিতার তত্ত্বটিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

ফরাসী দেশের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী লেখক রোমাঁ রোলাঁ মূলতঃ লেখক কিন্তু সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবেও তাঁর ভূমিকা বড় কম গৌরবের নয়। তিনি একজন কৃতী পিয়ানো শিল্পী। তাছাড়া পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ইতিহাসকার এবং বেটোফেন প্রমুখের জীবনচরিত রচয়িতা রূপেও তাঁর খ্যাতি দূরবিস্তৃত ছিল। রোলাঁ লিখতে লিখতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, পিয়ানোর ডালা খুলে পিয়ানোয় বসতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলতো তাঁর পিয়ানোতে অনবদ্য সুর লহরীর সৃষ্টি। সুর থেকে বাণীতে বাণী থেকে সুরে তাঁর গতায়াত ছিল হস্তামলকবৎ সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ। তাই তো রোলাঁ বিশ্বজোড়া মানুষের মন কেড়ে নিতে পেরেছিলেন এমন অবাধে—নিছক কথাশিল্পী হলে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব এমন অপ্রতিরোধ্য হতো কিনা সন্দেহ। রোলাঁরই প্রায় সমসাময়িক কালের আরেকজন প্রসিদ্ধ পিয়ানোবাদক জার্মান জাতি সম্ভূত আলবার্ট সোয়াইৎজার বৃত্তিতে ছিলেন ডাক্তার। অধিকন্তু একজন ধর্মতত্ত্ববিদ ও দার্শনিক। আফ্রিকার গাভোন প্রদেশের ঘন অরণ্য সমাকীর্ণ গহন অঞ্চলে তথাকার কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীদের মধ্যে তাঁর হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবসেবার মহান দৃষ্টান্তের ইতিবৃত্ত কে না জানেন। ধর্মের পিপাসা, সঙ্গীতের পিপাসা আর মানবসেবার পিপাসা তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে একাধারে মিশে গিয়েছিল। এ শিল্পী ও ভাবুকের এক আশ্চর্য সমন্বয়।

অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণতর গণ্ডীর পরিসরে আমাদের দেশের কিছু লেখকের জীবনেও বহুমুখিতার তথা সব্যসাচিত্বের একাধিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এ কথা কারও কারও জানা থাকলেও এখনও একটি বহুবিদিত তথ্যের আকার পায়নি যে, অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র একজন দক্ষ চিত্রশিল্পী ছিলেন। রেঙ্গুনে থাকতে তিনি একদা চিত্রকলাশিল্পের বিলক্ষণ চর্চা করেছিলেন। বাণভট্টের কাদম্বরীর নায়িকা মহাশ্বেতার অবলম্বনে তাঁর একটি উৎকৃষ্ট চিত্রকর্ম ছিল। অন্য অনেক ছবির সঙ্গে সেই অমূল্য বস্তুটি আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। শরৎচন্দ্রের আঁকা 'রূপোবতী' ছবি, যা এখনও বিদ্যমান, তাঁর চিত্রাঙ্কন নৈপুণ্যের এক অভ্রান্ত প্রমাণ। তাছাড়া শরৎচন্দ্র একজন সুকণ্ঠ গায়কও ছিলেন। কথাশিল্পী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় একদা চিত্রচর্চা করতেন। তাঁর মুক্তোর পাঁতির মতো হস্তাক্ষর তাঁর সৌন্দর্যপ্রবণ পরিচ্ছন্ন মনের এক নির্ভুল নিশানা। আরেকজন কথাশিল্পী জগদীশ গুপ্ত অবসর সময়ে বেহালা বাজাতেন। বাংলা কথাসাহিত্যে বাস্তবতার আদর্শের তিনি একজন পথিকৃৎ, এবং সেই দিক থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একজন পূর্বসূরী। কিন্তু তাঁর বেহালা

বাজানোটা যেন ভিন্ন গোত্রের এক চর্চা। এ যেন কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী ভাবের কাব্য চর্চা আর প্রেমভাবোদ্দীপক সঙ্গীত রচনার মত একই আঙিনায় আলো ছায়ার বর্ণালিম্পনের একান্তরক্রমিক খেলার মতো। শিল্পীর মেজাজ-মর্জিতে কখনও রুদ্রের আবির্ভাব কখনও মৃদু-মধুরের স্নিগ্ধ আনাগোনা; কখনও বাস্তবের পরুষ-কঠোর স্পর্শ কখনও পেলব কোমলের পরশ। একই শিল্পী ব্যক্তিত্বের খেয়ালমাফিক রূপান্তরের জন্যই যে এ রকমটা ঘটতে পেরেছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

অপসংস্কৃতির সমস্যা

॥ ১ ॥

অপসংস্কৃতির সমস্যাকে কেবলমাত্র যৌনতার সমস্যার সঙ্গে এক করে দেখা ঠিক নয়। যৌনতা কিংবা অশ্লীলতা অবশ্যই অপসংস্কৃতির এক প্রধান লক্ষণ, কিন্তু তাতেই অপসংস্কৃতির পরিধি নিঃশেষিত নয়। অপসংস্কৃতির পরিধি আরও অনেক ব্যাপক, আরও অনেক বহুগ্রাসী। প্রকৃতপক্ষে জীবনের গোটা সীমানাতেই তার বিচরণ এবং নানাভাবে নানা উপায়ে জীবনের মূল কুরে কুরে খাওয়াই তার ধর্ম। সংস্কৃতি বলতে যেমন শুধু শিল্প-সাহিত্য-সুকুমারকলা ইত্যাদির ক্ষেত্রকেই মাত্র বোঝায় না, মানুষের সমগ্র জীবনচর্যা বা জীবনাচরণকে বোঝায়; তেমনি অপসংস্কৃতি বলতে বোঝায় সুস্থ জীবনাচরণের বিরোধী এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি বা অভ্যাস, যা স্পষ্টতই বিকার ও মলিনতার পথে মানুষের জীবনীশক্তিকে ক্রমশ ক্ষয় করে চলে এবং পরিণামে তাকে সমাজের পক্ষে এক গলগ্রহে রূপান্তরিত করে। মানুষের প্রকৃতিকে নিম্নগামী, বিপথগামী করাই অপসংস্কৃতির কাজ—তা, সদ্যবর্ণিত সূত্র অনুযায়ী, শিল্প-সাহিত্যের মাধ্যমেও হতে পারে, আবার বৃহত্তর সমাজাচরণের মাধ্যমেও হতে পারে।

এই মানদণ্ডে বিচার করে দেখলে দেখা যায় গোটা জীবনের পরিধিটাই অপসংস্কৃতির আক্রমণের স্থল। সাহিত্যে অশ্লীলতা বা নাট্য-উপস্থাপনায় নগ্নতা যেমন অপসংস্কৃতির একটা বিশেষ পরিচিত দিক, তেমনি আচার-আচরণের ক্ষেত্রে অশিষ্টতা, অভব্যতা, ক্রূরতা, মধ্যযুগীয় মনোভাবের আধিপত্য, কুসংস্কার, ভিখিরিপনা, ধর্মের নামে ক্রিয়াকাণ্ড-অনুষ্ঠানাদির বাড়াবাড়ি, পানাসক্তি, জুয়া, হিংস্রতা, মস্তানি দৌরাত্ম্য এবং এই জাতীয় আরও অনেক সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপও অবধারিতভাবে অপসংস্কৃতির কোঠায় পড়ে।

এক কথায় বলতে গেলে অপসংস্কৃতির অর্থ হল অন্ধকারের চর্চা। অন্ধকার বিবরে এর উদ্ভব এবং সর্বপ্রকার অসামাজিক প্রবৃত্তির সুড়ঙ্গ পথের আঁধারে এর আনাগোনা। সুস্থ মানসিকতার রৌদ্রালোকে ভেসে উঠতে অপসংস্কৃতির বড় ভয়, কারণ রোদের আলো এর সহ্য হয় না. পেচকের মত গোপনতার কোটরে সেঁধিয়ে থাকতেই এর স্ফূর্তি ও উল্লাস। উন্মুক্ত রৌদ্রালোককে অপসংস্কৃতি ভয় পায় তার কারণ রৌদ্রের আলো প্রকাশ্যতার প্রতীক, বহির্মুখীনতার প্রতীক,

মানুষের বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। অপসংস্কৃতি এই সব কয়টি বৃত্তিরই নাস্তিমূলক এক প্রবৃত্তি। অসামাজিক তার কাজকর্মের ধরন, মানবতাবিরোধী তার কাজকর্মের ফলাফল; জনজীবনের স্বার্থের এ ঘোরতর পরিপন্থী, কারণ জনজীবনের আবেগ, মনন ও অভ্যাসকে সুস্থ জীবনধর্মের পথ থেকে ভ্রষ্ট করে তাকে অপথে ও কুপথে চালিত করাতেই তার বিকৃত আনন্দ।

উপরের বর্ণনার নিরিখে যদি অপসংস্কৃতির পরিচয় এক কথায় দিতে হয় তো বলতে হয় সংস্কৃতির অনুষঙ্গে যা-কিছু জনগণবিরোধী, মানবতা বিরোধী তা-ই অপসংস্কৃতি। অপসংস্কৃতি ও তার তাবৎ লক্ষণগুলিকে আমাদের সর্বপ্রযত্নে রোধ করা দরকার, যেহেতু অপসংস্কৃতির প্রসার মানেই হল জনস্বার্থের বিরুদ্ধ শক্তির বিস্তার। জনসাধারণের জাগ্রত চেতনাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার জন্য অপসংস্কৃতির কারবারীদের কলাকৌশল, ফন্দী-ফিকিরের অন্ত নেই। পিছন থেকে অনেক পাকা মাথা এ কাজে ওদের মদদ্ জোগাচ্ছে। কাজেই এ ব্যাপারে আমরা একটু ঢিল দিয়েছি কি অপসংস্কৃতির অগ্রগমনের পথ প্রশস্ত করা, বিবরাশ্রয়ীদের অন্ধকার কোটরের ঘুপচি থেকে বেরিয়ে এসে রৌদ্রালোককে গ্রাস করবার সুযোগ করে দেওয়া। দেশের মঙ্গল যদি আমাদের অভীষ্ট হয়, দেশের সর্বসাধারণের কল্যাণ-টাই যদি আমাদের সর্বাপেক্ষা ধ্যেয় বস্তু হয়, তাহলে এ কাজ আমরা কোনমতে করতে দিতে পারি না। আমাদের সদাসতর্ক প্রহরীর মত অপসংস্কৃতির আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে রক্ষা করবার দায়িত্ব নিতেই হবে।

ঠিক এই পরিপ্রেক্ষিতেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর এতৎসংক্রান্ত বিবৃতির তাৎপর্য আমাদের অনুধাবন করতে হবে। বিগত জুন মাসের নির্বাচনের ফলে বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গের সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার কিছুকালের মধ্যেই শ্রীযুক্ত বসু ওই বিবৃতি মারফৎ অপসংস্কৃতিকে রোধবার জন্য পশ্চিমবাংলার জনসাধারণের কাছে এক সনির্বন্ধ আবেদন রেখেছেন। রাজ্যের মুখ্য সরকারী প্রশাসকের পক্ষে সংস্কৃতির মঙ্গলামঙ্গল নিয়ে ভাবিত হয়ে রাজ্যের শাসনরজ্জু ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে ডাক দেওয়ার ঘটনায় প্রথম প্রথম অনেকেই হকচকিয়ে গিয়েছিল এই ভেবে যে, তাহলে কি পশ্চিমবঙ্গের সর্বসাধারণের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক ভাগ্যোন্নয়নের পাশে পাশে এখন থেকে তাদের সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নের প্রশ্নটিও পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনের সমান মনোযোগ লাভ করল? এবং এক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণের প্রাথমিক পদক্ষেপ ওই বিবৃতি? তাহলে কি নতুন রাজ্য প্রশাসন সংস্কৃতিকেও রাজনীতি-অর্থনীতির মত সমান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করেন এবং তার প্রবর্ধনায় আন্তরিকভাবে

যত্নবান? তাই যদি হয় তাহলে তার চেয়ে সুখের বিষয় আর কিছু হতে পারে না। বিশেষত এ রাজ্যের সংস্কৃতিমনা ও সংস্কৃতিপ্রেমীদের কাছে এ এক বিশেষ উৎসাহিত হবার মত সংবাদ।

গোড়ায় এই নিয়ে একটু হতচকিত ভাব বা অবিশ্বাসের ভাব দেখা দিয়েছিল এই কারণে যে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের রেকর্ড অত্যন্ত কলঙ্কজনক। শুধু যে তাঁরা সংস্কৃতিকে দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল তা-ই নয়, সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে যত্নবান না হয়ে তাঁরা সর্বপ্রকার অপসংস্কৃতিকেই মদদ্ জুগিয়ে এসেছে বরাবর। কংগ্রেসী শাসন আমলেই নাটকে ও যাত্রায় ক্যাবারে নাচের প্রচলন, সাহিত্যক্ষেত্রে 'বাজারী' লেখকদের রবরবা ও তাঁদের কলমে যৌনতাসর্বস্ব গল্পোপন্যাসের আবিল বন্যা-স্রোতের উচ্ছ্বাস, সমাজবিরোধী মস্তানতন্ত্রের অসহনীয় দৌরাত্ম্যের দাপট, শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচণ্ড নৈরাজ্য ও উচ্ছৃঙ্খলতার দাপাদাপি, ধর্মচর্চার অজুহাতে নিকৃষ্ট তামসিকতার চর্চা, যুবসম্প্রদায়ের একাংশের মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত পানবিলাস ও অন্যান্য ব্যসনাসক্তি,—এসব এবং এই জাতীয় আরও অন্যান্য অপলক্ষণের বিস্তৃতি। সবই অপসংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত ও তার প্রকাশ। কাজেই বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্য প্রতিনিধির এই উদাত্ত আহ্বানের পুরোপুরি তাৎপর্য গ্রহণে প্রস্তুত হতে কিছু সময় লেগেছিল। কিন্তু যখন আমরা স্মরণ করি যে বামফ্রন্ট সরকারের চরিত্র আর পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের চরিত্রে আকাশ-পাতাল প্রভেদ এবং বামফ্রন্ট সরকার সত্যি-সত্যি এ রাজ্যের জনগণের কল্যাণবিধানে প্রতিজ্ঞা ও দায়বদ্ধ, তখন আর নতুন মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় অবাক হওয়ার কিছু থাকে না।

তার উপরে আমাদের এও খেয়াল রাখা দরকার যে, সংস্কৃতি আর রাজনীতি-অর্থনীতি পরস্পর অসম্পর্কিত ব্যাপার নয়, এই দুই ধরনের ব্যাপারের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে যতই দূরত্ব আছে বলে মনে হোক-না কেন, ভিতরে-ভিতরে নিগূঢ় যোগ বর্তমান। সমাজের মূল বুনিয়াদ হল অর্থনীতি, সংস্কৃতি হল তার উপর-তলাকার সৌধ। একের প্রভাব অন্যের উপরে অবশ্যম্ভাবী হয়ে দেখা দেয়। মূলগতভাবে অবশ্য অর্থনীতিই সংস্কৃতির রূপ নিয়ন্ত্রিত করে অর্থাৎ একটা বিশেষ অবস্থায় ও কালে সংস্কৃতির চেহারা কী দাঁড়াবে সেই বিশেষ অবস্থার ও কালের অর্থনৈতিক সমাজ-কাঠামোই সেটা মূলত স্থির করে দেয়; কিন্তু কখনও কখনও এমনও দেখা যায় যে সংস্কৃতিই উল্টো অর্থনীতির উপর প্রভাব ফেলে। দুইয়ের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক বিদ্যমান। দেশের জনসাধারণ যদি অপসংস্কৃতির

কুপ্রভাবে তিমিরাচ্ছন্ন ও অজ্ঞ থাকে তাহলে জীবনযুদ্ধে তাদের জড়তাগ্রস্ত ও আলস্যপরায়ণ হওয়া সুনিশ্চিত। সেক্ষেত্রে তাদের সংগ্রামী চেতনা মরে যায়, তারা কায়েমীস্বার্থবাদী অত্যাচারী শ্রেণীগুলির সহজ শিকার হয়ে পড়ে। তখন তাদের দিয়ে যা-ইচ্ছে-তা করানো যায়। অপসংস্কৃতির কাজই হল জাগ্রৎ সম্বিতকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা। ঘুমিয়ে-পড়া, ঝিমিয়ে-পড়া চৈতন্যকে অভিসন্ধি-পরায়ণ লোকদের মতলব পূরণের হাতিয়ার করে তোলা কত সোজা। আর একবার এইভাবে জনগণ সুবিধাভোগী শ্রেণীর লোকদের অভিপ্রায় সাধনের যন্ত্রে পর্যবসিত হলে তাদের যদৃচ্ছ শোষণ ও অবদমনের অবাধ ছাড়পত্র লাভ করা যায়। এরকম স্থলে জনসাধারণের জীবনযুদ্ধে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। পরাজিত মানুষের বিজেতার ক্রীড়নকে পরিণত হওয়া দুয়ে-দুয়ে-চারের মতই স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার।

কায়েমীস্বার্থবাদীরা এটা জানে বলেই তারা সমাজের মধ্যে অপসংস্কৃতির বীজ ছড়াবার জন্যে সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করে। যত বেশী সংখ্যক মানুষকে অপসংস্কৃতির আফিঙ্ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায় ততই তাদের লাভ। এইজন্যই দেখা যায় তারা অর্থনীতি এবং সংস্কৃতি এই দুই ফ্রন্টেই সমাজবিরোধীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তারা অর্থনীতির ক্ষেত্রে যেমন জনগণকে বেপরোয়াভাবে শোষণ করে তেমনি শিল্প-সাহিত্য ইত্যাদির স্তরেও নিরঙ্কুশভাবে অপসংস্কৃতির অভিযান চালায়। আর্থিক দিক থেকেই হোক আর সাংস্কৃতিক দিক থেকেই হোক জনসাধারণকে ঘায়েল করতে পারা নিয়ে কথা, আর জনগণ একবার ঘায়েল হলে তাদের শাসন ও শোষণে একচ্ছত্র অধিকার প্রয়োগের পথে আর কোন বাধা থাকে না।

ঠিক এই পরিপ্রেক্ষিতটি মনে রাখলে কেন বামফ্রন্ট সরকারের শীর্ষনায়ক হিসাবে শ্রীযুক্ত বসু ক্ষমতায় আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অপসংস্কৃতির প্রতিরোধের জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে অসুবিধা হয় না। অর্থনীতির লড়াই আর সংস্কৃতির লড়াই অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। এককে বাদ দিয়ে অন্যটির জয়ে সিদ্ধি আশা করা যায় না। যেমন আর্থিক বুনিয়াদ পাকা না করে সাংস্কৃতিক উপরতলকে মজবুত করা যায় না, তেমনি সংস্কৃতিকে খোঁড়া রেখেও আর্থিক লড়াই জোরের সঙ্গে চালানো যায় না। একটি বিকল হলে অন্যটিও সঙ্গে সঙ্গে বিকল হতে বাধ্য। এই জন্যই অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান পরিচালনের প্রয়োজনীয়তা, আর এই দৃষ্টিতেই বামফ্রন্ট সরকার এই দিকে মন দিয়েছেন।

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তো শুধু নঞর্থক মর্মের মধ্যেই তাঁর আহ্বানকে সীমিত

রাখেননি, তাঁর আবেদনের একটি সদর্থক মর্মও আছে। তিনি শুধু অপসংস্কৃতির প্রতিরোধের কথাই বলেননি, একই সঙ্গে বাংলার সংস্কৃতির যে সুস্থ ঐতিহ্য দীর্ঘকাল থেকে বহমান তাকে রক্ষা করবার প্রয়োজনের উপরও সমান জোর দিয়েছেন। অপসংস্কৃতি হল তাঁর ঘোষণার নিষেধাত্মক দিক, সুস্থ সংস্কৃতি হল তাঁর ঘোষণার অস্তিবাচক দিক। এই দুইয়ে মিলে তাঁর বিবৃতিটি পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

বাংলার সংস্কৃতির একটি দীর্ঘদিনের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য বর্তমান। বিশেষ, আধুনিক বাংলার শিল্প শিক্ষা বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ঐতিহ্য, যা আমরা পূর্বতনদের হাত থেকে উত্তরাধিকার স্বরূপ পেয়েছি, তা খুবই ঐশ্বর্যময়। বহু বহু দিক্‌পাল মনীষী ও কবিদের দানে এই ঐতিহ্যের কলেবর পরিপুষ্ট। রথী-মহারথীদের সে এক দীর্ঘ সারিবদ্ধ মিছিল: এই মিছিলের আরম্ভ-বিন্দুতে আছেন রামমোহন রায়, তারপর একে একে এসেছেন দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, ভূদেব, অক্ষয়কুমার, ডিরোজিও ও ডিরোজিও-শিষ্যপরম্পরা, রাজেন্দ্রলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, হরিশচন্দ্র, হেম-নবীন-গিরীশ-অক্ষয় বড়াল, রবীন্দ্রনাথ, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ-আনন্দমোহন, রামেন্দ্রসুন্দর, স্বর্ণকুমারী-সরলা-কামিনী-অনুরূপা নিরুপমা, বিবেকানন্দ-অরবিন্দ-ব্রহ্মবান্ধব-ভূপেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্র-গগনেন্দ্র-নন্দলাল যামিনী রায়, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন-সুভাষ, জগদীশচন্দ্র-প্রফুল্লচন্দ্র-মেঘনাদ সাহা প্রমুখ এবং এঁদের অনুরূপ আরও কত কত বিশিষ্ট জন। আমাদের কালের বরেণ্যদের কথা তো বাদই দিলাম। শিক্ষায় সাহিত্যে, সমাজ-সংস্কারে, রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার প্রসারের আন্দোলনে, চিত্রকলায়, বিজ্ঞানচর্চায় ও জাতীয় জীবনের অন্যান্য বিভাগে এঁরা ও এঁদের সমধর্মী মানুষেরা এঁদের সম্মিলিত সাধনায় বাংলার সংস্কৃতির যে মহান ঐতিহ্যের সৃষ্টি করে গেছেন তাকে আমাদের চোখের মণির মত সর্বদা রক্ষা করে যেতে হবে। এ আমাদের সুস্পষ্ট কর্তব্য, এ আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। এ বিষয়ে হেলাফেলা করার কোন অবকাশ নেই।

একদিকে যেমন আমাদের শিল্প-সাহিত্যের আঙিনা থেকে অপসংস্কৃতির আগাছা দূর করবার জন্য সকল শক্তি নিয়োগ করতে হবে, তেমনি অন্যদিকে জাতির সুস্থ ঐতিহ্যকে রক্ষা ও সম্প্রসারিত করবার জন্যও আমাদের সমান যত্নশীল হতে হবে। একদিকে আবর্জনার স্তূপরাশি দূর করা, অপরদিকে শিল্পসাহিত্যের গঠনমূলক সৃষ্টির কাজে তৎপর থাকা—এই দুই দণ্ডের উপর এককালীন ভর দিয়ে আমাদের চলতে হবে। মনে রাখতে হবে কেবলমাত্র অপসংস্কৃতি রোধের কথা বলা নেতিবাদের চর্চা, তাতেই সমস্ত মনোযোগ নিঃশেষ করে দিলে চলবে না,

সংস্কৃতির গঠনমূলক বা রচনাত্মক কর্মতৎপরতারও পরিপূর্ণ বিকাশ আবশ্যক। অপসংস্কৃতির লক্ষণগুলি চিনিয়ে দেবার কাজে যেমন আমরা সদাসক্রিয় থাকব তেমনি সুস্থ সংস্কৃতি কাকে বলে, কী হলে সুস্থ সংস্কৃতি হয়, দৃষ্টান্ত প্রয়োগের সাহায্যে তার স্বরূপ নির্ণয়েও আমরা এতটুকু শৈথিল্য প্রদর্শন করব না। অপসংস্কৃতির নিরোধ এবং সুস্থ সংস্কৃতির গৌরব রক্ষা—এই দ্বিবিধ কাজ অবশ্যই একযোগে চলা আবশ্যক।

মুখ্যমন্ত্রীর সংস্কৃতি-সংক্রান্ত বিবৃতিটিকে এই দৃষ্টিতে দেখলেই তাকে ঠিক দৃষ্টিতে দেখা হবে।

॥ ২ ॥

অপসংস্কৃতির সমস্যার মূল একটা দিক নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন তার অন্য একটা দিকের উপরে মনোযোগ নিবদ্ধ করতে চাই।

আমাদের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁরা বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের আদর্শে বিশ্বাস করেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এই রকমের একটা মত প্রচার করেন যে, অপসংস্কৃতি পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এক অবাঞ্ছিত ঘটনা, যতদিন পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থা থাকবে ততদিন সমাজে অপসংস্কৃতির কলুষও থাকবে, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে আমরা যতই আপসহীন অভিযান পরিচালনা করি না কেন, সমাজে পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকা পর্যন্ত শিল্প ও সাহিত্যের আঙিনা থেকে অপসংস্কৃতির জড় নিশ্চিহ্ন হওয়ার কোন আশা নেই। সুতরাং সমাজ-কাঠামো থেকে অপসংস্কৃতির শিকড় গোড়াশুদ্ধ উপড়াতে হলে আগে পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থা ধ্বংস করা দরকার। একবার পুঁজিবাদকে ধ্বংস করে তার জায়গায় স্থায়ী ভিত্তিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার আর প্রয়োজন হবে না, অপসংস্কৃতির কুপ্রভাব সমাজ-দেহ থেকে আপনা থেকেই ঝরে পড়বে।

এই মতের প্রবক্তাদের উল্লিখিত-প্রকার যুক্তিক্রম থেকে যে কথাটা বেরিয়ে আসে এবং যা তাঁদের উদ্দিষ্ট বলে মনে হয় তা হল এই যে, বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা ও অর্থনীতির কাঠামোর ভিতর যতদিন আমরা বাস করতে বাধ্য হচ্ছি ততদিন অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা নিরর্থক, সংগ্রাম করলেও তার থেকে প্রার্থিত ফল পাওয়া যাবে না। কারণ পুঁজিবাদ রইল অথচ অপসংস্কৃতি রইল না এ রকম হওয়া সম্ভব নয়—দুইয়ের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক, একটি থাকলে আরেকটি থাকবেই।

অতএব এদের মতানুসারে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনায় শক্তি-ক্ষয় না করে আমাদের আগের কাজ আগে করা দরকার; আমাদের সমস্ত শক্তি ও উদ্যম সংহত হওয়া প্রয়োজন পুঁজিবাদ উচ্ছেদের কর্মে, একবার সে কাজ সমাধা হলে আর অপসংস্কৃতি নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না, এই দৌরাত্ম্য নিজে থেকেই ক্ষয় ও বিলয়প্রাপ্ত হবে। এই মুহূর্তে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে অপসংস্কৃতির প্রতি প্রাপ্যের অতিরিক্ত মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে। এরূপ মনোযোগ অন্যত্র ন্যস্ত হওয়া উচিত।

পুঁজিবাদের বিলোপ এবং পুঁজিবাদের বিলোপ সাধন করে তার জায়গায় সমাজতন্ত্রকে স্থাপিত করার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মতভেদের কোন অবকাশই থাকতে পারে না। অন্তত: প্রগতিশীলতার আদর্শে যাঁরা স্থিতপ্রত্যয় এবং সমাজপ্রগতিকে ত্বরান্বিত করবার জন্য যাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন তাঁদের বেলায় এই লক্ষ্যকে একটি সর্ববাদীসম্মত লক্ষ্য গণ্য করা যেতে পারে। পুঁজিবাদের সমাধিভূমির উপর সমাজবাদের সর্বাত্মক প্রতিষ্ঠা কে না চায়? তা বলে সর্বাঙ্গীণ সমাজবাদ বা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কোনরকম জনহিতকর কাজই করা চলবে না এ কেমন কথা? একটা অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতে বাঞ্ছিত লক্ষ্য আমাদের হাতের মুঠোয় এসে ধরা দেবে বলে নিশ্চিত বর্তমানের করণীয় কাজ ফেলে রেখে হাত গুটিয়ে বসে থাকা কোন সুযুক্তি নয়। কেন নয় তা একটু বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে অভিযান নিছক একটি নেতিবাদী অভিযান নয়, তার একটি গঠনমূলক দিকও আছে। তার নঞর্থক ও সদর্থক দুটি বাহুই সমান সক্রিয়, দুইয়ে মিলে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে অভিযানের বৃত্ত পূর্ণ। একদিকে সর্বপ্রকার সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও তিমিরান্ধতার বিরুদ্ধে যেমন ক্ষমাহীন অভিযান পরিচালনার প্রয়োজন আছে, তেমনি প্রয়োজন সুস্থ সংস্কৃতির আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বিরামবিহীন প্রচেষ্টা ও তৎপক্ষে বিধিবদ্ধ আন্দোলন। এই দুই কাজ পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে চলবে। নিষেধ ও প্রতিষেধ, কারণ ও তারণ, নাস্তি ও অস্তির সংগ্রাম পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠরূপে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ সমাজের অঙ্গন থেকে অপসংস্কৃতির আবর্জনা দূর করার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতির আরোগ্য উপাদানকে আবাহন করে আনবার জন্যও ব্যাপক প্রস্তুতি চাই। অপসংস্কৃতির জঞ্জালময় ভস্মরাশি দূর করলেই হবে না, সুসংস্কৃতির মশালটিকেও তেজের সঙ্গে জ্বালিয়ে রাখা আবশ্যক। তা যদি হয় তাহলে অপসংস্কৃতিবিরোধী জেহাদ পরিচালনায় আপত্তি বা বাধা

কোথায় ? যখনই আমরা অপসংস্কৃতিকে পর্যুদস্ত করবার অবশ্য প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিচ্ছি তখনই আমরা কি একই কালে সুস্থ সংস্কৃতির অনুকূলেও আমাদের সুদৃঢ় বক্তব্য রাখছি না ? আর পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে কি অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামও অঙ্গাঙ্গী যুক্ত নয় ? দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সংগ্রাম সমন্বিত না হলে কি কখনও আর্থ-রাজনৈতিক সংগ্রাম পূর্ণতা পায় ? দেশের রাজনীতি বা অর্থনীতি তো দেশের বৃহত্তর সমাজ-প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়, তা দেশের সামগ্রিক ঘটনা-পরম্পরার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট আর এই ঘটনা-পরম্পরার একটি মূল অঙ্গ হল দেশের সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে রাজনীতি-অর্থনীতির একেবারে নাড়ির যোগ। অর্থনীতিকে যদি বলা যায় সমাজ সৌধের বুনিয়াদ তো শিল্প-সাহিত্য হল সেই সমাজ-সৌধের উপরিতল। ভিত্তি আর উপরিতলের মধ্যে গভীর সম্বন্ধ। এরূপ ক্ষেত্রে, রাজনীতি আর অর্থনীতির স্তরে সংগ্রাম চালাব আর সংস্কৃতির স্তরে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকব—এমন কথা বলার কি কোন মানে হয় ? সমাজবাদের সংগ্রাম আর সুস্থ সংস্কৃতির সংগ্রাম আমাদের পাশাপাশি সমান জোরের সঙ্গে চালিয়ে যেতে হবে। তবেই না সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার কাজ আরও বেশী ত্বরান্বিত হবে, আরও বেশী সুচারুভাবে সম্পন্ন হবে ?

আগে ভাবের জোয়ার, পরে কাজের জোয়ার। উপযুক্ত চেতনার বিকাশের মধ্য দিয়ে প্রয়োজনীয় ভাবের জমি তৈরী হলে তবেই শুধু কাজের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে পারে, নচেৎ নয়। ভাবকে খাটো করে কাজকে অগ্রপ্রাধান্য দিলে ঘোড়ার আগে গাড়ি জোতার ভুল করা হয়। আর এ কথা তো ঠিক যে ভাবের জমি তৈরি করবার প্রয়াসেরই আরেক নাম হল সংস্কৃতির আন্দোলন। সংস্কৃতির আন্দোলনের প্রয়োজন হয় চেতনার বিকাশের জন্য আর চেতনার বিকাশের প্রয়োজন হয় রাজনীতি ও অর্থনীতির আন্দোলনকে সঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। চেতনার মান উন্নত না হলে আমরা কোন্ হাতিয়ারের সাহায্যে আর্থ-রাজনীতির সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবো ?

এ কথা অবশ্য ঠিক যে, রাজনীতি-অর্থনীতি সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে, আবার এও সমান সত্য যে, সংস্কৃতিও তুল্যরূপে রাজনীতি-অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে। খতিয়ে দেখলে, এগিয়ে থাকার ক্ষেত্রে সংস্কৃতিরই জিৎ। আগে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের ফলে উপযুক্ত ভাবের পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়, সেই উপযুক্ত মানস পরিবেশের সুযোগে ও তার হাত ধরে আর্থ-রাজনীতিক কর্মতৎপরতার

পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাতে নতুন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ স্থগিত বা উহ্য রেখে কেবলমাত্র রাজনীতি আর অর্থনীতির আন্দোলন চালালে তা কোন সময়েই আশানুরূপ জোরালো কিংবা ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারে না। আর্থ-রাজনীতির আয়োজনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে হলে সংস্কৃতিকে তার সাথী করে নেওয়া চাই-ই চাই।

ইতিহাস থেকেও এমনতর সাথিত্বের নজির দেখানো চলে। ফরাসী বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার আগে তার উপযুক্ত অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিজীবী লেখকগণ। রুশো, ভলতেয়ার এবং ফরাসী কোষগ্রন্থ প্রণয়নে ভলতেয়ারের সহযোগী লেখকবৃন্দ, যথা হলবাক, দিদেরো, দ্য আমবার্ট প্রমুখ এনসাইক্লোপীডিস্টগণ, মন্টেস্কু ও কুয়েসনে প্রমুখ সাংবিধানিক ও অর্থনীতিক পণ্ডিতবর্গ—এঁরা এবং এঁদের সমশ্রেণীর লেখকেরা তাঁদের রচনাবলীর মাধ্যমে আগে উপযুক্ত ভাবের মৃত্তিকা তৈরি করেছিলেন বলেই না তাতে বিপ্লবের বীজ রোপিত হতে পেরেছিল এবং বিপ্লব পরে মুঞ্জরিত হয়ে উঠেছিল। রুশ বিপ্লবের একটি প্রধান উদ্দীপক শক্তিই হলো বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার ক্ষমতাশালী লেখকবৃন্দের রচনাবলী। পুশকিন, লার্মণ্টভ, গোগোল থেকে শুরু করে টুর্গেনিভ, ডস্টয়েভস্কি টলস্টয়, শেখভ, গর্কি প্রমুখ কবি, কথাসাহিত্যিক ও নাট্যকারগণ এবং বেলিনস্কি, চার্নিশেভস্কি, ডোব্রলুভ প্রমুখ সমালোচকবৃন্দ উনিশ শতকে ও বিশ শতকের গোড়ায় অনাগত বিপ্লবের সম্ভাবনাকে উপযুক্ত শিল্পসৃষ্টি ও মননের সাহায্যে বিধিমত পরিচর্যা করেছিলেন বলেই বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষ ভাগে সেই বিপ্লব বাস্তবে রূপায়িত হয়ে উঠতে পেরেছিল। অবশ্য প্লেখানভ, বুখারিন, লেনিন, ট্রটস্কি, স্টালিন প্রমুখ রাজনীতিজ্ঞ লেখকদের প্রভাব তো ছিলই, সেটা প্রায় স্বভাব-সিদ্ধ ধরে নেওয়া যায়, কিন্তু সেই সঙ্গে সাহিত্যিক আর সমালোচক-দের রচনাও যথেষ্ট পরিমাণে যুক্ত হয়েছিল বিপ্লবকে বাস্তবায়িত করবার কাজে। সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি এই ত্রিমুখী অভিযানেরই সম্মিলিত ফলের নাম রুশ বিপ্লব।

চীনের ইতিহাস থেকেও একই রকম দৃষ্টান্ত পাই। চীনের কম্যুনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছিল ১৯২১ সালে। তার আগে তারই সহায়ক ভাবের প্রস্তুতিরূপে লু সুনের নেতৃত্বে ১৯১৯ সালে এক প্রবল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনা হয়, যা চীনের শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে "৪ঠা মের আন্দোলন" রূপে পরিচিত। লু সুন এবং তাঁর সহযোগী লেখকবৃন্দ—যাঁদের মধ্যে তরুণদের একটা লক্ষণীয় সংখ্যাধিক্য ছিল—তাঁদের সমগ্র শক্তি ও অভিনিবেশ নিয়ে এই আন্দোলনে

ঝাঁপিয়ে পড়েন। এক দিকে চলে প্রতিক্রিয়াশীল তথা অবক্ষয়ী সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে আপসহীন জেহাদ, অন্যদিকে চলে সমাজ বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন নতুন সৃষ্টির সমারোহ। মাও-সে-তুঙ তখন যুবক ও মূলতঃ রাজনৈতিক কর্মী, তিনিও এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন ও লু স্যুনের হাতকে শক্ত করে তোলেন।

তার অর্থ, চীনের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক আন্দোলন পরস্পরের সঙ্গে যোগ রেখে অগ্রসর হতে থাকে এবং এই প্রক্রিয়া বিপ্লবের পরেও সমানভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে। তা যদি না হত তো ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে মাওয়ের নেতৃত্বে আবার নতুন করে "সাংস্কৃতিক বিপ্লব"-এর ডাক শোনা যেত না। চীনের নেতৃবর্গ ১৯৪৯ সালে ঘরে বাইরে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উচ্ছেদ সাধন করে যে মহান রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত করেছিলেন তাকেই আরও সম্পূর্ণতা দানের জন্য ১৯৬৫ সালের শেষাশেষি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূত্রপাত করেছিলেন : দুই বিপ্লবের মধ্যে যোগসূত্র নিবিড়। একটিকে ছেড়ে আরেকটি পূর্ণতা পায় না।

ঠিক এই পরিপ্রেক্ষিতটি মনে রাখলে কেন রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশে পাশে সাংস্কৃতিক আন্দোলন চালানো দরকার, জোরের সঙ্গে চালানো দরকার, সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। উপরে কয়েকটি দেশের বিপ্লবের ইতিহাস থেকে যে নজির উদ্ধৃত করে দেখানো হয়েছে তা এই সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে যে, রাজনৈতিক বিপ্লবের সম্পূর্ণতা বিধানের জন্যই সাংস্কৃতিক প্রগতির অভিযান দুর্বার বেগে চালিয়ে যাওয়া দরকার। কবে কোন এক অনির্দেশ্য ভবিষ্যতে দেশে বিপ্লব আসবে আর সেই কারণে আপাতত সব সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা বন্ধ রাখতে হবে এটা কোন কাজের কথা নয়। বরং পুঁজিবাদকে নির্মূল করে সমাজতন্ত্রের সার্বিক প্রতিষ্ঠার জন্যই অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে অভিযান তথা সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষে গঠনমূলক কার্যধারাকে আরও বেশী মজবুত করে তোলা আবশ্যক।

অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম আপাতদৃষ্টিতে নেতিবাদী বলে মনে হলেও তা আসলে পুঁজিবাদ উচ্ছেদ আর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষেই সংগ্রাম। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগে ও পরে এই দুই দফাতেই অপসংস্কৃতি বিরোধী সংগ্রাম পরিচালনার প্রয়োজন আছে। কেননা অপসংস্কৃতির জড় সহজে মরতে চায় না, সামন্তবাদ আর পুঁজিবাদের অবশেষ রূপে তা সমাজের কোণে কোণে ঘাপটি মেরে বসে থেকে জনসাধারণকে বিপথে চালিত করতে চায়। একথা যে কতদূর সত্য তা চীনের 'কালচারাল রেভ্যুলেশন'-এর উদাহরণ থেকেই আমরা বুঝতে পেরেছি। বিপ্লবের পরেই যদি এমনতর আন্দোলনের প্রয়োজন

হয় তো বিপ্লবের আগে যে তা আরও কত বেশী প্রয়োজন সে কথা সহজেই উপলব্ধি করা চলে।

অপসংস্কৃতির সমস্যাকে নিছক শিল্প সাহিত্যের সমস্যারূপে না দেখে তাকে বৃহত্তর সমাজজীবনের সমস্যারূপে দেখলেই তাকে ঠিকভাবে দেখা হয়। এই বৃহত্তর সমাজজীবনের মধ্যে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি সব কিছুই পড়ে। এই দৃষ্টিতে দেখলে আর অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলনকে নিছক নেতিবাদী আন্দোলন বলে মনে হবে না, তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আর রচনাত্মক জরুরী এক কার্যক্রম বলে মনে হবে। আমাদের সকলের সেইভাবেই ভাবিত হওয়া দরকার।

॥ ৩ ॥

অপসংস্কৃতির সমস্যার সমাধান কেন জরুরী, কেন এই সমাধান অনিশ্চিত কালের অপেক্ষায় ফেলে রাখা যায় না, সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিশদভাবেই আলোচনা করলাম। এবারে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতটি মনে রেখে অপসংস্কৃতির প্রসঙ্গের আলোচনা করব।

বাংলা সাহিত্যে অপসংস্কৃতির সমস্যা যে আজই প্রথম আত্মপ্রকাশ করল তা নয়। সুস্থ ও সৎ সংস্কৃতির ধারাবাহিকতার পাশে পাশে অপসংস্কৃতিরও একটা অনেক কালের ধারাবাহিক ক্রম বর্তমান। বলতে গেলে উনবিংশ শতাব্দী থেকেই এই জিনিসটা চলে আসছে। উনিশ শতকে একদিকে আমরা পেয়েছি রামমোহন-বিদ্যাসাগর-মাইকেল- অক্ষয়কুমার- দীনবন্ধু- বিহারীলাল- রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ প্রাণপ্রদ প্রগতিশীল সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐতিহ্য, অন্যদিকে তাঁদের সম্মিলিত শুভবুদ্ধির প্রয়াসকে খর্ব করবার জন্য একই সঙ্গে চলেছে সমান্তরাল একটি ধারার মত অপসংস্কৃতির নানামুখী অশুভ প্রয়াস—কবিয়াল হাফ-আখড়াই আর তর্জা ওয়ালাদের খিস্তি-খেউড়মিশ্রিত কুরুচিপূর্ণ গান, বটতলার কেচ্ছা-সাহিত্য, অশালীন সাংবাদিকতা, রক্ষণশীল বক্তব্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়াপন্থী নাটকের অভিনয় ইত্যাদি। বলাই বাহুল্য যে, এ সমস্ত প্রয়াস কোন সময়েই জয়ী হতে পারেনি; শুভের বিরুদ্ধে অশুভের সংগ্রামে অশুভ শেষ পর্যন্ত সর্বদাই যেমন নির্জিত হয়, আলোর বিরুদ্ধে অন্ধকারের লড়াইয়ে অন্ধকারের পরাজয় যেমন অবশ্যম্ভাবী; এ ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছিল। তাছাড়া এই দুই শক্তি ছিল নিতান্ত অসমান শক্তি, একের সঙ্গে অন্যের কোন তুলনা চলতে পারে না। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-

মধুসূদন-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ দিক্‌পাল সংস্কৃতিনায়কেরা ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণের ধারক ও বাহক, তাঁরা তাঁদের রচনা ও কর্মের মাধ্যমে বাংলায় নতুন চিন্তার প্লাবন সৃষ্টি করেছিলেন ; কতকগুলি অপটু খণ্ডিত জনগণের সমর্থন বঞ্চিত অপসংস্কৃতিমূলক চেষ্টার বালির বাঁধ দ্বারা কি সেই বন্যাপ্লাবনকে রোধ করা যায় ? নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই জোয়ারের মুখে কুটোর মত ওইসব অপচেষ্টা ভেসে যায়— আমরা উনিশ শতকের এক সুমহান ঐতিহ্যকে আমাদের গৌরবজনক উত্তরাধিকার স্বরূপ লাভ করে বিশ শতকের দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হই।

একথা অবশ্য অস্বীকার করব না যে, কবিগান, তর্জা প্রভৃতির এবং বটতলার বই-এর একটা লোকশিক্ষার দিক আছে, যে-ভূমিকা এগুলির দ্বারা কখনও কখনও সার্থকভাবে পালিত হয়েছে। কবিগান এবং কবিগানের স্বগোত্র যাত্রাপালা, পাঁচালী, কথকতা, রামায়ণ গান, কৃষ্ণকীর্তন, চপকীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠান দেশের গ্রামাঞ্চলের মানুষদের কাছে পৌঁছানোর যে একটা বিশেষ ফলপ্রদ মাধ্যম ছিল সেকথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু লোকশিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি যদি সমপরিমাণে সুরুচিরও বাহক হত তাহলে বলবার কিছু থাকত না। দুঃখের বিষয়, সেই প্রত্যাশিত কাজটিই এসবের দ্বারা প্রায়শঃ অকৃত থেকেছে। কবিয়াল ও পাঁচালীকারদের রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণাদি থেকে উদাহরণ সহযোগে গীতপরিবেষণ নিশ্চিত জনশিক্ষার পরিধি বিস্তারে সহায়তা করেছে ; কিন্তু পৃষ্ঠপোষক ধনী জমিদারদের মনোরঞ্জনের জন্য অথবা সমাজের তদানীন্তন অবক্ষয়ী পরিবেশের প্রভাবে তারা যখন জেনে-শুনে গানের আসরে "উতোর-চাপান"-এর আমদানী করতে লাগল, তখন সমস্ত ব্যাপারটাই নিতান্ত বিসদৃশ হয়ে দাঁড়াল। খিস্তি-খেউড় এই জাতীয় অনুষ্ঠানের একটা প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠল। এতে করে সাময়িক হলেও জনগণের কত যে ক্ষতি হয়েছে তা বলে শেষ করা যায় না।

কবিগান পাঁচালী ইত্যাদি সম্বন্ধে যে-কথা বটতলার সাহিত্য সম্বন্ধেও সেই কথা। প্রাচীন উত্তর কলকাতার গরানহাটা, আহিরীটোলা, শোভাবাজার প্রভৃতি অঞ্চলের চৌহদ্দির দ্বারা গণ্ডিকৃত মোটামুটি এক ছড়ানো এলাকায় যাকে আজ আমরা "বটতলার বই" বলি, সেই জাতীয় সাহিত্যের এক কলাও ব্যবসা জমে উঠেছিল আজ থেকে সোয়াশো-দেড়শো বছর আগে। এইসব বইয়ের মুদ্রণের আয়োজন ছিল সেকেলে ধরনের। কাঠের ব্লক দিয়ে এগুলিতে চিত্রণের কাজ সারা হত। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই ইত্যাদি ছিল নিতান্ত অপরিচ্ছন্ন ধাঁচের। কিন্তু যেহেতু বটতলার বই অত্যন্ত

সত্তার প্রচার করা হত, দরিদ্র গ্রামবাসীর সীমাবদ্ধ ক্রয়ক্ষমতার সুযোগে তাদের ব্যাপক চাহিদা আপনা-আপনিই তৈরি হয়ে যেত। বটতলার প্রকাশকগণ যেখানে নিতান্ত সুলভ মূল্যে প্রাচীন রামায়ণ-মহাভারত-অষ্টাদশ পুরাণ, গীতা চণ্ডী সমেত বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ (কথাটা শর্তাধীনে গ্রহণ করতে হবে ; মনুসংহিতা অথবা বাঙালী নব্যন্যায়ীদের বিরচিত স্মৃতি গ্রন্থগুলি মানুষের জ্ঞানের দিগন্ত বিস্তার করে না, পরন্তু রক্ষণশীলতারই পোষকতা করে—লেখক।), মঙ্গলকাব্য লৌকিক ব্রতকথা ইত্যাদির প্রচারে সহায়তা করেছে, সেখানে তাঁদের প্রচেষ্টাকে বৃহত্তর সংস্কৃতির অর্থে আমরা লোকশিক্ষার সহায়ক বলতে পারি। কিন্তু সেই সঙ্গে একই কালে তারা যখন কোকশাস্ত্র, ঝাড়ফুঁক তুকতাক করণ-যেচক প্রভৃতি নানাবিধ তান্ত্রিক অভিচারের বই, বড়লোকের ঘরের রঙ্গরস কেচ্ছা কাহিনীর বিবরণ সম্বলিত বই প্রকাশের ঢল বইয়ে দিতে থাকে তখন তাদের লোকশিক্ষকতার ভূমিকাটি সম্পূর্ণ কাঁচিয়ে যায়—তারা সুস্পষ্ট অপসংস্কৃতির প্রচারক রূপে চিহ্নিত হয়।

জনসাধারণকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। তারা হাতের কাছে যা পায় তাকেই নির্বিচারে গ্রহণ করে। ভাল জিনিস না পেলে যা ভাল নয় তাই দিয়েই জানবার ক্ষুধা মেটাবার চেষ্টা করে। গ্রামের অল্প-লেখাপড়া জানা মানুষ, লোকশিক্ষার বিভিন্ন বাহনগুলির মাধ্যমে উপকার যতটুকু লাভ করবার তা নিশ্চয়ই লাভ করেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অপকারও তাদের কম হয়নি। অমৃত সেবন করতে গিয়ে অনেকটা বিষও তাদের গলাধঃকরণ করতে হয়েছে। লোকশিক্ষার উপকরণগুলি থেকে আবর্জনার অংশ দূর করে তাকে পরিস্কৃতরূপে পরিবেশন করার দায় আজকের সংস্কৃতি কর্মীদের নিতে হবে। ওই কাজটি উনিশ শতকে উপেক্ষিত থেকেছে—সে সময় সেটা সম্ভব ছিল না—বিশ শতকেরও বহুকাল এ সম্বন্ধে কেউ মন দেয়নি, এখন আর বিষয়টিকে ফেলে রাখার কোন যুক্তি নেই। লোকশিক্ষার বাহনগুলিকে অপসংস্কৃতিমুক্ত করবার দায়িত্বটি আমাদের সকলকেই ভাগ করে বহন করতে হবে।

•

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক কাল বাংলার সংস্কৃতি ও সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র প্রমুখ দিক্‌পাল লেখকদের প্রভাব সর্বাতিশায়ী হয়ে দেখা দিয়েছিল। ফলে ওই পর্বে অপসংস্কৃতির প্রভাব কোন সময়েই তেমন জোরদার হয়ে উঠতে পারেনি। অন্তত গ্রামজীবনে যাই হোক, নাগরিক সাহিত্যের এলাকায় অবক্ষয়ী সংস্কৃতির প্রচারকদের জনমনে কোন

রেখাপাত করা সম্ভব হয়নি। পরিশুদ্ধ সংস্কৃতির প্রতীকরূপে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তখন একাই সপ্তসূর্যের আলো নিয়ে বাংলার আকাশ পরিব্যাপ্ত করে ছিলেন, সুতরাং সাধ্য কি সে সময়ে অপসংস্কৃতির আগাছা বাংলার মাটি ফুঁড়ে রোদের আলোয় বেরিয়ে আসবে! তখন ওই জাতীয় রচনার মুখ লুকোবার জায়গা ছিল না, অন্ধকার বিবরেও সেসবের ঠাঁই ছিল না। সত্যি বটে গত শতাব্দীতে যেমন রামমোহন-বিদ্যাসাগর-ডিরোজিয়ান ও ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবর্গের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টাকে ব্যঙ্গ করে অপসংস্কৃতির ধ্বজাধারীরা খিস্তি-খেউড়ের গান বাঁধতে ক্লান্তি অনুভব করেনি, তেমনি এই কালেও রবীন্দ্রনাথের অগ্রসর চিন্তা-চেতনাকে অশ্রদ্ধেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য সমাজের রক্ষণশীল মহলের মানুষদের একাংশের চেষ্টার বিরাম ছিল না। কিন্তু প্রতিক্রিয়ার কতটুকু শক্তি যে প্রগতির বাঁধভাঙা উচ্ছল জলতরঙ্গকে ঠেকাবে? ফলে উনিশ শতকের প্রতিক্রিয়াপন্থীদের যে হাল হয়েছিল বিশ শতকের প্রতিক্রিয়াপন্থীদের সেই একই হাল হল—তাদের বাধাদান প্রয়াস বানের মুখে খড়কুটোর মত ভেসে গেল।

বিশ শতকের তৃতীয় দশক অর্থাৎ বিশ থেকে তিরিশের বৎসরগুলির মধ্যে অবস্থা কিন্তু আর পূর্ববৎ রইল না। এই কালে আবার পুরাতন রোগ নতুন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। যে ব্যাধি ছিল অনেক কাল চাপা তা দেহের মধ্যে অনুকূল ক্ষেত্র পেয়ে পুনরায় চাঙ্গা হয়ে উঠল।

বিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে কতকগুলি নব্যপন্থী আধুনিকতাগর্বী পত্র-পত্রিকার আবির্ভাব ঘটল যেগুলি প্রগতির আবরণে মনে হয় পুরাতন দিনের বাতিল রুচিবিকারকেই আবার ফিরিয়ে আনতে চাইল। কল্লোল এই পত্রিকা-গুলির মধ্যে ছিল মুখ্য, তার সহযাত্রী ছিল কালি-কলম, ধূপছায়া, প্রগতি প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ছোটখাট পত্রিকা। এইসব পত্রিকা গোষ্ঠীতে একাধিক শক্তিশালী তরুণ লেখকের সমাবেশ হয়েছিল তবে তখনকার সময়ের প্রবহমাণ পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের আদর্শের প্রতি আত্যন্তিক অনুকরণাত্মক মোহবশতঃ তাঁরা যেন ইচ্ছা করেই আমাদের সমাজের দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত শ্রদ্ধেয় মূল্য-বোধগুলিকে তাঁদের লেখায় উড়িয়ে দিতে চাইলেন এবং সেসবের জায়গায় এক ধরনের মানসিকতাকে প্রতিষ্ঠা দিতে চাইলেন, এদেশের মাটিতে যার কোন শিকড় নেই এবং নিছক বিজাতীয়তা যার অবলম্বন। পশ্চিমের পুঁজিবাদী সমাজের আশ্রয়ে লালিত অনিয়ন্ত্রিত ভোগবাদ, আত্মসুখ আর দায়িত্বহীন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে এইসব লেখক বিশেষ মূল্য দিতে এগিয়ে এলেন তাঁদের সাহিত্যসৃষ্টির

বিবিধ প্রকরণের মধ্যে এবং এর ফলে যা অনিবার্য তা-ই ঘটল। নরনারীর অবাধ মুক্তির নামে অশ্লীলতার চূড়ান্ত করে ছাড়া হল এবং দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের সুখদুঃখের কথা চিন্তা না করে কেবল ব্যক্তিমুক্তির আদর্শেরই জয় গাওয়া হতে লাগল। সমষ্টির চেতনা উপেক্ষিত থাকল, শহরের চার দেয়ালের সীমায় আবদ্ধ নাগরিক সাহিত্যের প্রচার চলতে লাগল। কল্লোলীয় সাহিত্যিকদের রচনায় স্বাধীনতার সংগ্রামের কোন কথা নেই, বিপ্লবের কোন বার্তা নেই; শুধু একটানা বয়ে চলেছে দেহবাদের আরতি ও আত্মরতি।

কল্লোল-গোষ্ঠী থেকে দাবি করা হয় যে, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁদের শিবিরের অন্তর্গত ছিলেন এবং জাতীয় ভাবোদ্দীপক রচনার ক্ষেত্রে নজরুলের সৃষ্টি একাই একশোর সমতুল ছিল। এই দাবির শেষাংশ ঠিক, কিন্তু প্রথমাংশ ঠিক নয়। নজরুল কল্লোল-গোষ্ঠীর কেউ ছিলেন না —না দৃষ্টিভঙ্গিতে, না আত্মিক প্রেরণায়। তিনি তাঁর বিচিত্র ঘূর্ণিঝড়ের মত উদ্দাম ভ্রাম্যমাণ জীবনের এক মোড়-ফেরতার কালে কিছুদিনের জন্য কল্লোলের আসরে "মানস সরোবরে যাযাবর হংসের মত" উড়ে এসে পড়েছিলেন মাত্র। বাংলা কাব্যে সাম্যবাদের উদ্গাতা এই অসীম প্রতিভাবান কবির গাঁই-গোত্র সম্পূর্ণ আলাদা। কল্লোলীয়দের নজরুলকে নিজেদের বলে দাবী করার আত্মঘোষণ পরীক্ষার ধোপে মোটেই টেকে না।

এ কথা অবশ্য অস্বীকার করব না যে, জগদীশ গুপ্ত, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমারের কিছু কিছু লেখায় সমাজের নিপীড়িত শ্রেণীর মানুষের দুঃখ-বেদনার চিত্র পাওয়া যায়, বিশেষ, শৈলজানন্দের গল্পোপন্যাসে বিহার-বাংলার সীমান্তস্থিত খনি-এলাকার কুলী-কামিনদের জীবন ও জীবিকার সমস্যা দৃষ্টিগ্রাহ্য মর্যাদা পাওয়ায় বাংলা কথা সাহিত্যের দিগন্ত বিস্তৃত হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। কিন্তু তাঁরা এসব রচনা যত না প্রত্যয়চালিত হয়ে লিখেছেন তার চেয়ে বেশী লিখেছেন, সাময়িক তাগিদের বশে। 'ফ্যাসান' কথাটা কটু শোনায় তাই 'সাময়িক তাগিদের' জায়গায় ফ্যাসান কথাটা না-হয় না-ই ব্যবহার করলাম। প্রত্যয়ের কথায় বলি, তাঁদের ওই জাতীয় রচনা প্রণয়নের পশ্চাতে প্রত্যয়ের যদি-বা কোন ভূমিকা থেকে থাকে, বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ অনুমোদিত শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্বের কোন ভূমিকা তাতে ছিল না, সে কথা নিশ্চিত। শৈলজানন্দ রচিত খনি-সাহিত্য কিংবা প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথমা কাব্যের অন্তর্গত হুইটম্যানীয় ছন্দের কবিতানিচয় নিছকই মানবতাবাদের অভিব্যক্তি মাত্র।

কল্লোল-কালিকলম-প্রগতির লেখকেরা বাংলা সাহিত্যের উপকার যা করেছেন তার চেয়ে ক্ষতি করেছেন বেশী। তাঁরাই প্রথম বিশ শতকের পরিমণ্ডলের মধ্যে লেখনী চালনা করতে গিয়ে একটা বিধিবদ্ধ পরিকল্পনার অংশ হিসাবে সজ্ঞানে, সচেতনে অপসংস্কৃতির অভিযান পরিচালনা করলেন বাংলা সাহিত্যের আঙিনায়। নরনারীর যৌনমুক্তির পোষকতা করতে গিয়ে তাঁরা স্বেচ্ছাচারমূলক সাহিত্যের ঘোলাজলের বন্ধ্যাকপাট উন্মুক্ত করে দিলেন তাঁদের গল্পোপন্যাসের পাতায়। অশ্লীলতার হদ্দ করে ছাড়া হল কৌতুহলী ঘটনার দৃশ্যবর্ণনায়। বুদ্ধদেব বসুর 'এরা ওরা এবং আরো অনেকে', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'বিবাহের চেয়ে বড়' এবং 'প্রাচীর ও প্রান্তর' এবং প্রবোধকুমার সান্যালের কিছু রচনা অশ্লীলতার দায়ে লালবাজারের নিষেধবিধির আওতায় এল এবং প্রত্যাশিত শাসনে শাসিত হলো।

আমরা অবশ্য সাহিত্যে পুলিশী নিয়ন্ত্রণের নীতি সমর্থন করি না, কিন্তু সমাজে এমন অবস্থার কখনও কখনও উদয় হয় যখন বৃহত্তর জনগণের নৈতিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজনেই অপ্রিয় কর্তব্য হলেও কিছু একটা করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। যে সময়ের কথা বলছি সে সময়ে এই রকমেরই একটা সংকট-পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল বলে সন্দেহ হয়। অশ্লীল ও অবক্ষয়মূলক সাহিত্যের বিরুদ্ধে জনমত উত্তরোত্তর প্রবল ও সোচ্চার হয়ে উঠল। শুধু যে তদানীন্তন পাবলিক প্রসিকিউটর তারকনাথ সাধু, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট যতীন্দ্রমোহন সিংহ, 'শনিবারের চিঠির' সম্পাদক সজনীকান্ত দাস ও তাঁর সহযোগিবৃন্দ, কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার, ব্রাহ্ম নেতা অমলচন্দ্র হোম প্রমুখ কম-বেশী রক্ষণশীল ঘরানার সমালোচকগণ সাহিত্যের আত্যন্তিক স্বেচ্ছাচারকে প্রকাশ্যে ধিক্কার জানালেন তা-ই নয়, জনজীবনের সঙ্গে অসংশ্লিষ্ট সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত সাহিত্যানুরাগী পাঠকেরাও এই জাতীয় সাহিত্যের উদগ্রতায় নানাভাবে তাঁদের বিরক্তি প্রকাশ করতে থাকলেন।

শেষে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের টনক নড়ল। তিনি ১৯৩৪ সালের শ্রাবণ সংখ্যা বিচিত্রায় 'সাহিত্যধর্ম' শীর্ষক এক প্রবন্ধে তরুণ লেখকদের বাড়াবাড়ির সমালোচনা করে স্নেহমিশ্রিত ভর্ৎসনা-বাক্য উচ্চারণ করলেন। কবির এই মৃদু সমালোচনাও তরুণপক্ষীয়দের সহ্য হল না। তাঁদের পক্ষে লেখনী ধারণ করতে এগিয়ে এলেন প্রবীণ ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, যাঁর তরুণদের প্রতি পক্ষপাত ছিল সুবিদিত। ভাদ্র সংখ্যা বিচিত্রায় 'সাহিত্যধর্মের সীমানা' নামক এক প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথকে কঠোর ভাবে আক্রমণ করলেন। পরের মাসে সুদীর্ঘ এক প্রবন্ধে কবির বক্তব্যের সমর্থনে লেখনী চালনা করলেন দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ

বাগটী। অবশেষে ওই বৎসরেরই আশ্বিন সংখ্যা 'বঙ্গবাণী'র এক প্রবন্ধে ('সাহিত্যের রীতি ও নীতি') শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তরুণপন্থীদের সমর্থনে কবিকে নির্মমভাবে আক্রমণ করে বসলেন।

মামলা কতদূর গড়াত বলা যায় না কিন্তু শরৎচন্দ্রই সমগ্র ব্যাপারটির ফয়সালা করে দিলেন। বিতর্কের নিষ্পত্তিতে তাঁর সত্যনিষ্ঠা ও অকপটতার অসংশয় প্রমাণ পাওয়া গেল। শরৎচন্দ্র যে সময়ে তরুণদের পক্ষাবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছিলেন সে সময়ে তিনি তরুণদের লেখাপত্র তেমন মন দিয়ে পড়েননি, তরুণদের হয়ে কবির বক্তব্যের জোরালো প্রত্যুত্তর দিতে হবে মনে করেই প্রত্যুত্তরমূলক ওই তীব্র আক্রমণাত্মক প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। পরে বন্ধুদের কথায় এক বৎসর তিনি সমনোযোগে তরুণ লেখকদের তাবৎ রচনাদি পড়েন এবং পড়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, কবির 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধের বক্তব্যে যথেষ্ট সারবত্তা ছিল, কবি অকারণে তরুণদের সমালোচনা করেননি। এই উপলব্ধি মনে প্রতীত হতেই শরৎচন্দ্র তাঁর এক জন্মদিনের অভিনন্দন উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণে প্রকাশ্যে স্বীকার করলেন যে, তাঁর ভুল হয়েছিল, তরুণদের সাহিত্য সৃষ্টিতে স্বেচ্ছাচারের আধিক্য নিয়ে কবি যে অভিযোগ করেছিলেন তা সঙ্গত অভিযোগই ছিল, নতুন লেখকেরা সত্যিই বড় বাড়াবাড়ি করছিল।

শরৎচন্দ্র প্রকাশ্যে ভুল স্বীকারেই ক্ষান্ত হলেন না, নয়া লেখকদের উদ্দেশ করে তাঁদের ভর্ৎসনাও করলেন। বললেন, "বহুদিন সাহিত্যচর্চা করে যা ভাল বুঝেছি তার থেকেই বলছি, সংযত হওয়া দরকার। তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ—একটু আধটু করেছ তা নয়, অনেকখানি করেছ।" সেক্স ছাড়া নয়া লেখকেরা কি আর বিষয় খুঁজে পায় না? এই তো পরাধীনতা-রূপ বিরাট সমস্যা দেশের সামনে রয়েছে, রয়েছে দুঃখ দারিদ্র্য ক্ষুধা ও বঞ্চনার সমস্যা, কই, সে বিষয়ে তারা কলম ধরে না কেন? তাদের ধারণা যৌনতার অবাধ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে তারা খুব সাহস দেখাচ্ছে, কিন্তু সাহস এতে নেই, আছে ভীরুতার পরিচয়। পরাধীনতার বিরুদ্ধে লিখলে ইংরেজের জেলে যাবার ভয় আছে, তাই সবাই চুটিয়ে যৌনতার চিত্র আঁকছে। এটা বাস্তবতার চর্চা নয়, বাস্তব-বিমুখতারই নামান্তর।

ঠিক এই ভাষায় শরৎচন্দ্র কথাগুলি বলেননি, আমি শুধু তাঁর বক্তব্যের মর্ম এখানে উদ্ধার করে দিলাম সংক্ষেপকরণের প্রয়োজনে। শরৎচন্দ্রের এই সমালোচনা কি আজকের কোন কোন লেখকগোষ্ঠী সম্বন্ধেও সমান প্রযোজ্য নয়? সেই সব লেখক, যাঁরা বাস্তবতার ভড়ং করে নোংরামির প্রশ্রয় দেন, এদিকে সর্বব্যাপী দুঃখ-

দারিদ্র্যের সমস্যার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এক আঁচড় কালিও খরচ করেন না? এঁরা আসলে অপসংস্কৃতির কারবারী লেখক, কল্লোল-কালিকলম-প্রগতির অশ্লীলতার ঐতিহ্যটাকেই নতুন কালের পটভূমিকায় নতুন কায়দায় অনুকরণের চেষ্টা করছেন মাত্র। এঁদের বাস্তবতার চর্চা একটা ঢং. আসলে কদর্য-রুচির সাহিত্য পরিবেষণের এ একটা অজুহাত মাত্র। বাস্তবতা এত সস্তা জিনিস নয়।

কল্লোল-কালিকলমের যুগের পরে প্রায় পঞ্চাশ বছর অতীত হতে চললো। ভাবা গিয়েছিল এই কমবেশী বিস্তৃত সময়কালের ব্যবধানের অন্তে অপসংস্কৃতি অতীতের বস্তুতে পরিণত হবে। সাহিত্যের আবহাওয়া নির্মল হবে, সাংস্কৃতিক পরিবেশ পরিচ্ছন্ন হবে। কিন্তু তা হয়নি। আমাদের প্রত্যাশাকে ব্যর্থ করে দিয়ে আজও আমাদের মধ্যে একশ্রেণীর লেখক এমন সাহিত্যের সৃষ্টি করে চলেছেন যাকে 'বাজারী সাহিত্য' আখ্যা দিলেই ঠিক আখ্যা দেওয়া হয়। পাঠকের নিম্নগামী প্রবৃত্তিকে উদ্রিক্ত করে, তাদের রিরংসা-বৃত্তিতে সুড়সুড়ি দিয়ে বাণিজ্য করাই এই সাহিত্যের লক্ষ্য। এই সাহিত্যের যাঁরা জোগানদার তাঁরা কথায় কথায় প্রগতির দোহাই পাড়েন, আধুনিকতার বুলি কপচান, তাঁদের অভিমতের সমর্থনে ইংলণ্ডীয় কলাকৈবল্যবাদ কিংবা ফরাসী সাহিত্যের প্রাকৃতবাদের নজির উদ্ধার করেন। কিন্তু এঁদের খেয়াল নেই যে দুটিই উনিশ শতকের বস্তা-পচা পুরনো উচ্ছিষ্ট মত মাত্র, তার পরে পশ্চিম ইউরোপের সাহিত্যের নদীগুলি দিয়ে কত যে জল গড়িয়ে গেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। পাশ্চাত্যের সাহিত্য-সংসার আজ আর্ট ফর আর্টস সেক, ন্যাচারেলিজম, ক্রিটিকাল রিয়ালিজম, হিউম্যানিস্টিক আর্ট প্রভৃতির বিবর্তনের স্তর পেরিয়ে সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজমের স্তরে উপনীত। অথচ এখনও এরা অন্ধের মত পুরাতনের জাবর কেটে চলেছেন তো চলেছেনই। মুখে প্রগতির বোল, কলমের মুখে প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্বের প্রতিধ্বনি—এরই অপর নাম বাজারী সাহিত্য।

আমি আমার প্রবন্ধের গোড়ার দিকে বটতলার সাহিত্যের কথা বলেছি। বটতলার সাহিত্য ভোল বদলে আজও টিকে আছে। তবে তফাতের মধ্যে গাছতলা ছেড়ে এখন তা দরদালানে আশ্রয় নিয়েছে। বটতলার সাহিত্য আজকাল আর গরানহাটা আহিরীটোলায় ফিরি হয় না, ঠাঁই বদলে মুক্তারকিন স্ট্রীট অঞ্চলে সরে এসেছে।

বাজারী সাহিত্যের একটা প্রতীক চিহ্ন আছে। তার নাম 'বিবর'। বিবর

কথাটা বাচ্যার্থেও বটে ব্যঙ্গার্থেও বটে অন্ধকারের ইঙ্গিত করে। আর বিবর বা কোটরের অন্ধকার থেকেই যতপ্রকার অপসংস্কৃতির সৃষ্টি, অনাসৃষ্টিক; বিবরের গহনে যে তাল তাল ঘন অন্ধকার জমা হয়ে আছে তার উৎসমুখ বেয়ে একে একে বেরিয়ে এসেছে 'বিবর', 'পাতক', 'প্রজাপতি', 'রাত ভোর বৃষ্টি' প্রভৃতি বই। এসব বইয়ের একটিই মাত্র উদ্দেশ্য: মানুষের সুস্থ বাঁচার আকাঙ্খাকে খর্ব করে তার ভিতর অন্ধকার প্রবৃত্তিগুলিকে জাগিয়ে তোলা এবং ওই পথে তার ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেওয়া। এইসব রচনা পড়ে কত বিকশমান ছাত্র ও তরুণের জীবনের সুন্দর সম্ভাবনাগুলি নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের সংগ্রাম শক্তি মরে গেছে, তার ইয়ত্তা নেই। বস্তুত, এই শ্রেণীর সাহিত্যের একটা মূল উদ্দেশ্যই হলো সমাজের ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়কে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনাচরণের খাত থেকে সরিয়ে এনে তাদের সমাজবিরোধী জীবে পরিণত করে তাদের দ্বারা কায়েমী স্বার্থবাদীদের দুষ্ট অভিপ্রায় চরিতার্থ করিয়ে নেওয়া।

বাজারী সাহিত্যের পোষকতায়, এবং খুব সম্ভব সেই সঙ্গে বিদেশী মদতে, এই প্রক্রিয়া আজ বেশ কয়েক বছর ধরে বাংলা ভাষার জগতে চলছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একশ্রেণীর লেখক বাস্তবতার নাম করে বাস্তবের কেবলমাত্র ঘিনঘিনে অংশগুলিকেই তাঁদের রচনার উপজীব্যরূপে বেছে নিচ্ছেন এবং তদ্দ্বারা সমাজের দীর্ঘদিনের সঞ্চিত শুভবুদ্ধির ঐতিহ্য ও গঠনমূলক শক্তিকে প্রকাণ্ড এক উচ্ছৃঙ্খলতার নৈরাজ্য ও লক্ষ্যহীনতার শূন্যতার মধ্যে বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাইছেন। সমাজের ঐক্যকে ছত্রভঙ্গ ও মানবীয় ব্যক্তিত্বকে পর্যুদস্ত করাতেই এদের উল্লাস।

এই অপপ্রয়াসকে সর্বসাধ্য উপায়ে রোধ করতে হবে। এটা শুধু সংস্কৃতি অপসংস্কৃতির সমস্যা নয়, এটা গোটা জীবনের সমস্যা। বাঙালী এবিষয়ে এখনও সচেতন না হলে অনেক চোখের জলের মূল্যে তাদের এই ভুলের দেনা শোধ করতে হবে।